গীতার কথা

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রাচী পাবলিকেশনস্

প্রকাশক ঃ
জয়দীপ রায়চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশনস্
৬৩বি, ন্যাশনাল প্লেস
বাকসাড়া, হাওড়া
পিন--৭১১ ১১০
ফোন : ৯৩৩ ৯১০৮০২৪
৯৯০৩১১০৬৬৩

সপ্তম সংস্করণ ঃ
১লা জানুয়ারি (কল্পতরু উৎসব ২০০৯)

লেখক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ ঃ
মহালক্ষ্মী অফসেট
১৩/৪, শ্রীমানি পাড়া লেন
কলকাতা

মূল্য ঃ ৯০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

সনাতন শাস্ত্রের প্রোজ্জ্বল বিগ্রহ্
প্রবীণতম আচার্যবর্য
ডক্টর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ
অশেষশ্রদ্ধাস্পদেষু—

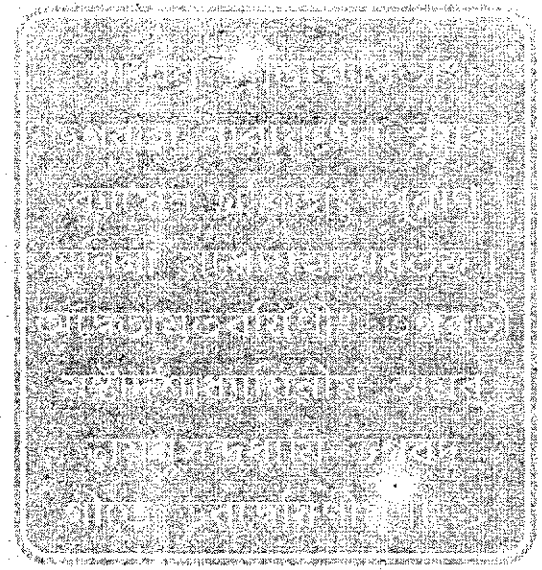

নিবেদন

গীতাকে অবলম্বন করে সামান্য একটি লেখা 'গীতার কথা'রও সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হল এবং এর থেকেই আবার নতুন করে প্রমাণিত হল যে গীতার বাণী চিরন্তনী। দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গানের সুর-ঝংকার আজও প্রতিটি মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে অনুরণন জাগায়, তাকে স্পন্দিত নন্দিত করে বিষাদে বেদনায় সংকটে সমস্যায়, আলো দেখায় ঘনায়মান অন্ধকারে, পথ চেনায় দিক্‌চিহ্নহীন মরুপ্রান্তরে। নইলে আজকের মানুষ এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুন্নত শিখরে আসীন হয়েও সেই কোন্ সুদূর মহাভারতের যুগে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ নামে এক পুরুষ অর্জুন নামক তাঁর এক স্বজন সখাকে কবে কী বলেছিলেন তাতে কর্ণপাত করে বৃথা সময়ের অপব্যয় করত না।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে তাই উল্লেখ করেছিলাম যে গীতাকে যাঁরা নিছক ধর্মশাস্ত্র, বৈতরণী পার হবার শেষ পারাণির কড়ি হিসাবে, কিছু ধর্ম-ভীরু মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের একমাত্র অবলম্বনরূপে দেখেন, তাঁরা গীতার সার্বভৌম মর্মবাণীর উপলব্ধি থেকে শুধু বঞ্চিত হন না, 'তোত্রবেত্রৈকপাণি' সেই সনাতন সারথির হাতে জীবন-রথ পরিচালনার সব ভার তুলে দেবার সুবর্ণ সুযোগও হারান। কোন্ ছন্দে নিখুঁতভাবে পরিচালন করলে আমাদের প্রত্যেকের জীবন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, সব সংকট থেকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারে তার নির্দেশ-দানের জন্যই শ্রীভগবানের গান ধরা, যাতে সেই গানের সুরে সুর মিলিয়ে আমরা জীবন-বীণার শিথিল বেসুরো তারগুলি বেঁধে নিতে পারি। গীতায় ভগবানের এ গান তাই জীবনের গান, জাগরণের গান, রণ-উন্মাদনার গান।

একদিন এই দেশেই পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য যখন সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল, তখন এই গীতাই স্বদেশ-আত্মার উদ্ধারে প্রেরণা যুগিয়েছে, দেশের নেতাকে পথ দেখিয়েছে, সঠিক পথে পরিচালনা করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো ধর্মগ্রন্থের এরকম সার্বজনীন প্রভাব ও প্রয়োগ আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। অথচ এখন আমরা সেই গীতাকে শুধুমাত্র পরলোকগত আত্মার শ্রাদ্ধকর্মে কোনোরকম স্থান দিয়ে যেন তার মর্যাদা রক্ষা করে চলেছি এবং নিজেদের শোকসন্তপ্ত প্রাণে কিঞ্চিৎ শান্তির প্রলেপরূপে সদ্ব্যবহার করার আয়োজন মাত্র করে তাকেই যেন কৃতার্থ করে দিচ্ছি! গীতার বাণীর যথার্থ প্রয়োগ, বিনিয়োগ বা সদুপয়োগ যদি আমরা করতে পারতাম তাহলে ব্যক্তির জীবনে, সমাজ-জীবনে,

রাষ্ট্রজীবনে সাম্য, সৌষম্য অনায়াসে সংস্থাপিত হত, আমরা শান্তি ও সমৃদ্ধির সুনিশ্চিত কল্যাণ-পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হতে পারতাম।

গীতার পরম মন্ত্র তাই একটিই ঃ আপন আপন কর্মেতে অভিরত হও, নিখুঁতভাবে নিরলস হয়ে আপন কর্মটি সম্পাদন করো, কর্তব্যটি পালন করো—তাতেই তোমার সংসিদ্ধি। গীতা পূজা-অর্চনা, জপ-তপ করার কথা বলে না, বলে তোমার কর্ম দিয়ে তাঁর অর্চনা করো। কার অর্চনা করবো? তাহলে তো ঘুরে ফিরে আবার সেই ভগবান, ধর্মকর্মই এসে পড়ল বলে আশঙ্কা জাগতে পারে। ভগবানকে বা ধর্মকে এমনই সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখেন বলেই তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ধর্মের নামে আতঙ্কগ্রস্ত হন, ভগবানের নামে বিরূপ হন। প্রগতির নামে সবকিছু নিরাকরণের নেশায় মেতে তাঁরা ভুলে যান সেই আশ্রয় বা অধিষ্ঠানের কথা, যার উপর আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি, যাকে ধরে সেই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হচ্ছে, যে অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য-চন্দ্র বিধৃত হয়ে আছে, অগ্নি তাপ দিচ্ছে, বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, প্রতি জীবে জীবে হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

গীতা বলছে, তোমার এই কর্মের স্পন্দনকে মিলিয়ে দাও সৃষ্টির সেই মূল স্পন্দনে, যেখান থেকে নিসৃত হয়ে এসেছে এই প্রবৃত্তির স্রোতধারা, যা এই সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে—এই তো তোমার অর্চনা, এই তো তোমার পূজা। এরই নাম যজ্ঞ। সৃষ্টির সূচনাতেই স্বয়ং প্রজাপতি এই যজ্ঞে দীক্ষা দিয়েই প্রতি জীবকে পাঠিয়েছেন, এর দ্বারাই তার সমৃদ্ধি, এর দ্বারাই তার সমস্ত অভীষ্ট কামনার পরিপূর্তি হবে জেনে। এই ব্যাপক চেতনার সঙ্গে যুক্ত না করে যে 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘুরে মরে পলে পলে', তার জীবনই নিষ্ফল, বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা, 'মোঘং পার্থ স জীবতি'। স্রষ্টার প্রবর্তিত এই পরস্পর ভাবনার মৈত্রীবন্ধনের চক্রকে অনুবর্তন না করে আমরা জীবনকে বক্র করে তুলেছি 'কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়ে আছি পড়িয়া' এবং অন্য সবাইকে বঞ্চনা করে, কিছু না দিয়ে, শুধু কেড়ে নিয়ে চোরের মতো স্বার্থপর জীবন যাপন করছি।

গীতার আহ্বান তাই মুক্ত জীবনের জন্য, স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য, আপনার স্বরূপে, বিশ্ব-ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত জীবনের জন্য। এখানে কোনো শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, ভগবান বলেছেন বলে মেনে নিতেও বলা হয়নি। বলা হয়েছে, সব দিক ভালোভাবে নিজে ভেবে-চিন্তে যা ইচ্ছা তাই করো—'বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।' এরকম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কোথাও কোনো গুরু তাঁর শিষ্যকে কি দিয়েছেন কোনো ধর্মগ্রন্থে? কারণ, ভগবান জানেন তিনি বলেই খালাস, করতে হবে তাকেই যে শুনল এবং তাকে করে পেতে হবে বা হতে হবে। অন্য কেউ তার হয়ে করে দেবে না বা পাইয়ে দেবে না। মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু, বাইরে তার কোনো শত্রু বা মিত্র নেই। লড়তে হবে তাই তাকে

নিজেকেই নিজের বিরুদ্ধে, তার সংকীর্ণ স্বার্থপর সত্তার বিরুদ্ধে। গীতায় অবিরাম এই সংগ্রামের, এই যুদ্ধের প্ররোচনা ঃ 'উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ,' 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বর,' 'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত,' 'জহি শত্রুং মহাবাহো'।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছেন, লড়বে বটে একা তুমিই কিন্তু চিরসাথী সনাতন সখা হয়ে আমি থাকব তোমার পাশেই প্রেরণা যোগাতে, পথ দেখাতে সারথিরূপে। তাই আমাকে তুমি ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ কোরো আর লড়ে চলো—'মামনুস্মর যুধ্য চ'। গীতার এই আর একটি আশ্চর্য দিক—যোগেশ্বরের সঙ্গে ধনুর্ধরের, নরের সঙ্গে নারায়ণের নিবিড় মিলন। এইটি সংসাধিত হলেই জীবনে শ্রী বা সুষমা, বিজয়ের গরিমা, ভূতি বা সমৃদ্ধি, অটল ন্যায় নীতি সবকিছুই সুনিশ্চিত—গীতায় শেষ শ্লোকে সঞ্জয়ের মুখে তারই ধ্রুব আশ্বাস।

এইজন্য কান পেতে শুনতে তবে তাঁর আদেশ আর প্রাণ দিয়ে তা পালন করতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে। আমরা শুনেই খালাস, বলতে পারিনা অর্জুনের মতো ঃ 'করিষ্যে বচনং তব'। তাঁর বলার তো বিরাম নেই। অক্লান্ত তাঁর উপদেশ, সংগ্রামের বিভিন্ন আদেশ। এবার 'গীতার কথা'র শেষে তার সেই আদেশগুলি বিভিন্ন অধ্যায় থেকে সংকলন করে তুলে ধরা হয়েছে সব সময় যাতে চোখের সামনে রেখে নিজেদের সজাগ করতে পারি। পূজনীয় ৺পিতৃদেব এই আদেশগুলিকে জীবনের ধ্যান-জ্ঞান করে তারই পরিপালনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং এই আদেশগুলিকে অবলম্বন করে যে অনুধ্যান তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল তা একদা তিনি লিপিবদ্ধ করে অন্তরের সংগোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে শুধু নিজের আস্বাদন ও স্মরণ-মননের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। গীতাকে তাঁরই মতো জীবন-চর্চায় যাঁরা প্রয়োগ করতে চান, তাঁদের কিছু উপকারে লাগতে পারে ভেবে তাঁর সেই গচ্ছিত ধন আজ সর্বসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়ে ধন্য হলাম। সেইসঙ্গে সমগ্র গীতার সাধন-ক্রমটি তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর নিজের রচনার মধ্যে দিয়ে সেটিও তুলে ধরা হল। শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীর টীকা ও তার বঙ্গানুবাদ সহ একদা ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা সম্প্রতি দীর্ঘকাল পরে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং তার শেষে 'গীতার কথা' প্রথম সংস্করণের সঙ্গে সংযোজিত ৺পিতৃদেবের লেখা গীতার মর্ম ও উপদেশ' আবার প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় এই সংস্করণে আর সেটি দেওয়া হল না।

এই গ্রন্থে কোন কথাই আমার নিজস্ব নয়, সবই পূজনীয় ৺পিতৃদেবের। তিনি নিজেকে চিরদিনই অন্তরালে রাখবার দুরূহ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ৺গুরুমহারাজ শ্রীমদ্ বালানন্দ ব্রহ্মচারী তাই তাঁকে ডাকতেন 'শুক্ল সন্ন্যাসী' বলে, যিনি তাঁর সাদা কাপড় ও গার্হস্থ্য জীবনের আড়ালে অন্তরের ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে সকলের অগোচরে সুরক্ষিত রেখেছিলেন। আর আমি দুচার ছত্র তাঁর কথাই

নিজের অক্ষম লেখনীতে উপস্থাপন করে এই গ্রন্থের রচয়িতারূপে নিজেকে জাহির করে বসলাম, এতে গীতায় উল্লিখিত আর একটি পরম সত্যও উদ্‌ঘাটিত ও প্রমাণিত হল নতুন করে ঃ 'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।' আমার এই অহংকারকে আরও উস্‌কে দিয়েছেন আমারই এক অনুজ ভ্রাতা, গোরা মুখোপাধ্যায়, যিনি তাঁর জ্যেঠামশায়ের একান্ত অনুরাগী এবং মনে করতেন তাঁর অবর্তমানে তাঁর লেখা অবলম্বন করে সর্ব-সাধারণকে শোনানোর দায়িত্ব আমারই উপর বর্তেছে এবং আমাকে তা করে যেতেই হবে। অনলস একান্ত উৎসাহে তিনি বইয়ের প্রেস কপি, মলাটের ব্লক তৈরি করা, সযত্নে প্রুফ দেখা সবকিছুর দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় আমাকে নিশ্চিন্ত ও ভারমুক্ত করবেন বলে।

এবারে এই সংস্করণে ইতস্তত যৎসামান্য পরিমার্জন ছাড়াও সব শেষে পরিশিষ্টরূপে যোগ করা হয়েছে তিনটি ছোট লেখা, যাতে গীতার গান, গীতার সপ্ত সুর এবং অর্জুনের সুর সাধার ক্রমটি দেখানোর সামান্য প্রয়াস করা হয়েছে। গীতার কোনো নতুন টীকা ভাষা রচনা এই 'গীতার কথা' প্রকাশের লক্ষ্য ছিল না কোনদিন, কেবল গীতার ক্রমটি ধরাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কোন্ ক্রমে কেমন ধাপে ধাপে শ্রীভগবান চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। সেই দিব্য গতি, শ্রী ভগবানের নির্দিষ্ট এই গতির ছন্দে Divine movement এর অনুধাবন ও অনুসরণই এর লক্ষ্য। জীবনের এই গতিকে পরিচালিত করতে পারলেই গীতা পাঠের সার্থকতা এবং এইভাবে যজ্ঞ থেকে যোগ, যোগ থেকে ভক্তি, ভক্তি থেকে জ্ঞান এই চতুষ্পাদে এই যাত্রার পরিপূর্ণতা।

আমরা যেন সেই ক্রমানুসারে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারি এই প্রার্থনা।

কাউকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না; নিজে যাতে তাঁদের বদন্যতা উপলব্ধি করে আপন ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারি ও অহংকারকে প্রশমিত করতে পারি, জননী ভগবদ্‌গীতার কাছে এই একান্ত প্রার্থনা।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

অর্জুনবিষাদযোগ

মহাভারতের মধ্যমণিরূপে জ্বলছে একটি অনির্বাণ জ্ঞানময় প্রদীপ যার আলোয় আজও দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত, বহু দেশের বহু কালের মানুষের অন্তরের অন্ধকার বিদূরিত, মোহ বিগলিত ও স্মৃতি উদ্‌বোধিত। তাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বার বার অনুশীলন করা প্রয়োজন, বারংবার তার মনন নিদিধ্যাসন একান্তভাবে অপেক্ষিত। সেই মনন বা চিন্তন বা নিদিধ্যাসনের জন্য আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে নিরন্তর আবর্তনের অবলম্বন রূপে গীতার একটি মালিকা রচনা করা। মালা রচনা করতে হলেই যেমন প্রয়োজন হয় একটি সূত্রের, তেমনি গীতার মালিকা আমরা রচনা করতে পারব না যদি পর পর অধ্যায়গুলি বা শ্লোকগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, এবং এই বিচ্ছিন্নভাবে দেখার ফলে তার মধ্যে যোগসূত্রটি যদি আমরা লাভ করতে না পারি। এর ফলে জীবনে যে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলার পথ শ্রীভগবান নির্দেশ করেছেন, তাই ধরে এগিয়ে চলাও আমাদের জীবনে সম্ভব হবে না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রথমে নামটির দিকেই আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'—এমন জিনিস আর দ্বিতীয় কিছু নেই। অনেকে আমরা ভুল করি, অনেক জায়গায় লেখার মধ্যেও ভুল করা হয়, উচ্চারণেও ভুল করে বলা হয় শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা; কিন্তু শব্দটি হল 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'। ভাগবদ্‌গীতা আর ভগ্‌বদ্ গীতায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। কেননা 'ভাগবত' শব্দটি ভগবান থেকে এসেছে, অর্থাৎ ভগবান সম্বন্ধীয় যা তাই হল ভাগবত। যেমন আমাদের 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' নামে একটি পুরাণ আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবানেরই সম্বন্ধে বা তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ভক্তজনের বিষয়ে কথা, সেজন্য বলা হয় শ্রীমদ্‌ভাগবত। 'শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা' যদি হত তাহলে এর মর্যাদা, এর মূল্য অনেকখানি কমে যেত। তার কারণ হচ্ছে, ভগবান সম্বন্ধে কিছু গান, কীর্তন, স্তুতি হয়তো থাকত শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতার মধ্যে। কিন্তু এখানে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবান স্বয়ং সেই গান করেছেন, এটি স্বয়ং ভগবান কর্তৃক গীত। 'সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং'

ভগবান স্বয়ং যে গান রচনা করেছেন, তাই হল ভগবদ্‌গীতা, 'যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা'। মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর একটি গানে তাই বলেছেন ঃ 'ভগবদ্‌গীতা' গাইল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে'। ভগবান স্বয়ং পাঞ্চজন্য শঙ্খেতে যেমন কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন অর্জুনকে, তেমনি তাঁর এই গানের বাণীর দ্বারাও তিনি অর্জুনকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন, আত্মবিস্মৃত অর্জুনকে আবার আত্মজ্ঞান ফিরিয়ে এনে দিয়েছিলেন। সুতরাং এটা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। এইখানেই এর অনুপম মহিমা—'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' এই গ্রন্থের।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় সাক্ষাৎ ভগবান বলেছেন! কাকে বলেছেন? অর্জুনকে বলেছেন, এই হল উপলক্ষ্য। উপলক্ষ্যটি সকলেই জানেন। মহাভারতের যুগে কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে অর্জুন কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে কৃতসংকল্প হয়েছেন। যাঁরা তাঁর জ্ঞাতি, যাঁরা তাঁর স্বজন তাঁদের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন, এই ইচ্ছায় তিনি কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে আসতে চাইছেন। সেই কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে তিনি যখন আসতে চাইলেন তখন তাঁর সারথ্য করেছিলেন স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন ঃ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।।২১।।

"দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে আমার রথকে স্থাপন করো।"

এই অনুরোধ করেছিলেন বলেই সেই কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে রথকে নিয়ে এলেন সারথি। কোথায় নিয়ে এলেন? এ নিয়ে গীতায় নানারকম ব্যাখ্যা আছে। কেউ কেউ যৌগিক ব্যাখ্যা করেছেন, কেউ কেউ মনে করেন কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ এটা কোনো ঐতিহাসিক বা বাস্তব ক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা গীতা এখানে উল্লেখ করছে না; এটা হল আন্তর-যুদ্ধ, অর্থাৎ প্রত্যেক হৃদয়ের ক্ষেত্রে অসুর ও দেবতার যে যুদ্ধ, সেইটিই এখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধরূপে কল্পিত হয়েছে। সে যাই হোক, একটা যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশ এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এ হল একটা সংগ্রামভূমি অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র। আবার ধর্মক্ষেত্রও বটে। সেই ধর্ম ও সংগ্রামের পটভূমিকায় গীতার আরম্ভ।

সংগ্রামের পটভূমিকা কেন? জীবনে দ্বন্দ্ব আছে, সেটা আমরা যেভাবেই নিই! বাস্তবের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাই, অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়েও দেখতে পাই, দুদিক দিয়েই প্রত্যেক মানুষের জীবন দ্বন্দ্বময়! জীবন মানেই হল দ্বন্দ্ব, জীবন মানেই হল সংগ্রাম। সেই জীবনসংগ্রামের মধ্যে আমরা কী খুঁজছি? শান্তি খুঁজছি। সেই জীবনসংগ্রামে আমরা কী করে শান্তি বা সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, সেই

শান্তি বা সমতার বাণীকেই আমরা অন্বেষণ করছি। কিন্তু সেই অন্বেষণ করব কোথায়, কার কাছে? যিনি সেই শান্তির বাণী ঠিক ঠিক আমাদের শোনাতে পারেন, যথার্থ শান্তি এনে দিতে পারেন আমাদের জীবনে, তাঁরই কাছে আমাদের যেতে হবে। তিনিই হলেন আমাদের পরম আশ্রয়স্থল স্বয়ং শ্রীভগবান। সেই দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন অর্জুন। সেই সমরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন শ্রীভগবানের কাছেই, এই জীবনসংগ্রামের বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে পথ চেয়েছিলেন, শান্তি খুঁজেছিলেন। গীতার এই পটভূমিকাটি সেইজন্য বিশেষভাবে আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন।

প্রথম অধ্যায়টি আমরা সাধারণত ভালো করে লক্ষ্য করি না; মনে করি প্রথম অধ্যায় শুধুমাত্র বর্ণনামূলক, সেটা পড়বার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কয়েকটি জিনিস অন্তত বিশেষ করে এখানে লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। প্রথম হচ্ছে যিনি শ্রোতা, তাঁর কী রকম অবস্থা। শ্রোতার অবস্থা প্রথমেই ধরিয়ে দিয়েছেন একটি শ্লোকের মধ্যে, সেটি লক্ষ্য করবার মতো। শ্রোতা যখন এলেন কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে, তখন তিনি কাদের দেখলেন? দেখতে পেলেন প্রথম তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে। তাই বলা হয়েছে ঃ

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।।২৭।।

'তান্ সমীক্ষ্য', তাদের ভালো করে দেখে। কাদের তিনি দেখলেন? একটি সার্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন 'বন্ধুন্'। সংস্কৃতে 'বন্ধু' শব্দটি আত্মীয়-স্বজনকে বোঝায়। বন্ধুবর্গকে তিনি দেখলেন, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে তিনি দেখতে পেলেন। এইখানে এই 'বন্ধু' শব্দটি দ্বারা একটা ইঙ্গিত করা হল যে অর্জুন আত্মীয়তাসূত্রে তাঁদের সঙ্গে 'বাঁধা'। এই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের বোধ তাঁর মধ্যে উদ্রিক্ত হল, হঠাৎ জেগে উঠল। জেগে ওঠার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কী হলেন? 'কৃপয়া পরয়াবিষ্টো', বিশেষ কৃপার দ্বারা আবিষ্ট। কৃপা মানে হচ্ছে হৃদয়ের অনুকম্পা, আর্দ্রতা। অর্থাৎ হৃদয় তাঁর বিগলিত হয়ে গেল স্নেহে, মমতায়, প্রীতিতে, শ্রদ্ধায়। যে-সূত্রে আমরা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাঁধা, সেই সূত্রে তিনি আবদ্ধ ছিলেনই এবং সেই ভাবটি তাঁর ভিতর হঠাৎ জেগে উঠল। জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কী হল? 'বিষীদন্', তিনি বিষাদযুক্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 'বিষীদন্নিদমব্রবীৎ'।

এই পটভূমিকার এই বিশেষ দিকটি লক্ষ্য করবার মতো—এই বিষাদের

প্রসঙ্গ। এই বিষাদটি আমাদের জীবনে একটি বিশেষ লগ্নে আসে এবং সেই বিশেষ লগ্নেই আমাদের জিজ্ঞাসা জাগে। 'তমসা যখন আসে ছেয়ে' তখন এই জিজ্ঞাসা যে আমাদের জাগে সেটা কিসের জিজ্ঞাসা? আলোর জিজ্ঞাসা, পরমার্থ-জিজ্ঞাসা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা। তত্ত্বজিজ্ঞাসা সাধারণ জীবনের মধ্যে জাগে না। যাঁরা সুখে আছেন, জীবনে আমাদের যে নানারকম সংকট তার থেকে মোটামুটি ত্রাণ পেয়েছেন, অর্থাৎ যাঁদের অর্থের সঙ্গতি আছে, খাওয়া-পরার সংস্থান আছে, যাকে বলি আমার উপকরণ, তার কোনো জিনিসের অভাব নেই—এ যদি হয়, তাহলেই আমরা সুখে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়ে দিই। কিন্তু যাঁরা সাধু মহাজন, যথার্থ পরমার্থ পথের পথিক, তাঁরা এটাকে অন্তরায় বলেই মনে করেন। সাধারণ জীব যাকে খোঁজে অর্থাৎ সুখের পরম নিশ্চিন্ততা, সেটাকে তাঁরা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে না করে দুর্ভাগ্যের জিনিস বলেই মনে করেন। তাঁরা সেইজন্য খোঁজেন কাকে? বিষাদকে। বিষাদ কখন আসে মানুষের? যখন তার দুঃখের লগ্ন ঘনিয়ে আসে। এই জন্য মনে রাখতে হবে যে জীবনে যাদের কোনো সংকট আসেনি, তাদের জিজ্ঞাসা জাগে না। ইংরেজীতে যাকে বলে crisis, সে সংকটের লগ্নেই মানুষ অন্ধকারে আলো খোঁজে, পথের নির্দেশ চায়। এইজন্য বিষাদটা মানুষের জীবনে একটা পরম সৌভাগ্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় কুন্তীর সেই প্রার্থনা যেটি শ্রীমদ্‌ভাগবতে উদ্‌গীত। সেই অনুপম প্রার্থনাটি তিনি শুনিয়েছেন স্বয়ং ভগবানকে। এই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটভূমিকায় গীতার প্রারম্ভ, সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন অবসান হয়ে গেল, তখন সেই সারথি বিদায় নিতে চাইলেন। বললেন ঃ 'আমার কাজ তো ফুরিয়েছে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি এবার চলি।" যখন তিনি বিদায় নিতে চাচ্ছেন তখন কুন্তী তাঁর কাছে সেই প্রার্থনার প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ "তুমি এখন চলে যেতে চাইছ কারণ তুমি ভেবেছ আমাদের বিপদ কেটে গিয়েছে। তুমি মনে করছ এখন আমাদের সম্পদ হয়েছে, সুখের দিন এসেছে, কাজেই তুমি চলে যাচ্ছ। তাই যদি হয়, তাহলে সেই সম্পদে আমার প্রয়োজন নেই।"

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্।।

বিপদই আমার হোক শশ্বৎ, সর্বদা। সদাসর্বদা যেন আমার বিপদ লেগেই থাকে, কারণ 'তত্র তত্র জগদ্‌গুরো,' যেখানেই বিপদ সেখানেই তুমি। হে জগদ্‌গুরো। তুমি আমার কাছে এসো, সামনে দাঁড়িয়ে থেকো সেই সংকট থেকে আমাকে ত্রাণ করবার জন্য। সেইজন্য বিপদকেই আমি চাই, সর্বদা যেন বিপদ

আমার লেগে থাকে। আর 'ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্,' শুধু তোমায় দেখতে পাওয়া নয়, তোমাকে দেখতে পাওয়া মানেই এই ভব-যন্ত্রণা থেকে, এই সংসারসংকট থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া। সুতরাং সেই দর্শনই আমি চাই। বিপদ যদি তোমার সেই দুর্লভ দর্শন এনে দেয়, যে-দুর্লভ দর্শনের ফলে আমার পরমা মুক্তি লাভ হয়, তাহলে সেই বিপদই তুমি আমাকে দিয়ো।" অন্যত্র সেই একই প্রার্থনা করা হয়েছে একটি অপূর্ব শ্লোকে, যে শ্লোকটি গান্ধীজীর বিশেষ প্রিয় ছিল:

বিপদো নৈব বিপদঃ সম্পদো নৈব সম্পদঃ।
বিপদ্ বিস্মরণং বিষ্ণোঃ সম্পন্নারায়ণস্মৃতিঃ।।

কোনো বিপদই বিপদ নয়, কোনো সম্পদই সম্পদ নয়। যেগুলি আমরা বিপদ বলি, সেগুলির কোনটাই যথার্থ বিপদ নয়। যেগুলি আমরা সম্পদ মনে করি, সেগুলিও সম্পদ নয়। দুনিয়ায় বিপদ একটাই, সম্পদও একটাই। কোন্‌টা বিপদ আর কোন্‌টা সম্পদ? 'বিপদ্ বিস্মরণং বিষ্ণোঃ,' বিষ্ণুকে বিস্মরণ, শ্রীভগবানকে ভুলে যাওয়া, সেইটিই একমাত্র বিপদ। আর সম্পদ কোন্‌টা? 'নারায়ণস্মৃতি,' নারায়ণকে স্মরণ। বিষ্ণু বা সর্বব্যাপক সেই চৈতন্যসত্তাকে বা নারায়ণকে, যিনি সব নরের একমাত্র অয়ন বা আশ্রয়স্থল, তাঁকে স্মরণ যদি রাখতে পারি, সেইটাই বলি একমাত্র সম্পদ। সুতরাং আমরা যাকে বিপদ বলি, সেই বিপদের লগ্নে, সংকটের লগ্নে, ঘনায়মান অন্ধকারে দুর্যোগের রাত্রিতে যদি বার বার আমার সেই নারায়ণস্মৃতি জাগে, তাহলে সেইটিই হল সম্পদ। আর সুখের নিশ্চিন্ততায় যদি আমরা তাঁকে ভুলে যাই, সেইটে হল সব থেকে বড় বিপদ মানুষের। সেইজন্য ইংরেজিতে যাকে বলে evaluation, আসল জীবনের যে মূল্যায়ন, তা যাঁরা করতে শিখেছেন, তাঁরা এইভাবে জীবনের মূল্য নির্ধারণ করেন; বোঝেন যে সাধারণত যাকে আমরা বিপদ বা সম্পদ মনে করি, সেখানে সেই জিনিসটা একেবারে উলটে যায় a complete reversal of values ঘটে যায়। আমরা যাকে সম্পদ বলে মনে করি, সেইটাই তাঁর কাছে বিপদ, এবং যেটা আমাদের কাছে বিপদ, সেটা তাঁর কাছে সম্পদ।

অর্জুনের এইরকম বিপদ এসেছিল যা তাঁকে পরম সম্পদের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। এই কথাটি বলার তাৎপর্য এই যে জীবনে যখন যাদের সংকট আসে ঠিক তখনই তাদের মনেই যথার্থ জিজ্ঞাসা জাগে। এইজন্য যথার্থ জিজ্ঞাসা জীবনে যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ যাকে ইংরেজিতে বলে tepid wish মাত্র, একটা নিরুত্তাপ কৌতূহল, নিছক ঔৎসুক্য মাত্র, যেমন গীতা বা তত্ত্বকথা শোনা যাক না,

একটু শাস্ত্র পড়া যাক না, একটু সাধুসঙ্গ করা যাক না—অর্থাৎ এই হিসাবে যাঁরা বিলাসমাত্র সম্বল করে ধর্মের দিকে প্রবর্তিত হন, তাঁদের যে কোনো ফললাভ হয় না তা নয়, তার যেটুকুমাত্র ফল, সাময়িকভাবে কেবল সেইটুকুই লাভ হয়, কিন্তু তার দ্বারা জীবনের সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। যাঁর কাছে জীবনের সমস্যাটা তেমন উদগ্রভাবেই কোনোদিন প্রকাশ পায়, তখন যদি তিনি পথ খোঁজেন, তাহলে শ্রীভগবান তাঁকে সেই পথের নির্দেশ দান করেন। সেই নির্দেশদান তিনি করেছিলেন অর্জুনকে, এবং সেই নির্দেশ যেকোনো সংকটাপন্ন মানুষ, যদি সে সেই সংকট থেকে ত্রাণের নির্দেশ খোঁজে, তাহলে আজও সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কাছ থেকে সেটি পেতে পারে।

অর্জুনের কী হল? বিষাদে চিত্ত ছেয়ে গেল। এ বিষাদ যখন ঘনিয়ে এল, তখনই তাঁর প্রসাদ, ভগবানের অনুগ্রহ তাঁর উপর বর্ষিত হতে আরম্ভ হল। মানুষ যখন বিষাদে ডুবে যায় তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এই বিষাদ জিনিসটা কার ধর্ম? আমরা তিনটি গুণের রাজ্যে বাস করছি, সত্ত্ব, রজ এবং তম। তমের আর একটা মানে হচ্ছে অন্ধকার। এই তামসিকতাই বিষাদের মূর্তি নিয়ে আসে, কালো মেঘের মতো আমাদের চিত্তাকাশকে ছেয়ে ফেলে, এবং চিত্তকাশকে ছাওয়ার ফলে আমরা গভীর অবসাদ, নিবিড় নির্বেদের মধ্যে ডুবে যাই। সুতরাং সেই অবস্থায় মানুষ নিজের আত্মাকে, নিজের স্বরূপকে যেন হারিয়ে ফেলে। তার থেকে প্রথম তিনি এসে যদি উদ্বুদ্ধ না করতেন, ত্রাণ না করতেন, তাহলে জীব নিজেকে হারিয়েই ফেলত।

অর্জুন বিষাদযুক্ত হয়ে তাঁর কাছে নিজের দুঃখের কাহিনী শোনালেন, 'বিষীদন্নিদমব্রবীৎ' (২৭)। সেই দুঃখের কাহিনী তিনি যা বলেছিলেন, তার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁর যে মমতা, সেটা সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয়ে প্রকটভাবে ফুটে উঠেছিল সেকথা শ্রীকৃষ্ণ শুনলেন। শেষের দিকে অর্জুন আবার জ্ঞানী পণ্ডিতের মতো অনেক কিছু তার সঙ্গে যোগ করে বোঝাতে চাইলেন যে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী, আত্মীয়-স্বজনকে বধ করতে না চাওয়া, এটা যেন ধর্মের দ্বারাই, ধর্মবুদ্ধির দ্বারাই প্রেরিত হয়ে তিনি করছেন। সেইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি নিজে কৃতসংকল্প হলেন যে, 'আমি আর যুদ্ধ করব না। এ এক মহাপাপে আমি লিপ্ত হতে চলেছি, যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' এই বলে তিনি কী করলেন? হাতের ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন। প্রথম অধ্যায়ের শেষের শ্লোকে আমরা শুনলাম যে অর্জুন 'শোকসংবিগ্নমানসঃ' (৪৬), জানলাম যে এই শোকের দ্বারা তিনি অভিভূত হলেন, মন তাঁর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মোহের দ্বারা আবৃত

তো প্রথমেই হয়েছিলেন।

বিষাদের অপর পর্যায়ের শব্দটি হচ্ছে শোক। এই শোকের কথা যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শুনছি, তেমনি এই শোকের কথা শুনি আমরা উপনিষদের মধ্যেও। কেননা এই শোক থেকেই প্রথম জিজ্ঞাসা জাগে। এটা যে শুধু অর্জুনের বেলা জেগেছিল তা নয়, ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার মূলেই এই শোক। শোক থেকে ত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মজ্ঞান। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে শুনি সেই নারদ-সনৎকুমার সংবাদ। নারদ-সনৎকুমার সংবাদে শুনতে পাই নারদ এসেছেন সনৎকুমারের কাছে, আচার্যের কাছে, গুরুর কাছে সমস্ত বেদাদি যতকিছু বিদ্যা সব অধিগত করে। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি গুরু সনৎকুমারের কাছে এলেন। "কেন, তোমার কী জিজ্ঞাসা, কেন এসেছ আমার কাছে?" "আমি এসেছি আপনার কাছে শোক থেকে ত্রাণ লাভ করবার জন্য!" "কেন, তুমি তো অনেক জ্ঞান লাভ করেছ, তোমার শোক থেকে ত্রাণ হয়নি?" "না, আমি 'মন্ত্রবিদেবাস্মি ন আত্মবিৎ,' আমি অনেক মন্ত্র-তন্ত্র, জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করেছি বটে কিন্তু আত্মাকে জানিনি।" "কে বললে তুমি আত্মাকে জানোনি? কী করে বুঝলে?"

তারও নিরিখ আছে, যাচাই আছে, লক্ষণ আছে। আমরা শুনেছি 'তরতি শোকং আত্মবিৎ,' আত্মবিৎ যিনি হন, আত্মাকে যিনি জানেন, তিনি শোকের পারে যান। কিন্তু "অহং ভগবঃ শোচামি," "আমি এখনও শোক করছি, শোকের মধ্যেই পড়ে আছি।" "তন্ মাম্ ভগবন্ শোকস্য পারং তারয়তু," "আপনি আমাকে শোকের পারে নিয়ে চলুন।" এই শোকের পারে যাবার যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, সেইটি নারদের সেই আর্তির মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে, তাঁর নিবেদনের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রকাশ পেয়েছে উপনিষদের যুগে। সুতরাং, সেই শোক থেকেই তাঁর জিজ্ঞাসা। আমাদের ভারতবর্ষের আদি কবি তাঁর যে আদিকাব্য রচনা করেছিলেন, সেখানেও দেখানো হয়েছে শোক থেকেই শ্লোক উদ্ভূত হয়েছিল। বাল্মীকির কণ্ঠে সেই যে শ্লোক নিঃসৃত হয়েছিল 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ,' তারও উদ্ভব এই শোক থেকে 'শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।' শোক থেকেই আবির্ভূত হয়েছে আমাদের জীবনের কাব্যঝংকার, কাব্যগীতি।

এই যে শোক এবং তার সঙ্গে তার কারণরূপে প্রথম দিকটায় লক্ষ্য করেছি অর্জুনের মোহ। এই মোহ ও শোক, এই দুইটি থেকে ত্রাণের জন্য যখন মানুষের একান্তভাবে লালসা জেগে ওঠে, তখনই সে পথের দিশা চায়। সেই দিশা সে যখন লাভ করে তখন পথ চলতে চলতে আস্তে আস্তে তার মোহের ঠুলি চোখ থেকে

খসে যায়, সে শোকের পারে ক্রমশ ক্রমশ যেতে সমর্থ হয়। এই হল পটভূমিকার কথা, যা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কারণ, আমাদের যে অধ্যাত্মশাস্ত্র, সে মানুষকে পথ চলবার নির্দেশ দেয়, জীবনের যে দৈনন্দিন সমস্যা, সে সমস্যার সমাধান করে। কীভাবে সেই সমস্যার সমাধান করে? মোহ থেকে, শোক থেকে ত্রাণ করে আত্মজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এই আত্মজ্ঞানের ফল আমাদের বার বার শুনিয়েছেন উপনিষদের ঋষিরা ঃ

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বং অনুপশ্যতঃ।

সেখানে শোক কোথায়, মোহ কোথায়? যিনি একত্বের জ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর শোক থাকে না।

এই শোক-মোহ থেকে ত্রাণ, এর দ্বারাই যাচাই হয় কারুর আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে কি হয়নি। অর্জুন শোকমোহগ্রস্ত, যথার্থ জীবন-জিজ্ঞাসায় চরম সংকটাপন্ন, বিষাদে মুহ্যমান, দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। এই পটভূমিকাটি অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গীতার প্রথম অধ্যয়ে। এরই ভিত্তিতে ফুটে উঠতে পারে আত্মজ্ঞানের উপদেশ, যার পরিচয় আমরা পাব পরবর্তী অধ্যায়ে। দুঃখ শোকে অর্জুনের কাঁদছে প্রাণ, শ্রীভগবান ধরলেন গান। এইভাবেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সূচনা। স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্মবিনিঃসৃত এই গানই প্রাণ জুড়ায়, শোকমোহ, দুঃখতাপ দূর করে। গোপালনন্দন সমস্ত উপনিষদের সার দোহন করে যে অমৃত পান করালেন অর্জুনকে, এখন তারই আস্বাদনে আমরা কৃতার্থ ও ধন্য হব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

শ্রীভগবান দেখলেন শোক-সাগরে নিমগ্ন অর্জুন। তখন তিনি তাঁর দিকে চাইলেন। দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হল। অর্জুনের মধ্যে তিনি যা দেখতে পেলেন, তার দুটি লক্ষণ গীতাকার দেখিয়েছেন, 'কৃপয়াবিষ্টম্' ও 'বিষীদন্তম্', কৃপার দ্বারা তিনি আবিষ্ট আর বিষাদযুক্ত। কৃপার দ্বারা, মমতার দ্বারা তিনি আবিষ্ট হয়েছেন। এই মমতাবুদ্ধি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁর যে স্নেহ-শৃঙ্খল, তা-ই তাঁর দৃষ্টিকে আবিল করেছে, তাঁকে মোহগ্রস্ত করেছে। মমতা ও মোহের ফলেই তিনি বিষাদযুক্ত হয়েছেন। ''বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ' (১)।

এই 'মধুসূদন' সম্বোধনটি এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মধু আর কৈটভ আমরা জানি দৈত্যের নাম। এই মধু আর কৈটভ হল আমাদের তম আর রজ। আজ মধুসূদন, তমকে যিনি নিসূদন করবেন, তার থেকে ত্রাণ করবেন, এই তামসিকতার অন্ধকার থেকে যিনি অর্জুনকে টেনে তুলবেন, সেই মধুসূদন তাঁর কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কথা বলার আগে তিনি অনুধাবন করলেন যে সে যদি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, তাহলে পরম তত্ত্বকথা তার কানে তো প্রবেশ করবে না; সুতরাং তাকে প্রথম জাগাতে হবে। এই জাগানো বা ওঠানোর বাণী তিনি তাই প্রথম শুনিয়ে দিলেন মাত্র দুটি শ্লোকে।

এইযে গীতা গ্রন্থটি তাতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এখানে ভগবান আর কিছু করলেন না, যে ঘুমোচ্ছে, মাত্র দুটি শ্লোকে হঠাৎ তাকে সজাগ করলেন। ''এ কী করছ তুমি? জাগো, ওঠো।'' এই জাগবার, ওঠবার যে বাণী, উদ্‌বোধনের বাণী, সেইটি তিনি প্রথম শোনালেন তাকে উদবুদ্ধ করবার জন্য। দুটি আদেশ করলেন তাকে ঃ ''ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'' আর ''উত্তিষ্ঠ পরন্তপ'' (৩) , এই ক্লৈব্য, এই জড়তা তুমি পরিত্যাগ করো। ক্লৈব্য তোমার সাজে না, তুমি ওঠো, 'উত্তিষ্ঠ পরন্তপ''। উত্তিষ্ঠ' মানে, তিনি যে অবসন্নভাবে রথের উপর বসে পড়েছিলেন তার থেকে, দৈহিক উত্থান যেমন বোঝায়, তেমনি মনের দিক থেকে, প্রাণের দিক থেকে বুদ্ধির দিক থেকেও উত্থান বোঝায়, বুদ্ধিকে আমাদের সজাগ করতে হবে, আমাদের বোধে জেগে উঠতে হবে। এই উত্থানের বাণী প্রথমেই

তিনি শুনিয়ে দিলেন অর্জুনকে আর সেই সঙ্গে ক্লৈব্য পরিহারের জন্য তাকে সচেতন করে তুললেন।

এই যে ক্লৈব্য পরিহার করে নিজেকে জাগ্রত করা, সচেতন করা, তা আমরা স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ নানা মহাপুরুষের বাণীতে, বিশেষভাবে এ যুগেও, শুনেছি। তাঁরাও বার বার শুনিয়েছেন উপনিষদের সেই জাগরণের মহামন্ত্রটি যেটি তাঁদের বিশেষ প্রিয় ছিল—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। সেখানেও সেই একই কথা। প্রথমেই বললেন না যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর কাছে গিয়ে জ্ঞানলাভ করো, 'নিবোধত'। শুধু একথা বলে দিলেই তো হত। কিন্তু যাব যে জ্ঞানীর কাছে, সজাগ হয়ে তো যাব, তবে তো সেখানে থেকে লাভ করে আনতে পারব কিছু। সজাগ হয়ে যাওয়াটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই উপনিষদের ঋষি প্রথম বলেছেন 'উত্তিষ্ঠত', ওঠো, 'জাগ্রত', জাগো, তারপর 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। 'নিবোধত' সবার শেষে, আগে ওঠা এবং জাগা।

যখন সবাই সুপ্ত, সেই সময় তাদের বড়ো বড়ো তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। তাকে প্রথম জাগাতে চেষ্টা করতে হয়, উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করতে হয়, তাতে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করতে হয়। যদি সে প্রাণবন্ত হয়, তাহলেই ক্রমশ ক্রমশ সে আত্মবান হতে পারবে। কেননা, আগে প্রাণসঞ্চার না হলে, মৃতকল্প দেহের মধ্যে আত্মার উপলব্ধি হয় না। এইজন্য মৃত্যু থেকে প্রথম আত্মাকে ত্রাণ করতে হবে প্রাণসঞ্চার করে। সেই প্রাণসঞ্চারের মন্ত্রই প্রথম ভগবান তাকে শোনালেন। "তুমি ওঠো। এই ক্লৈব্য এই জড়তা, এর মধ্যেই যদি তুমি নিজেকে নিমগ্ন করে রাখো, তাহলে কোনো কিছুই লাভ করতে পারবে না।" এইভাবেই সর্বপ্রথম তিনি আমাদের জাগান।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে সব দেশের অধ্যাত্মশাস্ত্রে একজাতীয় কথাই কী সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। এজন্য অধ্যাত্মশাস্ত্রে বলা হয় যে যারা অধ্যাত্মপথের পথিক তাদের কোনো দেশভেদ নেই, কালভেদ নেই, তারা সবাই যেন এক দেশের অধিবাসী, এক কালের অধিবাসী। আমাদের দেশে যেমন এই উদ্‌বোধনের বাণী, জাগরণের বাণী শোনা যায়, তেমনি ওদের দেশেও, পাশ্চাত্ত্য দেশেও যারা মরমিয়া সাধক, সেই মরমিয়াদের, mystic-দের বাণীতেও এই উদ্‌বোধন ও জাগরণের কথা শোনা যায়। তাঁরা বলেছেন এই অধ্যাত্মপথের প্রথম ধাপ হল awakening অর্থাৎ জাগরণ। যেমন, সাধারণ জীবনযাত্রা চলছিল, এসব কোনো ব্যাপারই জানা ছিল না কোনোদিন, হঠাৎ এক ধাক্কায় যেন আমি জেগে উঠলাম। এইজন্য প্রথম অধ্যায়ে আমরা যে পটভূমিকায় আলোচনা করেছি, সেই পটভূমিকার সার্থকতা

এখানে বুঝতে পারব। যখন জীবনে একটা ধাক্কা আসে, সংকট আসে তখন আমরা এই সুখ-সুপ্তি থেকে জেগে উঠি, নইলে জাগবার কোনো প্রয়োজন হয় না। ঘর আছে, দুয়ার আছে, গাড়ি আছে, ধন ও দৌলত আছে, নিশ্চিন্ত সুখে বেশ নিদ্রা যাচ্ছি! কিন্তু যখন সেই সংকট এল জীবনে, তখন আমরা হঠাৎ জেগে উঠি। যে কোনো কারণে মানুষ যখন জেগে ওঠে প্রথম, সেই জেগে ওঠার লগ্নই হল সূচনা অধ্যাত্মজীবনের।

প্রত্যেক মরমিয়া সাধকের জীবন যদি আমরা পর্যালোচনা করি এইভাবে, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে হঠাৎ তাঁদের জীবনে একটা সংকট ঘনিয়ে এসেছে। ওদের দেশের একজন মস্তবড়ো ধর্মযাজক লুথার। লুথারের জীবনী কার্লাইল তাঁর Hero and Hero-Worship গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সেখানেও দেখি জীবনের প্রথম দিকে লুথার একজন সাধারণ লোক ছিলেন, শিক্ষিত একটি যুবক মাত্র। তাঁর একটি অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল। দুই বন্ধুতে মিলে একদিন বেড়াতে বেরিয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি সুরু হ'ল। আকস্মিকভাবে তাঁর বন্ধুটি বজ্রাঘাতে নিহত হলেন। বন্ধুর প্রাণশূন্য দেহ তাঁর পাশেই লুটিয়ে পড়ল। অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে চোখের সামনে এইভাবে পলকের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখে সেই মুহূর্তেই তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জেগে উঠল ঃ 'Is this life?' 'এই কি জীবন?' এইমাত্র যে ছিল আমার পাশে, হেসে হেসে কত কথা বলছিল, সেই প্রাণের বন্ধুটি আমার এক মুহূর্তের মধ্যে কোথায় চলে গেল?' এই আকস্মিক বন্ধু-বিচ্ছেদের তীব্র আঘাতে তাঁর সমস্ত জীবনের মোড় ঘুরে গেল। এই যে জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়া একটি সংকটের ফলে, এইটি হল জীবনের সবচেয়ে শুভ মুহূর্ত। সেই শুভ মুহূর্তেই মানুষ জাগে, তার আগে সে শুধু ঘুমোয়।

আমরা পারিভাষিক কথায় শুনি, যেমন আগমশাস্ত্রে, তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। আমরা তা নিয়ে অদ্ভুত কল্পনা করি, দেহের মধ্যে কোথায় আছে কুলকুণ্ডলিনী, হয়তো সড়সড় করে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে উপর দিকে যায়; তাকে বলে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, হয়তো কোনো অদ্ভুত অনুভূতি হয়, ইত্যাদি। কিন্তু আসল জাগরণ মানে হচ্ছে অন্য। ঐ কুলকুণ্ডলিনীর মানে হচ্ছে সুপ্ত বা ঘুমন্ত চৈতন্যশক্তি। চাই সেই চৈতন্যের জাগরণ। সাধারণ সব মানুষই আমরা মৃতকল্প, আমাদের মধ্যে যেন প্রাণ নেই কারণ চৈতন্য সেখানে সুপ্ত। কিন্তু হঠাৎ এক ধাক্কায় মানুষ জেগে ওঠে, জীবনে এমনই কোনো সংকট-লগ্ন যখন আসে।

সেই সংকট লগ্নে যখন জেগে ওঠে মানুষ, তখন হঠাৎ তার জীবনের গতিবেগ ফিরে যায়, মোড় ঘুরে যায়।

আধুনিক কালেও শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এর পরিচয় পাই আমরা। বন্দীদশায় আলিপুরের নির্জন কারাকক্ষে তিনি যেন উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠলেন। আমরা অনেক সময় মনে করি একলা নির্জনে থাকতে পারলে খুব ভালো থাকব। কিন্তু তাঁর মতো চিন্তাশীল মানুষ, তাঁর মতো ধ্যানপ্রবণ মানুষও সেই একলা কুঠরির মধ্যে, solitary cell এ যখন আবদ্ধ হলেন, তখন তিনিও যেন পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। দিনরাত তাঁর ভাবনা যে আমার জীবনে যা-কিছু লক্ষ্য ছিল, তার কিছুই পূর্ণ হবে না, এইভাবে জেলের মধ্যেই হয়তো চিরকাল আমাকে পচে মরতে হবে। শেষ পর্যন্ত এই হল আমার জীবনের পরিণাম! এইসব নানা ভাবনা-চিন্তায় তাঁর মতো মনীষী যখন উদগ্র চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, সেই সংকট মুহূর্তে নির্জন অন্ধকার কারাকক্ষ আলোকিত করে দেখা দিলেন স্বয়ং বাসুদেব এবং এই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাই তিনি হাতে তুলে দিলেন শ্রীঅরবিন্দের। আর তার ফলে গীতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।* এটা এ যুগেও এই সেদিনও সম্ভব হলো। পাশ্চাত্ত্য দেশের মরমিয়াদের জীবনেও যেমন এমনি কত অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা গিয়েছে, তেমনি আমাদের দেশেও তা ঘটেছে এবং আজ পর্যন্তও সেটা ঘটছে। বিবেকানন্দের জীবনেও দুঃখদারিদ্র্যের চরম সংকটের মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা ও পথ নির্দেশলাভ।

এই সংকট আজ এসেছে অর্জুনের জীবনে! কিন্তু এলেই শুধু হয় না। সংকট এলেই যদি আমরা মুষড়ে পড়ি, তমোগ্রস্ত হয়েই থাকি, তার থেকে জাগতে না পারি, তাহলে পরের ধাপগুলি আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। সেটা দেখানো হয়েছে এর পরেই এবং অর্জুনের মুখেও শোনানো হয়েছে। মানুষ যখন জাগে তখনই সে প্রথম দেখতে পায় নিজের ভিতরটা। অর্জুনও দেখতে পেলেন, নইলে তাঁর এই উপলব্ধি হত না—'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ' (৭)। যেই জাগলেন অমনি দেখলেন নিজের মধ্যে একটা মালিন্য, একটা আবরণ পড়ে রয়েছে। এই কার্পণ্যদোষ তাঁর চিত্ত-দর্পণকে ঢেকে ফেলেছে। যে চিত্ত দ্বারা জ্ঞানলাভ করতে হবে, সবকিছু কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে, তার এই অবস্থা। যেমন টর্চ নিয়ে বেরিয়েছি অন্ধকারে পথ দেখব বলে, সে টর্চের কাঁচটা যদি মালিন্যের দ্বারা আবৃত থাকে, তাহলে পথ দেখাবে কে? তিনি দেখতে পেলেন 'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ', এবং তার ফলে তিনি হয়ে পড়েছেন 'ধর্মসংমূঢ়চেতা'

* *দ্রষ্টব্য ঃ কারাকাহিনী পৃঃ ৪০-৪৮।*

(৭), ধর্মের যে পথ, কোন্‌টা যে ধর্ম সে সম্বন্ধে তাঁর মূঢ়তা এসেছে। জাগরণের সময় এমনটিই ঘটে থাকে। আমি বুঝে উঠতে পারছি না কোন্‌টা ধর্ম, কোন্‌টা অধর্ম। আমি নিজে পথ খুঁজে পাচ্ছি না। যখন আমি জাগলাম, তখন যাঁকে আমি সামনে দেখলাম প্রোজ্জ্বল ভাস্বররূপে, আচার্যরূপে গুরুরূপে, যাঁকে পেলাম পরম সুহৃৎরূপে, তাঁরই কাছে আমার ব্যাকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠল ঃ 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে' (৭)।

এই হল জাগরণের দ্বিতীয় লক্ষণ। অর্থাৎ জাগবার পর প্রথম নিজের ভিতরের মালিন্যকে আমি দেখতে পেলাম। সেই নিজের ভিতরের মালিন্যকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই এখন আমার জিজ্ঞাসা জাগল। সে-জিজ্ঞাসা শ্রেয় সম্বন্ধে। এতদিন শ্রেয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগেনি। এতদিন শুধু প্রেয়কে আমি চিনেছিলাম। প্রেয় মানে, যা আমার কাছে ভালো লাগে। সেই ভালো-লাগা জিনিসের দিকেই আমি ঝুঁকেছিলাম এবং সেই ভালো-লাগা জিনিসকেই আমি সংগ্রহের জন্য নানাভাবে নানা জায়গা থেকে যোগাড়ের ফিকিরে ছিলাম। তার দ্বারাই আমি মনে করেছিলাম আমার জীবন সুখে কাটবে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা জাগল শ্রেয়ের, প্রেয় থেকে ফিরলাম শ্রেয়তে।

এই প্রসঙ্গে কঠ উপনিষদের কথা স্মরণীয়। সেখানেও সেই একই কথা। যমরাজের কাছে নচিকেতা যখন এইভাবে তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই শ্রেয়ের কথা। সেখানে যমরাজ নানা প্রেয়ের প্রলোভন তাঁর সামনে উপস্থিত করে বলেছিলেন ঃ "এসব তুমি কী জিজ্ঞাসা করছ? ওসব রেখে দাও, তোমাকে আমি অনন্তকাল জীবন দান করছি, যতকিছু দিব্য সুখভোগ—শুধু ঐহিক সুখ নয়, পারলৌকিক স্বর্গীয় যে নানারকম সুখ, তা সবকিছু তোমার সামনে এনে দিচ্ছি, রথ, অশ্ব, গজ, নৃত্যগীত, অপ্সরা, দিব্য নানা সুখের উপকরণ তোমার সামনে অঢেল হাজির করছি।" কিন্তু নচিকেতা তার দিকে ফিরেও চাইলেন না। তিনি একমাত্র শ্রেয়ের জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। এখানেও তেমনি অর্জুন বলছেন ঃ "সেইটিই তুমি 'নিশ্চিতং ব্রূহি,' অভ্রান্তভাবে তুমি আমাকে শ্রেয়ের পথনির্দেশ করে দাও।"

এই শ্রেয়ের পথনির্দেশ-ভিক্ষা, এই যে পরম চাওয়া, এরই নাম আমাদের দেশে দেওয়া হয়েছে আত্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। আমাদের যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র, তার প্রথম সূত্রই হল 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।' এই হল ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা জানার আকুল আকাঙ্ক্ষা। বুদ্ধির কৌতূহল মাত্রকেই জিজ্ঞাসা বলে না। জিজ্ঞাসা কিসের থেকে জাগে? মুমুক্ষা থেকে, মুক্তির ইচ্ছা থেকে। যেমন, যখন

অন্নে টান পড়ে, দেশময় দারুণ দুর্ভিক্ষের সংকট, তখন আমরা বুঝি বুভুক্ষা জিনিসটা কী। অন্নের যদি হাহাকার পড়ে যায়, একমুঠো খাবার যদি না পাই, তাহলে দেশজোড়া সেই তীব্র সংকটে বোঝা যায় যে কাকে বলে বুভুক্ষা আর তখনই সেই বুভুক্ষা থেকে খাদ্যের জন্য আকুল ইচ্ছা জাগে। তেমনি আমার ভিতরে মুমুক্ষা জাগবে, মুক্তির ইচ্ছা জাগবে। কী রকম মুক্তির ইচ্ছা? যেন চারিদিকে আগুন জ্বলছে, 'হুতবহপরীতং গৃহমিব,' সেই গৃহ থেকে বেরিয়ে যেতে চাই, বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পেতে চাই বা শীতল জলে অবগাহন করতে চাই। যদি তখন কেউ বলেন সামনে মুণিমুক্তার পাহাড় করে দিচ্ছি, এসব গ্রহণ করুন, নিয়ে যান, তখন যেমন জলে ঝাঁপ দিয়ে শুধু নিজেকে শীতল করতে চাইব, জলের জন্য যেমন আমার তৃষ্ণা জেগে উঠবে, অন্য কোনো কিছুর জন্য নয়, ঠিক সেইভাবে যখন আমার জীবনের জ্বালা থেকে মুক্তিলাভের জন্য, সংকট থেকে ত্রাণ পাবার জন্য একান্ত স্পৃহা জাগে, তারই নাম হচ্ছে জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসা নিয়ে অর্জুন তাঁর কাছে বলছেন, "আমাকে নিশ্চিতভাবে বলো।" এইটিই হল প্রকৃত জিজ্ঞাসা। বুভুক্ষা, পিপাসা, এইসব জৈব তৃষ্ণার মতো যখন দেখা দেয় আত্মিক তৃষ্ণা, তখন তাকেই বলে মুমুক্ষা।

প্রথমত সেইজন্য আমাকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে। বলবেন তিনি নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনি কি শুধু বলেই যাবেন? কার উদ্দেশ্যে বলবেন কোন্ সম্বন্ধের সূত্রে? আমাদের দেশে আজকাল নানারকম ভাষণ হয় সভা-সমিতিতে। কিন্তু সবক্ষেত্রে এই সব সভাসমিতির ভাষণের দ্বারা শ্রোতামণ্ডলীর অন্তরে যথার্থ অনুপ্রেরণার সঞ্চার করা যায় না। কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সেখানে সম্বন্ধ নেই। সভায় অনেক লোক নানা জ্ঞান লাভ করবার জন্য বা শুধু শুনবার কৌতূহল নিয়েই সমবেত হন, কিন্তু শিষ্যরূপে সেখানে কেউ আসেন না। শিষ্য মানে অনুশাসনযোগ্য। সেই অনুশাসনের আকাঙ্ক্ষা নেই মনে। শ্রেয়ের সম্বন্ধে অনুশাসন বা পথ-নির্দেশের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যখন কেউ আসেন, তখন তাঁর হৃদয়ে গুরু সেই তত্ত্বটি সঞ্চারিত করে দেন। সভাসমিতিতে কারুর সঙ্গে কারুর সম্বন্ধসূত্র নেই, বক্তার সঙ্গে শ্রোতার নেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কেননা সশ্রদ্ধ শুশ্রূষু হয়ে শিষ্যরূপে সেখানে কেউ আসেন না; এমনি শুনবার জন্য, জ্ঞানের কৌতূহল মেটাবার জন্য হয়তো আসেন। তাই সেই শিষ্য ও গুরুর যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধসূত্র যখন স্থাপিত হয়, একমাত্র তখনই শুধু সেই অনুশাসন তার কাছে গ্রহণীয় হয়।

উপনিষদের সেই অনুপম উপমা মনে পড়ে, শিষ্য হলেন 'অধরারণি' আর গুরু হলেন 'উত্তরারণি'! অরণি মানে হল অগ্নিমন্থনের কাঠ। দুটি কাঠে ঘর্ষণের

ফলে আগুন জ্বলে উঠবে। আগেকার দিনে যজ্ঞ সমিধ আহরণ করে অগ্নি প্রজ্বালন করা হত। সেই অগ্নিমন্থনের বিশিষ্ট প্রক্রিয়াটি হল দুটি কাঠের বা দুটি সমিধের পরস্পর ঘর্ষণ। একটি অধরারণি, অধরকাষ্ঠ, নিচের এই কাঠটি হল শিষ্য। উত্তরারণি বা উপরের কাঠটি হলেন গুরু। অধরকাষ্ঠ passive, নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে। সে নিজেকে যেন পেতে দেয়, মেলে ধরে তার আপন সত্তাটি। এখানে অর্জুন, যেমনি নিজেকে তাঁর চরণে বিছিয়ে দিলেন, পেতেদিলেন, 'শিষ্যস্তেঽহং' বলে, যেমনি তাঁর হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলেন, তখনই তার উপর উত্তরারণি, ঊর্ধ্বের যে অরণি তা স্থাপিত হল। তারপর ঘর্ষণ চলতে থাকল। এই ঘর্ষণকালে অর্জুন এক একবার জিজ্ঞাসা করছেন, সেই জিজ্ঞাসার দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে, আরও উৎসাহিত হয়ে আচার্য শ্রীভগবান বলছেন। এই বলতে বলতে তবে আগুনটা হঠাৎ জ্বলে উঠল, এবং সেই আগুন জ্বলে উঠে অর্জুনের সমস্ত অজ্ঞানকে পরিশেষে নিঃশেষে ভস্মীভূত করল। তাই অর্জুন বলছেন ঃ

শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।। ৭।।

এই শ্লোকটিতে আর একটি বিশেষ কথা রয়েছে, সেটি হল 'প্রপন্ন'। গীতার প্রারম্ভই হল প্রপন্ন হওয়ার মধ্যে দিয়ে এবং শেষও প্রপন্নতার পরাকাষ্ঠায়। প্রপন্নের অর্থ, যার মধ্যে জেগেছে প্রপত্তি অর্থাৎ শরণাগতি। মানুষ যখন ভগবানে প্রপন্ন হয়, আচার্যতে যখন প্রপন্ন হয়, তখনই আচার্য তাকে এই বিজ্ঞান বা জ্ঞান দিতে পারেন। গীতায় বার বার, আদিতে যেমন, মধ্যেও তেমনি, আবার অন্তেও সেই একই প্রপত্তি। এখানে প্রারম্ভে প্রপত্তি শুধু শুনবার জন্য, অনুশাসনের জন্য। তারপর তাঁর সঙ্গে ক্রমশ ক্রমশ আরও নিবিড় ঐক্যের জন্য প্রপত্তি। শেষে পরিপূর্ণ ভাবে তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য প্রপত্তি। এইজন্য প্রপত্তিও ক্রমশ গাঢ়তর, গাঢ়তম হবে, তা আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব যখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে আমরা এগিয়ে যাব। শিষ্য যখন তাঁর কাছে এইভাবে অনুশাসনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এল, একান্তভাবে প্রপন্ন হল, তখন সেই অনুশাসনের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য আচার্যের শ্রীমুখ থেকে অনুশাসনের বাণী নিঃসৃত হতে আরম্ভ করল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে ঔপনিষদ জ্ঞানের যেটি সর্বোত্তম সার বা রহস্য, সেই রহস্যটি বললেন। কেননা আচার্য তো কিছু কার্পণ্য করে বলেন না। আচার্য তাঁর সমস্যার একটা তাৎকালিক সমাধান করে দিয়ে নিস্তার খুঁজবেন না। তিনি চান জীবনের যে সমস্যা, সে সমস্যার যে মৌল সমাধান, শিষ্যকে সে-বিষয়ে অবহিত করতে। মনে রাখতে হবে একেই আমাদের দেশে বলা হয়েছে ঐকান্তিক

দুঃখনিবৃত্তি। এই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই খুঁজছি আমরা। নইলে তাৎকালিক দুঃখনিবৃত্তির অনেকরকম উপায় আছে জগতে। অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে অন্য জিজ্ঞাসার এখানেই তারতম্য।

আজকের দিনে পাশ্চাত্য দেশ বিজ্ঞানের একটা আশ্চর্য অকল্পনীয় অগ্রগতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তার মূল প্রেরণা কী? দুঃখনিবৃত্তি। মানুষ যেভাবে আজ আছে, আরও ভালোভাবে সে থাকতে পারবে কিনা, নানারকম তার যে দুঃখ, সে দুঃখের লাঘব আরও করা যায় কিনা তার সম্পদ বৃদ্ধি করে, উপকরণ বৃদ্ধি করে—এই প্রয়াসে আজকের বিজ্ঞান নিরন্তর ব্যাপৃত। সুতরাং বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসাও দুঃখনিবৃত্তির জিজ্ঞাসা। কিন্তু সেই দুঃখনিবৃত্তি হচ্ছে তাৎকালিক মাত্র, সাময়িক মাত্র। পরিপূর্ণ দুঃখের নিবৃত্তি সে খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু ভারতবর্ষ যে দুঃখনিবৃত্তি খুঁজেছে সেটা ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক। ঐকান্তিক মানে দুঃখনিবৃত্তি একান্তভাবে হবেই, এই সুনিশ্চিত গ্যারান্টি চাই এবং দ্বিতীয় হচ্ছে আত্যন্তিক মানে দুঃখনিবৃত্তি যেটা হবে, অত্যন্তরূপে চিরকালের মতো হবে। কোন শেষ না রেখে সম্পূর্ণরূপে হবে অর্থাৎ Sure and absolute, certain and total.

আমাদের অসুখ হয়েছে, ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে ওষুধ দিলেন, কিন্তু ওষুধ দিয়ে ভরসা দিতে পারলেন না যে জ্বরটা ছাড়বেই। আশা-ভরসা যদিও বা তিনি দেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁর ওষুধটা ঐকান্তিক। যদি চিকিৎসক অভিজ্ঞ হন এবং রোগটাকে ঠিক নির্ণয় করে থাকেন, তাহলে তিনি বুঝবেন যে এই ওষুধ পড়ামাত্রই রোগের নিবৃত্তি হবে। তাতে ঐকান্তিকতার হয়তো তিনি ভরসা দিলেন। কিন্তু ঐকান্তিকতার ভরসা দিলেও আত্যন্তিকতার ভরসা পাই না। মানে, আজকের জ্বর কালকে ছেড়ে যাবার ভরসা দিলেন, ছেড়ে গেলও বটে, কিন্তু আবার যে সাত দিন পরে হবে না, এক মাস পরে হবে না, এক বছর পরে হবে না, কিংবা পাঁচ বছর পরে হবে না, কোনোদিনই আর হবে না, এ ভরসা কেউ দিতে পারে না। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির সেইজন্য একমাত্র পথ হচ্ছে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা। এই অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার দিকে সেইজন্যই মানুষ ফেরে। জানতে চায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানীর কাছে, "এমন কোনো পথ তুমি বলতে পারো কিনা, এমন কোনো নির্দেশ তোমার কাছে আছে কিনা, যা মানুষকে তার দুঃখের হাত থেকে চিরকালের জন্য সুনিশ্চিত ত্রাণ এনে দেবে।" আর সেই দুঃখেরই বা কত না বিচিত্র রূপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক।

সেই চিরকালের মতো যে ত্রাণ সেইটে এনে দেবার জন্যই শ্রীভগবান অর্জুনকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে কী দিলেন? আত্মজ্ঞান। এ কথা বলে দিলেন না যে যুদ্ধ

করো, এটা করলেই তোমার ভালো হবে, কিংবা যুদ্ধ করলে তোমার রাজ্যলাভ হবে, সুখলাভ হবে। শুধু এই বলে তাকে উদ্বুদ্ধ করেও নিজের কর্তব্য শেষ করতে পারতেন। অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাঝে মাঝে সেইরকম কথাও শুনিয়েছেন। তুমি যদি যুদ্ধে জয়লাভ করো তাহলে সসাগরা বসুন্ধরা ভোগ করতে পারবে কিংবা যদি হেরেও যাও বা নিহত হও তাহলে স্বর্গে যাবে ইত্যাদি প্রলোভনও তিনি দেখিয়েছেন। সেই প্রলোভন দেখিয়ে তার মোহ বা ক্লৈব্য নিরস্ত করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তিনি বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের অবতারণা করলেন। কারণ তিনি দেখলেন অর্জুনের বিষাদ বা ক্লৈব্য একটা symptom বা উপসর্গ মাত্র। মূল রোগ হল অর্জুন মমতায় আবদ্ধ, মোহগ্রস্ত, যার মূলে আছে অহন্তা। তারই সমূলে উচ্ছেদ প্রয়োজন, আর তার সাধন হল আত্মজ্ঞান।

সেই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের মূল কথা কী তা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। সেই কথাটি হচ্ছে দেহ ও দেহীর ভেদ। এই তথ্যটি প্রথমেই তিনি স্মরণ করিয়েছেন ১৩ শ্লোকে ঃ

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।। ১৩ ।।

এই দেহের সঙ্গে দেহীকে বা আত্মাকে, দেহের মধ্যে যিনি বাস করছেন তাঁকে আমরা এক করে বসে আছি। সুতরাং আত্মজিজ্ঞাসার মূল কথা হল দেহ থেকে পৃথক করে আত্মাকে উপলব্ধি করা, চেনা বা জানা। এই ভেদ বা বিবেকই হ'ল যথার্থ জ্ঞান।

এই যে দেহ-দেহীর ভেদ বা পার্থক্য-বোধ, এই বোধটি তিনি প্রথম সঞ্চার করতে চাইলেন শিষ্যের মধ্যে। তারপর সেই আত্মার নানারকম লক্ষণ ভগবান অর্জুনকে শোনালেন এবং সেই লক্ষণের দ্বারা আত্মার অজরত্ব অমরত্ব ইত্যাদি তিনি প্রতিপাদন করলেন, বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সেই বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রথমে তাকে দেখালেন, এই যে দেহ-দেহী, এ দুটি কিন্তু একেবারে আলাদা তত্ত্ব, সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। একটি চেতন, অপরটি জড়। তুমি দেহের নানারকম সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ ইত্যাদি সব দ্বন্দ্ববোধের দ্বারা বিহ্বল হচ্ছ কেন? দেহ-জনিত এ সব বোধ আজ আছে কাল নেই, 'আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ' (১৪)। এজন্য সাধককে প্রথম কী সাধন অবলম্বন করতে হবে? তিতিক্ষা ও ধীরতা। ঐ যে আমরা দেখলাম, জাগালেন তো 'উত্তিষ্ঠ' বলে, জাগানোর পর আমি দেখলাম ভয়ানক জ্বালা। ঘুমিয়ে ছিলাম যতদিন বেশ ছিলাম আরামে। সুতরাং ঘুমটাই তো

ছিল ভালো।

মানুষের জীবনকে, বিশ্বসৃষ্টিকে যদি পর্যালোচনা করি, আমরা কী দেখি? যেমন যেমন চৈতন্য বাড়ছে, তেমন তেমন দুঃখ বাড়ছে, কষ্ট বাড়ছে। তাহলে চৈতন্য লাভ করবার তো কোনো প্রয়োজন নেই, অচেতন হয়ে থাকাই তো কাম্য। পাথরের যেমন কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু তারপর যেই একটু চৈতন্য হল, পওস্তরে এলাম, সেখানে প্রথম দুঃখ-কষ্ট দেখা দিল। সেখানে কিসের কষ্ট? জৈবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদির কষ্ট। কিন্তু যেই মানুষের স্তরে এলাম, তখন কতরকমের মানসিক বিচিত্র দুঃখ আমাদের ঘিরে ধরছে ক্রমশ। অথচ মানুষ কি পশুর চেয়ে উন্নত নয় চেতনার দিক দিয়ে? সুতরাং চেতনা যেমন যেমন বাড়ছে, দুঃখ, বেদনা, পীড়াও সেই সঙ্গে বাড়ছে। অর্জুন তামসিকতায় নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, চোখ বুঁজতে চেয়েছিলেন এই সংকট দেখে। যখন ভগবান তাঁকে জাগালেন, তিনি দেখলেন ভয়ানক এসব দ্বন্দ্ব। এই শীত-উষ্ণ ভালো-মন্দ রাগ-দ্বেষ সুখে-দুঃখের দ্বন্দ্বে আমরা আকুল হয়ে উঠছি। সংসারই দ্বন্দ্বময়।

সেইজন্য ভগবান তাঁকে ভরসা দিচ্ছেন, বলছেন, একটা কাজ করো আগে, 'তিতিক্ষস্ব ভারত' (১৪), প্রথম তিতিক্ষা করো, সহ্য করতে শেখো। অত আকুল হয়ো না। এই আকুলতা, অধীরতা তোমার দুঃখের উপলব্ধি থেকে হচ্ছে। বুঝলাম তোমার গায়ের উপর চারিদিক থেকে নানারকম আঘাত বা মার এসে পড়েছে। সেই যে আঘাত তোমার গায়ের উপর এসে পড়েছে তা একটু সহ্য করে থেকো। কেননা এটা চিরকাল থাকবে না, আজ আছে কাল নেই, 'আগমাপায়িনো অনিত্যাঃ'। কিন্তু তুমি এটাকেই মনে করছ যেন চিরকালের জিনিস। দুঃখটাকে, শোকটাকে এমন বড়ো করে দেখছ যে তুমি মনে করছ এইটেই যেন চিরন্তন, এর বুঝি আর কোনোদিন শেষ নেই। কিন্তু সবই আজ আছে, কাল নেই, দুঃখের বেলাতেও তাই। অতএব 'তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত', দ্বন্দ্ব সহন করো, আকুল হয়ো না। এই হল 'ধীরতা' যা সর্বাগ্রে অর্জন করতে হবে সাধনার পথে 'ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।' গীতা শুধু তত্ত্বের নয়, মূলতঃ সাধনারই পথ-নির্দেশক। তাই গীতায় শ্রীভগবানের প্রথম আদেশের বজ্রনির্ঘোষে আমাদের সাধন-জীবনে প্রথম জাগরণ, আমাদের উদ্বোধন। উদ্বুদ্ধ হবার পর এবার দ্বিতীয় আদেশ পেলাম ঃ 'তান্ তিতিক্ষস্ব'। সাধনার পথে তাই গোড়াতেই শিখতে হবে তিতিক্ষা। প্রথম অনুশাসন জাগরণের, দ্বিতীয় অনুশাসন দ্বন্দ্বসহনের।

এই তিতিক্ষা, ধীর শান্তভাবে সইতে শেখানোর পর ক্রমশ ক্রমশ আক্ষরিকভাবে তিনি অর্জুনকে আত্মস্বরূপের পরিচয় দিলেন। সেই পরিচয় দেবার

সঙ্গে সঙ্গেই বার বার তাকে মাঝে মাঝেই আদেশ করেছেন ঃ 'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত'। আবার ১৮ শ্লোকে উদ্বুদ্ধ করছেন, যুদ্ধ করো কিন্তু আত্মাকে চেনো, চিনে যুদ্ধ করো।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।। ১৮ ।।

এইজন্য আবার ২২ শ্লোকে তিনি শুনিয়েছেন ঐ প্রসিদ্ধ শ্লোকটি ঃ

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। ২২ ।।

এই হল দেহ ও দেহীর ভেদ। একদিকে 'শরীরাণি' বহুবচন, নানা দেহ অসংখ্য শরীর, অপর দিকে 'দেহী' একবচন। সেই এক দেহীই নানা দেহ ধারণ করছেন, আবার ছেড়ে ফেলছেন পোশাক-বদলের মতো। এই দেহীকে আর শরীরকে চেনাচ্ছেন এইভাবে যে দেখো দেহী আলাদা আর দেহ বা শরীর আলাদা। দেহ ও দেহীর এই যে ভেদ, সেই ভেদকে সুস্পষ্টভাবে চিনিয়ে অর্জুনকে ক্রমশ উদ্বুদ্ধ করেছেন জানবার জন্য, বুঝবার জন্য, জীবনের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য। "তুমি যে সংকটে আকুল হয়েছ, সেই সংকটত্রাণের উপায় তোমার কাছেই রয়েছে।" আগে একবার বলেছেন ; 'উত্তিষ্ঠ পরন্তপ' (৩), এখন আবার ৩৭ শ্লোকে বললেন ঃ 'উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ'।

অর্জুনের অনুযোগ যে যুদ্ধ করতে বলে তুমি তো মহাসংকটের মধ্যে আমায় ফেলছ, সংকটত্রাণ করছ কোথায়, যার জন্য তোমার শরণ নিলাম? তাই একটি ত্রাণের মন্ত্র তাকে শুনিয়ে দিলেন ৩৮ শ্লোকে ঃ

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ।। ৩৮ ।।

যুদ্ধ তো করতে বলছেন, কিন্তু কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে সেইটি হল আসল কথা। সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় এই দ্বন্দ্বের বিষম সংকট থেকে ত্রাণের যে পরম ঔষধ, সেই সমত্বের ঔষধটি তিনি প্রয়োগ করলেন ৩৮ শ্লোকে। এই সমভাব নিয়ে, 'সমে কৃত্বা' যদি যুদ্ধ করো তাহলে 'নৈবং পাপমবাপ্স্যসি'— এই চরম মন্ত্রটি দান করলেন। তার সঙ্গেই শেষ করলেন তিনি সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানের, সম্যক জ্ঞানের প্রসঙ্গ ঃ

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।। ৩৯ ।।

এবার যোগের কথা শোনো। যোগে তিনি কী শেখালেন? ৪৫ শ্লোকে তা দেখিয়েছেন ঃ

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।।৪৫।।

এই শ্লোকটির এত অনুপম অগাধ রহস্য যে তার শেষ নেই। প্রথম বললেন 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হও। বললে তো তুমি 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব,' কিন্তু নিস্ত্রৈগুণ্য হতে হলে আমাকে কী করতে হবে? 'নির্দ্বন্দ্ব' হতে হবে। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির সম্বন্ধ। নির্দ্বন্দ্ব হতে হলে কী হতে হবে? দ্বন্দ্বের দোলায় তো দিনরাত দুলছি। 'নিত্যসত্ত্বস্থ' হও, সব সময়ে সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকো। সব সময় সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকা কখনো কি সম্ভব? দেহ-গেহের ফিকির নেই? অন্য সাংসারিক কাজকর্ম নেই? তাই সব সময় সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকা কখনো সম্ভব হতে পারে না দেহধারী মানুষের পক্ষে। শ্রীভগবান বলছেন ঃ হ্যাঁ, সম্ভব হতে পারে, তার জন্য সাধনা করতে হবে। নিত্যসত্ত্বস্থ হতে হলে কী করতে হবে। 'নির্যোগক্ষেম'। দেহ-গেহের এত কেন দুশ্চিন্তা তোমার? সেইজন্যই তো তুমি দ্বন্দ্বে দুলছ। একজন তোমার নিয়ন্তা আছেন, যিনি তোমাকে এনেছেন, তিনি তোমার 'যোগ' অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি, তিনিই তোমার 'ক্ষেম' অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা, সবকিছু নির্বাহ করবেন। অর্থাৎ তিনি পাইয়েও দেবেন যখন যেটি প্রয়োজন এবং সুরক্ষিত করে রাখবার ব্যবস্থাও করবেন। এটুকু নিশ্চিন্ততা তুমি লাভ করতে পারো না, মনে ধারণা করতে পারো না? তাহলেই তো তোমার দ্বন্দ্ব ঘুছে যায়, তুমি নিত্যসত্ত্বস্থ থাকতে পারো। এটুকু শান্ত, সত্ত্বস্থ হলেও আবার পরক্ষণেই চিন্তা হয় কোথায় গিয়ে শোব, কেমন করে খাব, কালকে টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে কেমন করে যোগাড় করব, এইজন্য তোমার দ্বন্দ্ব আসে, সত্ত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাও। অতএব নির্যোগক্ষেম হও। সংগ্রহও কোরোনা, রক্ষাও করতে যেওনা। নির্যোগক্ষেম কেমন করে হব? তখন সেই মূল কথাতে ফিরে এল—'আত্মবান্,' আত্মবান হও তুমি। তুমি আত্মাকে, নিজের স্বরূপকে চেনোনি। এই আত্মজ্ঞান যদি তুমি লাভ করতে পারো তাহলেই জানবে যে সেই আত্মা থেকেই তোমার সব দ্বন্দ্ব বা অভাব অভিযোগ সবকিছুরই নিরসন। অনাত্মা এই দেহের বন্ধন কাটিয়ে আত্মবান হবার চেষ্টা করো। আত্মবান হওয়া মানেই সমত্ব লাভ করা। সেইজন্যই তাকে বললেন ৪৭ ও ৪৮ শ্লোকে ঃ

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।৪৭।।
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।৪৮।।

কিন্তু সে সমত্ব কোথায় পাব? সেজন্য প্রথমেই তিনি শরণ নিতে বললেন কার? এখানেই গীতার মূল শরণাগতির প্রারম্ভ ৪৯ শ্লোকে ঃ 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ,' এই বুদ্ধির তুমি শরণ নাও। এই বুদ্ধিই তোমায় পথ দেখিয়ে দেবে। তার দ্বারাই তোমার যোগ লাভ হবে 'যোগায় যুজ্যস্ব' (৫০)। বুদ্ধির শরণ নিলে তোমার যোগ খুলে যাবে। যোগটা কী? 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' (৫০), কর্মের কৌশলই যোগ। বিষম কর্মের মধ্যে সম থাকার নামই যোগ। সেই সমত্বের কৌশলরূপ যোগটি শিখবে, এ যে-কৌশলটির কথা তোমায় বললাম। এতো এখন মুখের কথা মাত্র শোনা হল, সেটা যথার্থ লাভ করবে কখন? যখন তুমি বুদ্ধির শরণাগতি লাভ করবে। সে তোমায় এই সমত্বলাভের বা যোগের কৌশলটি শিখিয়ে দেবে।

তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপসংহারে দেখালেন, এই বুদ্ধি যখন পরিপক্ক হয়, এই বুদ্ধির সামান্য স্ফুলিঙ্গটিকে, জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র কণিকাটিকে আশ্রয় করতে করতে যখন সেটিকে প্রদীপ্ত বৈশ্বানরে পরিণত করতে পারি, যখন সমস্ত বুদ্ধি জুড়ে সেই দীপ্তি ফুটে উঠে 'ভাস্বরং আকাশকল্পং' হয়ে ওঠে চিত্ত, প্রজ্ঞার আলোকে সবকিছু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন কী হয়? সেই আলোতে সমস্ত বিশ্ব ছেয়ে যায়। তেমন অবস্থা যিনি লাভ করেন তাঁর নাম স্থিতপ্রজ্ঞ। সেই স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা শ্রীভগবান শোনালেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপসংহারে। এইভাবে সমস্ত কামনা থেকে, দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হলে দুঃখে কোনো উদ্বেগ জন্মাবে না, সুখে আর কোনো স্পৃহা আসবে না। তখন বুদ্ধির অচঞ্চল দীপ্তি হবে চির-অম্লান ও সমত্বের শিখা চির-উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকবে।

এখন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সে-বুদ্ধি কোনো আলো দেয় না, পথ দেখায় না। কারণ বাইরের বায়ুর দ্বারা আহত হয়ে প্রদীপের ক্ষীণ শিখার মতো সে যেন কেবল নিভেই যাচ্ছে। কখনো কখনো একটুখানি স্ফুলিঙ্গ হয়তো দেখা দেয় আবার সে যেন বাত্যাহত হয়ে নিভন্ত হয়ে আসে। কিন্তু সেই জ্যোতির অনির্বাণ শিখা, সর্বদা সম নিষ্কম্প শিখা যিনি জাগিয়ে রাখতে পারেন, বাইরের বিষয়ের হাওয়া থেকে যিনি তাকে বাঁচাতে পারেন, তিনি হন স্থিতপ্রজ্ঞ, যেমন বলেছেন পাতঞ্জল যোগদর্শনেও, 'ক্লেশতিমিরবিনাশো যোগপ্রদীপঃ' এবং

সেই সঙ্গে সাধককে সজাগ করছেন, জনম-মরণের অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে ক্লেশরূপ তিমিরের বিনাশকারী যোগের এই প্রদীপ আমি কত কষ্টে লাভ করেছি। এ যেন আর না নেভে, এজন্য সাধককে সজাগ হয়ে আঁচল দিয়ে সেই দীপটিকে বাইরের হাওয়া থেকে বাঁচাতে হয়। সেই আত্মদীপের বর্ণনা সেই প্রদীপ্ত অগ্নির বর্ণনা, সে জ্যোতির বর্ণনা শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে শোনালেন।

এই স্থিতপ্রজ্ঞতার ভূমিকে অর্জুন যদি সেই লগ্নেই চিনে ফেলতে পারতেন তাহলে দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতার উপসংহার হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর যে নিবিড় মোহ, তাঁর যে গভীর শোকের আবিলতা, সেই আবিলতা এখনও দূর না হওয়াতে এটা একটা কথার কথা মাত্র শোনা হল। এই স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার মাত্র একটা আভাস তিনি যেন লাভ করলেন। কিন্তু কেমন করে সেটা উপলব্ধি করবেন, তার যেন কোনো দিশাই তিনি খুঁজে পেলেন না। সেইজন্যই তৃতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে শ্রীভগবান একেবারে প্রথম ধাপ থেকে এই আগুনের শিখাকে কেমন করে জাগাতে হয়, কেমন করে তাকে পুষ্ট করতে হয়, বর্ধিত করতে হয়, সর্বব্যাপী লেলিহান শিখায় তাকে বৈশ্বানরে পরিব্যাপ্ত করতে হয় বিশ্বরূপে, এবং কিসে বা কেমন করে তাকে নিভিয়ে দেয়, সেইসব দেখাতে আরম্ভ করলেন অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায় থেকে সেই সূত্রটির আলোচনা করব আমরা।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

আমরা দেখলাম জীবন দ্বন্দ্বময়। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন তারই প্রতীক। সেখানে, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় অর্জুনকে সেই দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান, সেই ভূমি শ্রীভগবান দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছই কী করে, যাই কী করে, এবার এল সেই প্রশ্ন। আর অর্জুনের মনে একটি সংশয় জাগল যে এই-যে বর্ণনা তিনি করলেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে, এটা সুস্থিত পরম জ্ঞানের মহিমার বর্ণনা। কথাটির মধ্যে আছে 'স্থিতপ্রজ্ঞ', প্রজ্ঞা যেখানে সুস্থিত। সেই আদর্শ স্থিতপ্রজ্ঞের মহিমা বর্ণনা করলেন শ্রীভগবান, অথচ তাঁকে ঠেলে দিলেন অস্থির কর্মের মধ্যে। একদিকে সুস্থিত জ্ঞান আর অপর দিকে অস্থির কর্ম, এই দুইয়ের সমন্বয় কোথায়? তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছ, আমাকে এগিয়ে যেতে বলছ সেই উত্তুঙ্গ শিখরের দিকে, অথচ আমাকে ঠেলে দিচ্ছ কোথায়? না, অস্থির কর্মের অতল গহ্বরে। তাহলে সেই অস্থির কর্মের সঙ্গে এই সুস্থিত জ্ঞানের কী সম্বন্ধ সেইটে আমাকে বুঝিয়ে দাও।

যাঁরা অধ্যাত্মশাস্ত্র আলোচনা করেছেন তাঁরা জানেন সব শাস্ত্রে আমাদের দেশের রীতি হল প্রথম লক্ষ্যনির্দেশের পর গতিনির্দেশ, শেষ ফলনির্দেশ। যেমন ব্রহ্মসূত্র। সেখানেও প্রথম ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণনা, শেষকালে ফলের বর্ণনা। যোগদর্শনেও একই ধারা। সেখানেও প্রথম সমাধিপাদে সমাধির স্বরূপ বর্ণনা, যোগের স্বরূপ বর্ণনা। আগেই যোগের স্বরূপ বর্ণনা শুনে কী হবে? লক্ষ্যটা আগে আমার কাছে সুপরিস্ফুট হওয়া দরকার। কী পেতে চলেছি তার সুস্পষ্ট জ্ঞান দরকার, নইলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা। তারপর সাধনপাদে সাধনের বিন্যাস করেছেন। শেষে কৈবল্যপাদে মুক্তিরূপ ফলের বর্ণনা। সর্বত্র এই রীতি। আমাদের সন্ধ্যাবন্দনেও প্রথমেই আচমনের মন্ত্রে 'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' বলে লক্ষ্য নির্দেশ করা হয়েছে। আপোমার্জনাদির দ্বারা, প্রাণায়ামাদি অন্যান্য ক্রিয়ার দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করতে করতে শেষে সেই চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মস্বরূপ লাভরূপ লক্ষ্যনির্দেশের পর তার জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ ভূমি লাভের নির্দেশ দিয়ে এখন তৃতীয় অধ্যায় থেকে সাধনরূপ কর্মযোগের

উপস্থাপন। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান যে তত্ত্বটি অর্জুনের কাছে বিশেষভাবে উপস্থাপিত করেছেন তার নাম যজ্ঞতত্ত্ব। যজ্ঞই হল গীতোক্ত সাধনার প্রথম ধাপ। তাকে 'যজ্ঞ' এই পারিভাষিক নাম কেন দেওয়া হয়েছে তারও তাৎপর্য আমাদের বুঝতে হবে। 'যজ' ধাতুর দেবপূজা, সঙ্গতিকরণ, দান ইত্যাদি অনেক অর্থ আছে সংস্কৃতে। কিন্তু 'যজ' ধাতুর আসল তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যজ্ঞে, যজ্ঞ মানে নিজেকে উৎসর্গ করা, দেবতার উপাসনা দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করা, দেবতার সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া।

এই যে যজনা, এই যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এখন আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। বিশেষ করে যজ্ঞে এবং কর্মেতে যে পার্থক্য সেটিকে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। কারণ যজ্ঞও একরকম কর্ম, তা কর্ম ছাড়া কিছু নয়। তাহলে সাধারণ কর্মের সঙ্গে যজ্ঞরূপ কর্মের কী পার্থক্য? যজ্ঞের এইখানেই মৌলিকতা বা পার্থক্য যে যজ্ঞের মধ্যে দুটি জিনিস এসেছে যা সাধারণ কর্ম থেকে তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছে। একটির নাম 'বিধি' আর একটির নাম 'বিষ্ণু' বা ব্যাপক সত্তা বা চেতনা, যিনি ইষ্ট বা আরাধ্য। যজ্ঞ করতে হলেই কতকগুলি বিধিবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে কর্ম করতে হবে। যথেচ্ছভাবে, খামখেয়ালিভাবে কর্ম করা চলবে না। তা করতে হবে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে, মহৎ আদর্শ নিয়ে। সেই আদর্শের যে নামই দিই, বিষ্ণুই নাম দিই বা কৃষ্ণই নাম দিই বা শিবই নাম দিই বা অন্য কোনো মহৎ নাম দিই, যজ্ঞের মূল লক্ষ্য হল একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা। বিষ্ণু বা এক মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিধিবোধিত বা সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে যখন আমি কর্ম করি তখন সেই কর্ম হয়ে ওঠে যজ্ঞ। এই মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে, অর্থাৎ নিজের দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য শুধু কর্ম না করে, কোনো মহৎ আদর্শের দ্বারা প্রেরিত হয়ে যে কর্ম, এবং বিধিবোধিত সুনিয়ন্ত্রিত যে কর্ম তারই নাম হচ্ছে যজ্ঞকর্ম।

অধ্যাত্মপথে এগিয়ে যাবার নির্দেশ পাওয়া গেল এই যজ্ঞকর্মে। কারণ কর্ম এখন থেকে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করল, নিয়ন্ত্রণ এল জীবনে। এতদিন জীবন উদ্দাম স্রোতে ভেসে চলেছিল স্বেচ্ছাচারিতায়, উচ্ছৃঙ্খলতায়। ইন্দ্রিয় আমায় যখনই যেমন প্রেরণা দিয়েছে, আমিও ঠিক সেই মতোই চলে এসেছি। চলে এসে দেখছি, জীবন আমার সব দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়েছে। তখন আমি সচেতন হই। তখন আমি মনে করি কেমন করে এই জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সোনার ফসল ফলাতে পারব। এই সোনার ফসল ফলাতে হলে কী করতে হয়? সর্বাগ্রে ক্ষেতের চারিপাশে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে যা-কিছু ফলাব, বাইরের লোলুপ পশুরা, গরু-ছাগলে সব খেয়ে যাবে। তাছাড়া যেসব আগাছা সেখানে জন্মাবে, সেগুলি উৎপাটন করতে

হবে। বেড়া দেওয়া ও আগাছা উৎপাটন, এই দুটি কাজ যেমন করতে হয় বাগান করতে বা চাষবাস করতে, তেমনি মানব-জীবনের কৃষিকাজেও সেইভাবে কাজ করা দরকার। তা না জানার দরুণ নানারকম উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে 'মানবজমিন' যেসব আগাছায় ভরে গিয়েছে, আগে তাদের উৎপাটন করতে হবে। বাইরে থেকে নানারকম ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা, যাকে বলা হয়েছে 'মাত্রাস্পর্শ', বিষয়-ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, সেই মাত্রাস্পর্শের দ্বারা যদি আমি চালিত না হই, সুখের জন্য, নিজের দেহ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণের জন্য কর্ম যদি না করি, জীবনরূপ কৃষিক্ষেত্রের চারিদিকে বেড়া দিয়ে, বিধির বাঁধন দিয়ে যদি তা সুরক্ষিত করে তুলি, তাহলে আমি পা দিলাম কোথায়? যজ্ঞরূপ কর্মে। এই যজ্ঞরূপ কর্মের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক যে কাম-ক্রোধ ও তার দরুণ স্বেচ্ছাচারিতা, তার কথা ভগবান এই অধ্যায়ের শেষের দিকে শোনাবেন।

যজ্ঞের অনেকরকম শ্রেণী বা প্রকারভেদ আছে। নানা ধরনের যজ্ঞ আছে, ভগবান সেটা পরে দেখিয়েছেন। যজ্ঞের যে নানা রকম বা ভেদ হচ্ছে তার কারণ কী? যজ্ঞের এই প্রকারভেদ হবার কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই দেখতে হয় আমরা কি করি যজ্ঞে? আহুতি দিই। কিসে? অগ্নিতে। এই যে অগ্নি, সেই অগ্নির নানারকম তারতম্য আছে। অর্থাৎ সকলেই যজ্ঞ করছেন বিশ্বে এসে। এ-ও আর একটি অপরূপ দৃষ্টিভঙ্গী। যজ্ঞ জিনিসটা ঋষিরা ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। সমস্ত নিখিল বিশ্বই এক বিরাট মহাযজ্ঞ তাঁদের চোখে। এই যজ্ঞশালাতে সকলেই ঋত্বিক, সকলেই সেখানে আহুতি দিচ্ছেন। কেউ আহুতি দিচ্ছেন ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে, ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে বাহ্য নানা বিষয় এসে আহুত হচ্ছে। সমস্ত বিষয়—যেমন রূপ, সে আহুতি হচ্ছে কোথায় এসে? আমার নয়নে। এতরকম শব্দ, তারা এসে আহুতি হচ্ছে কোথায়? আমার কানে। নানারকম রসসম্ভার কোথায় আহুতি হচ্ছে? আমার রসনায়। এ শুধুমাত্র রূপক করে বলা নয়। জিনিসটার তাৎপর্য বুঝতে হবে।

আহুতিটি কিসের মধ্যে? অগ্নিতে। অগ্নি হলেন কে? যিনি ভোক্তা। এবং যেটি আহুতি দিই সেটি হল ভোগ্য। সুতরাং নিখিল বিশ্বটা আর কিছুই নয়, শুধু ভোক্তা আর ভোগ্য নিয়ে রচিত। একদিকে ভোক্তা, আর একদিকে ভোগ্য। সেইজন্য বৈদিক ঋষিরা বলে গিয়েছেন তাঁদের সাংকেতিক ভাষায়ঃ 'অগ্নিষোমীয়ং ইদং জগৎ'; এই জগৎটি হল শুধু অগ্নি—সোমাত্মক। জগতের মূল রহস্যের অনুসন্ধান করে ঋষি জানিয়েছেন তাঁদের এই আবিষ্কারের কথাই। তাঁরা দেখিয়েছেন যে জগৎটা শুধু অগ্নি আর সোম। অগ্নি হলেন কী? যিনি সবকিছুকে ভোগ করছেন, ভোক্তা। আর সোম হল সেই অমৃত, ভোগ্য। অগ্নি ও সোমের

যে পারস্পরিক অনুপাত সেটা অনেক ক্ষেত্রে বদলে যাচ্ছে।

যাঁরা উপনিষদ আলোচনা করেছেন তাঁদের এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সেখানে একটি পঞ্চাগ্নি বিদ্যার প্রসঙ্গ আছে। সেখানে বিভিন্ন স্তরে অগ্নি ও সোম বদলে বদলে শেষে এই পার্থিব স্তরে নেমে এসেছে কেমন করে, তা দেখানো হয়েছে। এইভাবে ঋষিরা অগ্নিবিদ্যার নানা বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন। ভগবান সেই যজ্ঞের নানারকম বৈচিত্র্যের কথাও আমাদের শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু শুনিয়ে বোঝালেন যে তোমাকে যেভাবে কর্ম করতে বললাম, সেইভাবে কর্ম করলে তা যজ্ঞে রূপান্তরিত হবে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।। ১৯।।

ঐ যে স্বার্থপরতার কেন্দ্রে, দেহেন্দ্রিয়ের খুঁটিতে নিজেকে বেঁধে রেখে সক্ত বা আসক্ত হয়ে কর্মটি করছ তুমি, এইজন্যই তো বাঁধা পড়ছ। অসক্ত হয়ে অর্থাৎ আসক্ত না হয়ে, ঐ 'আ' উপসর্গটি বাদ দিয়ে শুধু 'অ' যোগ ক'রে তাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে যদি অসক্ত হয়ে কর্ম করতে পারো, তাহলেই মুক্তসঙ্গ হবে। মুক্তসঙ্গ হয়ে যদি তুমি কর্ম করো তাহলে কেউ তোমাকে বাঁধতে পারবে না। সুতরাং তুমি নিস্পৃহ হয়ে, নিষ্কাম হয়ে কর্ম করো। এই মন্ত্রটি তিনি অর্জুনকে দিলেন তৃতীয় অধ্যায়ে।

অর্জুনের তা তো জিজ্ঞাসা ছিল না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কর্ম ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধটা কী। সেইজন্যই বলেছিলেন, তুমি আমায় লোভ দেখাচ্ছো জ্ঞানের, আর করতে বলছ কর্ম। ভগবান সে সম্বন্ধটি পরিষ্কার করে আনছেন, বার বার ঘুরে ফিরে প্রেরণা দিচ্ছেন, তৃতীয় অধ্যায়ে। বলছেন ঃ

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।

বার বার বলছেন শুধু, যুদ্ধ করে চলো, কিন্তু 'ময়ি সংন্যস্য'। ঐ বিষ্ণু, ঐ পরমাদর্শ, সেই আদর্শকে তোমার কর্মটি উৎসর্গ করে তবে তুমি কর্ম করো। এইটি যদি তুমি করতে পারো তাহলে তুমি বিগতজ্বর হতে পারবে, মুক্ত হতে পারবে। তুমি যে হাঁপিয়ে উঠছ কর্ম করতে করতে এবং সেই দুশ্চিন্তার জ্বরে, উত্তাপে তুমি সন্তপ্ত হয়ে উঠেছ। সে তাপ তোমার সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে এবং চিত্ত অন্তঃশীতলতায় ভরে যাবে, যদি তুমি আমাকে সবকিছু সন্ন্যাস করে, ত্যাগ করে কর্ম করতে পারো। এই উত্তাপ সৃষ্টি করছে কে? রাগ-দ্বেষ।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।। ৩৪।।

অর্জুন জ্ঞানের জন্য প্রলুব্ধ, কর্মের প্রতি বিমুখ। কিন্তু ভগবান তাঁকে বলছেন, এমন যে আকর্ষণীয় জ্ঞান, সেই জ্ঞানের দিকে তুমি হাত বাড়াচ্ছ। কিন্তু হাত বাড়ালেই কি তাকে পাবে? অর্জুনের মুখ দিয়ে প্রশ্ন তুলে দেখালেন চোখের সামনে তুষারমৌলি জ্ঞানের চিরশুভ্র উজ্জ্বল শিখর থাকলেও তুমি তা দেখতে পাবে না যদি তোমার নয়নে আবরণ থাকে। তবে এখানে সেই 'রজত-গিরিনিভং' ও শুভ্রসমুজ্জ্বল জ্ঞানটা বাইরের কোনো জিনিস নয়, সেটা তোমার অন্তরের সম্পদ। প্রত্যেক হৃদয়ে সেই পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে চির সমুজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে। সেই সমুজ্জ্বল ভাস্বরতা থাকা সত্ত্বেও আমরা অন্ধকারে কেঁদে মরছি কেন? তার কারণ হচ্ছে—

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।। ৩৯।।

সেই পরিপূর্ণ জ্ঞান আজ ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এই জ্ঞান আবৃত হয়েছে কিসের দ্বারা? জ্ঞানের যে নিত্য বৈরী, তার দ্বারা। জ্ঞানের চিরশত্রু, নিত্য বৈরী কে? কাম। কাম মানে কী? কামনা, ইচ্ছা, দেহ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণ-লালসা, এরই নাম হচ্ছে অজ্ঞান। এই অজ্ঞান এসে কী করছে? সেই জ্ঞানকে আবরণ করছে। নাহলে সে জ্ঞান এখনই এই মুহূর্তেই প্রত্যেকের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হত। প্রত্যেক জীবের স্বাধিকার সেটা। প্রত্যেক জীবের স্বাধিকার বলেই এটা কারুর কাছে মাথা খুঁড়ে পাবার জিনিস নয়, নিজের অন্তরেই উপলব্ধি করবার জিনিস। বাইরের কারুর কাছ থেকে ভিক্ষা করে আনবার জিনিসও নয়। সেইজন্যই উপনিষদাদিতে সেই সূর্যের কাছে প্রার্থনা করছেন ঋষি। কী বলছেন?

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।। ঈশ ১৫।।

সেখানে আচার্য শংকর তাঁর ভাষ্যে অনুপমভাবে বলেছেন যে হে পূষন্ তুমি খুলে দাও তোমার ঢাকনি, তোমার আবরণ। তুমি সত্যের মুখ যে ঢেকে রেখেছ। এই যে আবরণ খুলে দিতে বলছেন, সেই আবরণ খুলে দেবার জন্য বিনীতভাবে ভৃত্যের মত ভিক্ষা বা প্রার্থনা করছেন না। * তাকে যেন আদেশ করছেন, হুকুম করছেন, কারণ এ তাঁর স্বাধিকার, নিজের স্বরূপ নিজে দেখবেন, 'সত্যধর্মায়

* কিঞ্চ অহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে। শঙ্করভাষ্য ঃ ঈশোপনিষদ ১৬।

দৃষ্টয়ে'। এ তোমার নিজের রূপ কে বলল? 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি' (ঈশ ১৬), এই উপলব্ধিতে সে জাগ্রত হয় বলেই এটা পরস্মৈপদে কিছু লাভ নয়। বাইরের একটা সম্পদ আমি লাভ করলাম আজ, তা যদি হত, তাহলে সেটা আবার কাল আমার হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকত।

এই হল বেদান্তের মূল কথা। বাইরে থেকে আমি যা জড়ো করি আমার কাছে, আহরণ করি, আমদানি করি, তা আবার খসে যায়, হারিয়ে যায়। কিন্তু যেটা আমার অন্তঃসত্তার সঙ্গে মিশে আছে, যেটা আমার আত্মস্বরূপ, তাকে কোনোদিন হারাতে হয় না, খোয়াতে হয় না। সেইজন্য উপনিষদ বলেছেন ঃ 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা'। যাকে তুমি সবথেকে প্রিয় মনে করছ, পুত্র, বিত্ত, সম্পদ, যা-কিছু বলো, সেসব থেকে প্রিয়তম হলেন আত্মা। কেন তিনি তোমার অন্তরতম? কারণ, সে অন্তরতম যে তোমার হৃদয়ে রয়েছেন। অথচ তাঁকে যে পাচ্ছি না এ দুর্ভাগ্য হয়েছে কেন? কারণ, তাকে আবৃত করেছে এই কাম। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর অনুপম ভঙ্গীতে:

সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার
প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

এই কামনার আবরণ রয়েছে বলেই তাকে লাভ করতে পারছি না। সেই আগুন, সেই পরশমণি আমাদের মধ্যে রয়েছে জানি, কিন্তু তাকে আমি পাচ্ছি না। সেই জ্ঞানের উজ্জ্বল ভাস্বরতা। সেই ভাস্বরতা আমারই মধ্যে রয়েছে, অথচ আমি তা থেকে বঞ্চিত। অর্জুন তার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন, আমরাও সকলেই তার জন্য প্রলুব্ধ। ভাবি কতক্ষণে সেই জ্ঞান লাভ করব, যখন শুনি সেই জ্ঞানের কথা। কিন্তু সেই জ্ঞান, সেই আগুন ছাই চাপা পড়ে রয়েছে, 'ভূরিভূতিচ্ছন্নাগ্নিবৎ'। ছাইকে সেখান থেকে সরাতে হবে। সেই সরাবার জন্য যে প্রয়াস তারই নাম কর্ম।

এইজন্য কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সেই ভস্ম বা ছাইকে যদি অপসারিত করি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাব চিরকালই আমার মধ্যে সেই পরশমণি ছিল, সেই উজ্জ্বল ভাস্বরতা ছিল, সেটা আমারই নিজস্ব সম্পদ। সেই সম্পদও আমি চেষ্টার দ্বারা আহরণ করলাম না, যেমন বাইরের ধন সম্পদকে আহরণ করি। যেটা আমারই ভিতরে ছিল, তার উপর যে আবরণ পড়ে

গিয়েছিল, সেই আবরণকে মাত্র আমি অপসারণ করলাম। এই আবরণ অপসারণের জন্য যে প্রাণপণ প্রয়াস, সেই প্রাণপণ প্রয়াসের নামই হচ্ছে যজ্ঞরূপ মহাকর্ম।

এইজন্যই ভগবান বার বার এত উৎসাহ দিচ্ছেন অর্জুনকে যজ্ঞ-আচরণের জন্য। 'কুরু কর্মৈব', 'কর্মই করো' 'কর্মই করো' এই বলে অর্জুনকে যে এত উৎসাহিত করলেন তার রহস্যটা আমাদের বুঝতে হবে। সেই প্রসঙ্গে তিনি দেখালেন, কামনা কেমন করে ধীরে ধীরে সবকিছুকে একেবারে পরিপূর্ণভাবে ঢেকে ফেলেছে। সেইজন্য অধ্যায়ের শেষে অর্জুনকে সচেতন করতে করতে আবার আদেশ দিলেন যে কামনাকে পরিহার করে তোমায় কর্ম করে যেতে হবে। ছাইকে যেমন সরাতে পারলে আগুন পাবে, মেঘকে যেমন অপসারিত করলে তবে সূর্যকে দেখতে পাবে, তেমনি সেই মেঘকে সরাবার জন্য, ছাইকে অপসারণ করবার জন্য কী করতে হবে তোমাকে? 'পাপ্মানং প্রজহি', 'জহি শত্রুং মহাবাহো'।

এখানে লক্ষ্য করে দেখবার জিনিস হল এই যে সর্বত্র সাধনায় নানা রকম অপরূপ সংকেত শ্রীভগবান দিয়ে যাচ্ছেন।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।। ৪১।।
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।। ৪৩।।

এখানে ৪১ ও ৪৩ এই দুটি শ্লোকে একই কথা বললেন। এক জায়গায় 'প্রজহি' ও অন্য জায়গায় 'জহি'। এক জায়গায় 'পাপ্মানং' অর্থাৎ কামকে সেখানে পাপ বলে উল্লেখ করেছেন। আর এক জায়গায় পরিষ্কার বলেছেন ঃ

'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।'

এই কামরূপ মহাশত্রু কে, যে আমার মহাসম্পদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে রেখেছে? যদি জানতে পারি আমারই অন্তরে আমি অনন্ত সম্পদের অধিকারী, কিন্তু সেই সম্পদ না পাওয়ার দরুণ আমার আজ এত দারিদ্র্য, এত কষ্ট, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যে আমায় সেই সম্পদ পেতে দিচ্ছে না, তাকে নির্মূল করবার জন্য আমি যেমন উঠে পড়ে লাগি, সচেষ্ট হয়ে উঠি, সে-উদ্যোগে যেমন আর শৈথিল্য থাকে না, ঠিক তেমনিভাবে ভগবান উদ্বুদ্ধ করছেন ঃ 'জহি শত্রুং মহাবাহো'!

কিন্তু এই জয় করবার দুটি স্তরে দুটি সাধন-সংকেত দিয়ে দিলেন। কামনাকে কেমন করে সরাব? সে যে কায়েম হয়ে বসেছে আমার সত্তায়, আমার দেহে-মনে-প্রাণে। সেখান থেকে তাকে উৎসাদন করব কী করে? উৎসাদন করবার প্রথম উপায় হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য', এই নিয়মটি হল যজ্ঞের মূল কথা। সুনিয়ন্ত্রিত করো ইন্দ্রিয়বর্গকে। এই সুনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়বর্গকে আস্তে আস্তে জয় করো। আর দ্বিতীয় পথ 'এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা'। কাম সম্পূর্ণ নির্মূল হবে কখন? নিয়ন্ত্রণের ফলে আমার উপর তার যে দাপট তা খানিকটা কমবে, তার যে শক্তির প্রাবল্য তা খানিকটা শিথিল হবে, কিন্তু সে নির্মূল হবে না। নির্মূল হবে তখনই যখন 'বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা', বুদ্ধির পারে যিনি আছেন তাঁকে যখন জানব। অর্থাৎ এখন আমার কামনার বিষয় হচ্ছে যেসব জিনিস, তার চেয়েও বড়ো কোনো জিনিস যখন আমাকে আকৃষ্ট করবে। যখন বাইরের সব জিনিস আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে, তখন কামনা আপনি সরে যাবে। যেমন কমলাকান্ত তাঁর গানে বলেছিলেন ঃ

মজলো আমার মন-ভ্রমরা কালীপদ নীল কমলে
(এখন) বিষয়-মধু তুচ্ছ হল কামনা-কুসুম সকলে।

মায়ের পদকমলে যখন আমার মন-মধুপ সেই অমৃতের আস্বাদ পেল, তখন বিষয়-মধু তার কাছে বিষের মতো হয়ে গেল। আর সেদিকে কেউ ফেরে না, আমার মন বা ইন্দ্রিয়। কারণ, তার থেকে বড়ো জিনিসের রসের আস্বাদ বা বোধ তার জগেছে। ঠিক এই কথাই ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞ প্রকরণে দ্বিতীয় অধ্যায়েও সংকেত করেছেন ঃ

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।। ২/৫৯।।

বিষয় আমার কাছ থেকে ফিরে ফিরে যাবে যদি আমি 'নিরাহার' তার হ'তে পারি। আহার না করি। কিন্তু রসটি থেকে যাবে। মন বলে, আহা ভোগটা করলাম না, করলেও হত। কিন্তু সে রস কখন যাবে? এই রস হল তৃষ্ণার, কামনার মূল রূপ, সূক্ষ্ম রূপ। সেই রূপটি তখনই উৎসন্ন হবে যখন 'পরং' মানে 'শ্রেষ্ঠম্'। বিষয়-রসের চেয়ে বড়ো কোনো জিনিস যখন আমি সাক্ষাৎ দেখতে পাব, তখনই আমার এই বিষয়-মধু তুচ্ছ হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'খেলনা' কবিতায় এই জিনিসটিকে বড়ো সুন্দর করে বলেছেন। আমি শিশুকে বলি ঃ "শুধু খেলেনা নিয়েই তুই ভুলে রইলি! কত

বড়ো বড়ো জিনিস রয়েছে, ভালো ভালো পড়বার জিনিস রয়েছে, সে-সবের দিকে তোর মন নেই, কেবল খেলনা নিয়েই মেতে আছিস। এগুলো তো তুচ্ছ জিনিস। জীবনটা শুধু এই নিয়েই কাটাবি?" আমি আস্বাদ পেয়েছি বড়ো জিনিসের। আমি আশা করি সে-ও সেই বড়ো জিনিসেরই আস্বাদন করুক। ও তুচ্ছ জিনিস নিয়ে কেন পড়ে আছে? কিন্তু সে যতক্ষণ সেই বড়োকে না দেখছে, যতক্ষণ সে সাহিত্যের রস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের রস না পাচ্ছে, ততক্ষণ সে কিছুতেই নিজের তুচ্ছ খেলনাগুলো ছাড়তে পারবে না।

ভাবে শিশু বড়ো হলে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলেনা।

সে ভাবে, হায়! আমার শক্তি নেই সব কিনবার, নইলে এখনই সমস্ত দোকানশুদ্ধ কিনে আনতাম। এটাই আমার তখনকার শিশুমনের ইচ্ছা।

বড়ো হলে খেলা যত ঢেলা বলি মানে
দুই হাত তুলে চায় ধন-জন পানে।

তখন আর এক উগ্র লালসা নিয়ে ছুটি। কী করে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, আরও দু'দশটা বাড়ি, গাড়ি, এয়ারকণ্ডিশনার, রেফ্রীজারেটার, টেলিভিশন হবে। কবির তাই আকুল জিজ্ঞাসা ঃ

আরো বড়ো হবে না কি যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে।

সবকিছু কিন্তু হেলায় অতিক্রম করে হেসে চলে যাওয়া চাই। কিছু ভোগ করতে পেলাম না-কিংবা শরীর ক্রমশ জরাজীর্ণ হল, অতএব জগৎ থেকে বিদায় নিতে হল ম্লান মুখে, তা নয়। এমন একটা আরও বড়ো জিনিসের আস্বাদ পেলাম যেখানে এত বিপুল ঐশ্বর্য, ধনজনের মায়া সব তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই সব কাহিনী উৎকীর্ণ হয়ে আছে ভারতের অধ্যাত্মসাধনার সমস্ত শাস্ত্রে।

নচিকেতার সেই উপাখ্যান স্মরণ করলে দেখি সেখানে যমরাজ দিব্য থেকে দিব্যতম ঐশ্বর্য তাঁর সামনে এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু বার বার নচিকেতা তাঁকে বলেছেন ঃ 'নান্যৎ তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে', নচিকেতা তা ছাড়া আর কিছুই চায় না। ভারতবর্ষের একটি বালক যেমন এই কথা কটি বলেছিল, তেমনি এক পতিব্রতা নারীও সেই একই কথা বলেছেন। তাঁর স্বামী অরণ্যে চলে যাবার সময় বলছেন, আমার যা কিছু সম্পদ তা দুই স্ত্রীকে ভাগ করে দিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এক স্ত্রী মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন, "এ সম্পদ পেয়ে আমার কী হবে?" "তুমি সুখে

থাকবে, কোনোদিন আর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকবে না। উপকরণ থাকলে, বাড়িঘর, বিষয়-আশয় থাকলে মানুষের যে সুখ থাকে, সেই সুখ থাকবে।" এতে স্ত্রীর নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত ছিল। কারণ, একেই তো মানুষ মনে করে নিশ্চিন্ততা, নিরাপত্তা। জীবনে এইসব ঠিক থাকলেই আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল কোন্ সুদূর অতীতে ভারতবর্ষের সেই সনাতন বাণী ঃ

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।"

"তুমি আমাকে যা দিয়ে যাচ্ছ তার দ্বারা কি অমৃত হব? তা যদি না হই তবে তা দিয়ে আমি কী করব?"

সেই যে অমৃতের লালসা বা পিপাসা, তা যখন জাগে তখন কী হয়? এই কামরূপ দুরাসদ বিজিত হয়, পরাভূত হয়। তা বুঝেছিলেন বলেই মমতাময়ী, সংসারের কামনা-বাসনায় জড়ানো এক নারী মৈত্রেয়ী, এবং অপরিণত বয়স্ক এক সামান্য কিশোর বালক নচিকেতা, 'পরং বুদ্ধা' সবকিছুকে তুচ্ছ করে যেতে পেরেছিলেন, তাদের চেয়ে 'পরং' শ্রেষ্ঠ বা বড়োকে 'বুদ্ধা' বা জেনে, নইলে তা সম্ভব হত না।

সুতরাং আমরাও যদি সেই অমৃতময় পথের অন্বেষণ করতে চাই, আমরাও যদি সেখানে পৌঁছতে চাই, তাহলে আমাদের সাধনার আরম্ভ হবে 'ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য।' ইন্দ্রিয়বর্গকে সুনিয়ন্ত্রিত করলাম, এবং ইন্দ্রিয়বর্গের সুনিয়ন্ত্রণের ফলে একটি বিশিষ্ট আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে যখন কর্ম করতে শিখলাম, তখনই আমি সাধনার পথে প্রবর্তিত হলাম বলা চলে। এই হল যজ্ঞরূপ মহাকর্ম।

এই যজ্ঞরূপ মহাকর্ম থেকে এগিয়ে যাব যোগের দিকে। তাহলে জীবনে কী এল? জীবনে কোনো গণ্ডি ছিল না, এখন গণ্ডির বাঁধন এল। জীবন যেন চক্রাকার ধারণ করল, circle হল। Circle বা বৃত্ত থাকলেই যেমন মাঝখানে একটি কেন্দ্র-বিন্দু এসে উপস্থিত হয় আপনা আপনি, একটি কেন্দ্রস্থল রচিত হয়, তেমনি আমার সমস্ত কর্ম তখন এই কেন্দ্র লক্ষ্য করে চলতে লাগল। এই কেন্দ্রের সঙ্গে যেমন নিবিড়তম সান্নিধ্য হতে থাকল, তেমন আমি যুক্ত, যুক্ততর, যুক্ততম হতে থাকলাম। এই সান্নিধ্যের নামই হচ্ছে যোগ। এখন পরের অধ্যায় থেকে ক্রমশ ক্রমশ আমরা যোগের দিকে এগিয়ে যাব।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান আবার সেই জ্ঞানের মহিমা খ্যাপন করলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে যে কর্মযোগ শেখালেন তাতে শেষে বললেন যে সেই কর্মের দ্বারা যদি ক্রমশ ক্রমশ কামকে নির্মূল করতে পারো, তাহলে এই জ্ঞান তুমি লাভ করতে পারবে। প্রসঙ্গত তিনি শুনিয়ে দিলেন যে তিনি স্বয়ং এই জ্ঞানের মূল বা আদি প্রবক্তা। স্বয়ং তিনি কে? যিনি আসেন যুগে যুগে বার বার। যখন ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি আবির্ভূত হন, যে জ্ঞান বা যোগ মানুষ ভুলে যায় এবং যে-মহাপথ তিনি আবিষ্কার করে রেখে গিয়েছেন, সেই সনাতন পথ থেকে বিভ্রষ্ট হয়, তখন আবার তিনি আসেন তাকে সেই যোগপথে স্থাপিত করবার জন্য। পথভ্রষ্টকে আবার ঠিক পথে চালাবার জন্য তিনি স্বয়ং এসে আবির্ভূত হন। এইজন্য যুগে যুগে একই সত্যের, একই যোগের তিনি পুনরায় উদ্‌ঘোষণ করেন। এই যোগ তাই অব্যয় অক্ষয় এবং পরম্পরাক্রমে চলে আসছে চিরদিন। সেই ঘোষণা তিনি আবার এখানে অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে জগৎকে শুনিয়েছেন। প্রসঙ্গত অবতারবাদের রহস্যের ইঙ্গিত করে তাঁর মূল কথা তিনি আবারও বলছেন ঃ

এবং জ্ঞাত্বা কৃত্বং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্।। ১৫ ।।

তুমি কর্মই করে চলো। কর্ম করার ফলে তোমার কী হবে? ধীরে ধীরে সেটা দেখাচ্ছেন অপূর্বভাবে। তোমার সব ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যাবে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।। ২৪।।

এই ব্রহ্মস্বরূপ কে? 'ব্রহ্ম' এই শব্দমাত্র শুনেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। ব্রহ্ম হচ্ছে 'বৃহ' ধাতু থেকে, আমার সবথেকে বৃহৎ সত্তা এই ব্রহ্ম। এই যে দেহে আবদ্ধ হয়ে, এইটুকু সত্তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আমার চেতনা ঘোরাফেরা করছে, এটা আমার আসল সত্তা নয়। এই যে পরিব্যাপ্ত চেতনা, সেই বৃহতের

চেতনায় আমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাই সেই ব্রহ্মস্বরূপের কথা শোনালেন। সেটা তুমি লাভ করবে এই কর্মের দ্বারাই, এই ব্রহ্মরূপ অগ্নি যদি জ্বালাও। আগের অধ্যায়ে যে নানাভাবে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, ভগবান সেখানেও ব্রহ্মাগ্নির কথা বলেছেন। এখানে সংযমাগ্নির কথা বললেন, ইন্দ্রিয়াগ্নির কথা বললেন, আত্মসংযম-যোগাগ্নির কথাও বললেন। পর পর কয়েকটি শ্লোকে নানারকম অগ্নির কথা বলেছেন। এক একটি অগ্নি জ্বালিয়ে এক একজন যেন তপস্যা করছেন, যেন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন। সেই যজ্ঞ থেকে কী লাভ হয়? যজ্ঞ শেষ হয় অমৃতে।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।। ৩১।।

তুমি যে এই ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করতে চাইছ, যজ্ঞশেষে এই অমৃত যদি তুমি ভোজন করতে পারো, এই অমৃত সোমরস যদি পান করতে পারো, তাহলেই সেই অমৃত, ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করবে। বৈদিক ঋষি তাই গেয়েছেনঃ

"অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।"

আমি সেই জ্যোতিকে লাভ করেছি, সেই দেবতার স্বরূপে গিয়ে পৌঁছেছি, যেহেতু আমি সেই সোমপান করেছি, তাই আজ অমৃত হয়েছি। একথা ঘোষণা করে গিয়েছেন ঋষিরা।

এখানে জ্ঞানের সাধন-প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন, তুমি সেই জ্ঞান লাভ করবার জন্য আচার্যের কাছে যাও, গুরুর কাছে যাও, প্রণিপাত করো, শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেকে লুটিয়ে দাও, সঙ্গে সঙ্গে সবদিক থেকে প্রশ্ন করো, আর সেবা করো। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই ত্রিবেণীসঙ্গমই জ্ঞানলাভের উপায়।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। ৩৪ ।।

নিজেকে কর্মের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা সুসংস্কৃত করে, নিজেকে পবিত্র করে তুমি তাঁর কাছ থেকে সেই জ্ঞানলাভ করো। উপনিষদ পাঠ করলে দেখা যায়, বার বার সেই একই উপাখ্যান। আচার্যের গৃহে গিয়েছেন শিষ্য জ্ঞানলাভের জন্য, আচার্য বার বার তাকে বলছেন তুমি তপস্যা করো। আরও ষোল বছর, আরও বত্রিশ বছর তপস্যা করো। এই রকম তপস্যার পর তপস্যাই শুধু করে যাচ্ছেন, 'ভূয় এব তপসা,' আর আপনা আপনি তার মধ্যে সেই জ্ঞান প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

একবার আচার্য শিষ্যকে বাড়িতে রেখে বাইরে গিয়েছেন, বলে গিয়েছেন, বাড়িতে এই অগ্নি আছে, তুমি সকাল-সন্ধ্যে সেই অগ্নির পরিচর্যা করবে, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে যজ্ঞ করে যাবে। শিষ্য নিষ্ঠার সঙ্গে সেই আদেশই পালন

করেছে। যখন ফিরে এলেন আচার্য, তখন শিষ্যের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বলছেন ঃ "ব্রহ্মবিদ্ ইব ভাসতে তে মুখম্," কী ব্যাপার? তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মতো উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে উঠেছে। জ্বলজ্বল করছে যেন তোমার মুখখানি! শিষ্য বললেন ঃ 'হ্যাঁ, অগ্নিই আমাকে পরম জ্ঞান দান করেছেন।" সুতরাং এই অগ্নির সেবায়, এই যজ্ঞের দ্বারা নিজে পবিত্র হলে, আমার মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে মালিন্যের দ্বারা ঢাকা, সেটি আপনিই প্রস্ফুটিত হবে। তাই ভগবান উপসংহারে চতুর্থ অধ্যায়ে আবার শুনিয়ে দিলেন ঃ

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।। ৪২ ।।

ওঠো, তুমি যোগ অনুষ্ঠান করো, সংশয়কে ছেদন করো অসির দ্বারা। কোন্ অসি? জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা। এই জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা সংশয়কে ছিন্ন করে তুমি যোগে প্রতিষ্ঠিত হও, যোগে ব্রতী হও; মানে, সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রভূত করো, সত্তাকে গুটিয়ে আনো। নিজেকে ছড়িয়ে ফেলেছ বিশ্বের মধ্যে, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ dissipation, diffusion-এর ফলে, এখন সেই হারানো সত্তাকে আবার ফিরে পাবার জন্য নিজেকে গুটিয়ে আনো, গুটিয়ে এনে ঐ যে একটি কেন্দ্র রচনা করেছ, সেই কেন্দ্র অভিমুখে সব ক্রিয়া, সমস্ত চেষ্টাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়াসী হও, একমুখী করো তোমার বহুমুখী সব প্রবৃত্তিকে integration বা fusion-এর দ্বারা, সমন্বয় ও সম্মিলন সাধন দ্বারা।

হিন্দু-সাধনার মধ্যে কোনো জায়গায় জটিলতা নেই, সব তো সহজ সরল জিনিস। তার মধ্যে শুধু অনেক জটিলতা আমরাই সৃষ্টি করি এবং সৃষ্টি করে মূল লক্ষ্য থেকে নিজেদের বিভ্রষ্ট করে রাখি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে, সমাজ-জীবনের মধ্যে এই সাধনকে ঋষিরা তখনকার দিনে চালু করে দিয়ে গিয়েছিলেন। যা-কিছু কর্ম করছ, সেই কর্ম করবার আগে বিষ্ণুস্মরণের ব্যবস্থা ছিল, আহার করবার আগে আচমন করবার ব্যবস্থা ছিল, কিছু নিবেদন করবার ব্যবস্থা ছিল, কিংবা প্রত্যেক বাড়ীতে গৃহদেবতা থাকতেন, পঞ্চব্যঞ্জনাদি যা-কিছু রান্না হত আগে নিবেদন করা হত এবং সেই নিবেদিত অন্ন প্রসাদরূপে সকলেই গ্রহণ করতেন। প্রসাদরূপে গ্রহণ করলে সেটি 'অমৃতত্বায় কল্পতে,' প্রসাদটি অমৃত হয়ে যেত, তখন সেটি গ্রহণ করলে অমৃতভোজন হয়ে যেত।

আমাদের শাস্ত্র বা ঋষিবৃন্দ নিষেধ জারি করেননি যে তোমরা আহার-বিহার সবকিছু থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে রাখো। আহার পরিত্যাগ করো, নিদ্রা পরিত্যাগ করো, উৎকট তপস্যা করো, এমন কথা তাঁরা কোনোদিন

বলেননি। দৈনন্দিন জীবনের যা-কিছু কর্ম, সেই সমস্ত কর্মই করো এক লক্ষ্য রেখে, সেই একের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে দিয়ে, ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য'। এই সন্ন্যাস, পরিত্যাগ, উৎসর্গ, এই ব্রতটি গ্রহণ করে যদি সমস্ত কর্ম করে যাই, তাহলেই আমার ভোগের মালিন্য শোধন হতে হতে আস্তে আস্তে ভিতরের সেই হোমের অগ্নি, জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসযোগ

পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন কর্ম-সংন্যাসের বা জ্ঞানের কথায় উৎসাহিত হয়ে ভগবানকে বলছেন যে তুমি এই তো বেশ জ্ঞানের কথা শোনালে, কর্মসংন্যাসের কথা বললে, কিন্তু আবার কর্মযোগের কথাও তো বলছ। একটা যা হয় সুনিশ্চিত করে বলো, যেটা আমার পক্ষে ভালো হয়। অর্জুন কেবলই জ্ঞানের দিকে ঝুঁকছেন, কতক্ষণে সেটা পাব। কিন্তু নিজের মধ্যে যে আবরণ সেই আবরণের, সেই মালিন্যের কথা তিনি ভুলে যান। তাই বলছেন ঃ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ।। ১ ।।

কিন্তু মূল জিজ্ঞাসা শ্রেয়ের জিজ্ঞাসা, সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই। উত্তরে ভগবান দেখালেন, তুমি কেবলই ভুল করছ কেন? সন্ন্যাস আর যোগ দুটো আলাদা জিনিস নয়, দুটো একই জিনিস। যা সাংখ্য, তাই যোগ।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।। ৫ ।।

ঐ যে সন্ন্যাস, ঐ যে জ্ঞান, সেটা 'দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ,' যোগ ছাড়া কিছুতেই সেই সন্ন্যাস অবস্থা লাভ হতে পারে না। সন্ন্যাস মানে সবকিছুই তাঁতে সমর্পণ। পরিপূর্ণ অর্পণের ফলেই সে-বিশুদ্ধ জ্ঞান ফুটে উঠবে। কিন্তু যোগের দ্বারা নিজের চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অধীন না করতে পারলে, আয়ত্ত করতে না পারলে, সুনিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে সন্ন্যাস বা সমর্পণ হবে না। তাই এই সুনিয়ন্ত্রণের কথা, যজ্ঞের থেকে শুরু করেছেন।

যজ্ঞরূপ সুনিয়ন্ত্রণের পর এখন আসছে তার পরের ধাপ, সেটা হচ্ছে যোগরূপ সুসংযম। জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করলাম, যেমন আমার খাওয়া, শোওয়া বা নাওয়ার সময়ের কোনো ঠিক ছিল না সাধারণ জীবনে। এই সাধারণ জীবন যদি আমরা অনিয়মিত, উচ্ছৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খলভাবে কাটাই, সকালে কখন উঠব, কখন পড়ব, কখন লিখব, কখন বেড়াব, কোনো সময়ের যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে,

তাহলে সমস্ত কিছুই এলোমেলো হয়ে শুধু শক্তির অপচয় ঘটে। কিন্তু সেখানে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ আনি তাহলে সেই নিয়ন্ত্রণের ফলে আমরা পৌঁছাই পরের ধাপে। আমরা সুসংযত হতে শিখি।

প্রথমে সুনিয়ন্ত্রিত, সুনিয়মিত করে নিতে পারলেই তার পরের ধাপে পৌঁছে যাই, সুসংযত হয়ে যাই। এই সংযমই হল যোগের মূল কথা। সংযম কথাটিকে আমরা সাধারণত মনে করি শুধু ইন্দ্রিয়ভোগ, যেমন আহারাদি, থেকে বিরত থাকা। আসলে কিন্তু সংযম তা নয়। সংযম কথাটি যোগশাস্ত্রে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, ধারণা-ধ্যান-সমাধিকেই সংযম বলা হয়েছে * তাহলে সংযম মানেই হচ্ছে intense concentration গভীরতম একাগ্রতা। এই একাগ্রতা আনবার জন্যই আমরা প্রথমত আহার-বিহারাদির মধ্যেও এই নিয়ন্ত্রণ বা সংযম আনবার প্রয়াস করে থাকি। এই বাহ্যভোগের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে যখন চরম নিয়ন্ত্রণে, মনের বা বুদ্ধির সংযমে পৌঁছই, তখন ঠিক যোগের অধিকারী হই। এইজন্য যোগের মূল কথাই হল সংযম। শ্রীভগবান তাই অর্জুনকে বললেন, সেইভাবে তুমি যদি কর্ম করতে পারো, তাহলে তুমি হবে 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা'। নিখিল বিশ্বের সঙ্গে যদি তুমি এইভাবে একীভূত হও, তাহলে 'কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে,' সকলের জন্য কর্ম করেও তুমি লিপ্ত হবে না।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ।। ৭ ।।

তারপর ভগবান দেখিয়ে দিলেন যোগীরা কীভাবে কর্ম করেন।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ।। ১১ ।।

নিজেকে শুদ্ধ করবার জন্য সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে তাঁরা কর্ম করেন। যুক্ত যাঁরা, যোগী যাঁরা, তাঁরাও কর্ম করেন, আর অযুক্ত যাঁরা, অযোগী যাঁরা, তাঁরাও সেই কর্ম করেন। তফাৎটা কোথায়?

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ।। ১২ ।।

যুক্ত, অর্থাৎ যিনি যোগী, তিনি কর্মফলটি ত্যাগ করে পরম শান্তি লাভ করেন। আর অযুক্ত, যিনি যুক্ত নন, তিনি কী হন? ঐ ফলেতে আসক্ত হয়ে 'নিবধ্যতে,' বাঁধা পড়েন, মারা পড়েন, অশান্তিতে, জ্বালায়, যন্ত্রণায় ছটফট করে

*ত্রয়মেকত্র সংযমঃ। পাতঞ্জল যোগসূত্র ৩/৪

মরেন। একজন পরম শান্তিতে নিরুদ্বেগে প্রতিষ্ঠিত আর একজন সেই একই কর্ম করেই ফলে আসক্ত হয়ে নিবদ্ধ। কর্মের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই, সেই একই কর্ম তিনিও করছেন ইনিও করছেন, কিন্তু তফাৎ শুধু এইখানে, ঐ কর্মাসঙ্গ, ফলাসক্তি, শুধু সেইটে তিনি পরিত্যাগ করেছেন। সেই সবকিছু কামনা-সন্ন্যাস করে, ফল পরিত্যাগ করে পরম সুখে নিরুদ্বেগে নবদ্বারপুরে তিনি বসে আছেন, দেহরূপ পুরে তিনি বিহার করেছেন, বিহার করেও তিনি অনায়াসে 'বশী,' তিনি controller, নিজের নিয়ামক, তাঁর নিজেকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি এসেছে। যোগের দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রণ-শক্তি লাভ করেছেন। নিয়ন্ত্রণ-শক্তি লাভ করার ফলেই, 'বশী' হবার ফলেই তিনি 'সুখী' অর্থাৎ সুখ লাভ করেছেন।

কঠ উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ রথ-রূপকের কথা মনে পড়ে। তাতে দেখিয়েছেন যে ইন্দ্রিয়েরা হল অশ্বের মতো, সেই অশ্বদের যদি মনরূপ বল্‌গা টানার, রাশ টানার কেউ না থাকে, তাহলে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বেরা যেখানে—সেখানে যেমন-খুশি রথকে নিয়ে গিয়ে ফেলে এবং তার ফলে যিনি রথে বসে আছেন, রথী, তাঁর যেমন দুর্গতির সীমা থাকে না, তেমনি কর্মে যার নিয়ন্ত্রণ নেই, নিয়ন্তা নেই, সে পদে পদে দুঃখ-দুর্গতি-কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু যার সেই অশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবার সারথি আছে, বিজ্ঞান-সারথি, প্রজ্ঞান-সারথি, সে-ই সুখে অনায়াসে গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়। স্থিতপ্রজ্ঞের প্রসঙ্গে কঠের এই বিজ্ঞান-সারথির কথাই গীতায় ভগবান শুনিয়েছেন। সেই কঠোপনিষদে যম বলেছেন ঃ

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।। ৩ ।। ৯

তুমি রথ হাঁকিয়েছ কোথায় যাবে বলে? সেই বিষ্ণুর পরম পদে পৌঁছবে বলে। কিন্তু সেখানে পৌঁছবে কবে? বিজ্ঞানকে যদি সারথি করে থাকতে পারো, তাহলেই অশ্ব তোমায় নিয়ে যাবে অধ্বা, অর্থাৎ পথের পারে। সেই পথের পারে বিষ্ণুর পরম পদে তখন তুমি পৌঁছবে। এখানেও সেইটে ভগবান স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তুমি সেইভাবে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করো, এবং সেইজন্য তুমি যখন জীবনের দোলায় দোল খাবে তখন মনে রাখবে এই ভাবনা, ধরে থাকবে এই attitude, এই দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ।। ২০ ।।

এই যে জিনিসটা ২০ শ্লোকে শেখালেন, মনে হয় তাহলে তো পাথর হয়ে যেতে হবে। প্রিয় জিনিস পেয়েও আমি আনন্দিত হব না, এবং অপ্রিয় জিনিস পেয়েও আমি উদ্বিগ্ন হব না, তাহলে তো নিষ্প্রাণ হতে হয়, তাহলে তো প্রস্তরীভূত

হতে হয়! সঙ্গে সঙ্গে তাই বললেন, না তুমি অপার আনন্দে ডুবে থাকবে। পরের শ্লোকে সেটি শোনালেন, কীরকম অবস্থা তখন হয় ঃ

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে ।। ২১ ।।

সে এমন এক অক্ষয় সুখের, এমন এক অনন্ত সুখের পারাবারের সন্ধান পায় যে সে আনন্দসাগরে নিলীন হয়। বাহ্যস্পর্শ চলে গিয়ে তখন সে তাঁর স্পর্শ, তাঁর ছোঁয়াচ পেয়েছে। আবার মনে পড়ে কমলাকান্তের সেই গান ঃ 'মজলো আমার মন ভ্রমরা।' গানের শেষে তিনি বলেছেন যে আজ এতদিনে আমার সকল আশা পূরণ হয়ে গেল। সুখ-দুঃখের অতীত এক নিবিড় আনন্দের আস্বাদ পেলাম আমি।

কমলাকান্তের মনে আশা-পূরণ এতদিনে,
সুখ-দুঃখ সমান হল (আজ) আনন্দ-সাগর উথলে।।

সুখ-দুঃখ সমান হওয়া মানে পাথর হয়ে যাওয়া নয়। কোনোটাই আমার বোধ হচ্ছে না, সবকিছু paralysed হয়ে গেল, অসাড় হয়ে গেল, সুখেরও বোধ নেই দুঃখেরও বোধ নেই, তা নয়। 'আজ আনন্দ সাগর উথলে।' সেই আনন্দ সাগরে, অনন্ত সাগরে আমি নিলীন হয়ে আছি যে। ঢেউ উঠছে কোথায়, কোথায়ই বা নামছে, পড়ছে? ঢেউ উঠলে তবে উল্লাস হবে, সুখ হবে, ঢেউ পড়লে আমি বিমর্ষ হব, দুঃখ পাব, এ আর নেই। আমি যে আনন্দসাগরে আজ নিলীন হয়েছি।

সেই আনন্দসাগরের সন্ধান আজ ভগবান দিলেন যোগের শেষ ভূমিতে। সেইজন্য চেনাচ্ছেন, 'সুখমক্ষয়মশ্নুতে,' অক্ষয় সুখ লাভ হবে যদি তুমি ব্রহ্মযোগে যুক্ত হও। যুক্ত হলেই কী হবে? তুমি ব্রহ্মভূত হবে। ২৩ শ্লোকে যুক্তের লক্ষণ বললেন, ২৪ শ্লোকে ব্রহ্মভূত হতে বললেন। 'ব্রহ্মভূত' হলেই কী হয়? তখন সে আমাকে পায়। আমাকে পেয়ে সে সর্বভূতহিতে রত' হয়ে যায়। সর্বভূতহিতে রত হয়ে সমস্ত কামনা থেকে যখন মুক্ত হয় তখন সে যথার্থ মুক্ত, 'যঃ সদা মুক্ত এব সঃ'। সেইভাবে মুক্ত হলে তখন সে আমাকে চেনে। কীভাবে চেনে?

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ।। ২৯ ।।

শান্তি কি আর এমনি লাভ হয়? সে তখন জানে, বোঝে, 'জ্ঞাত্বা'। তাই শান্তি পায়। এতদিন জীবনে যা-কিছু সে সংগ্রহ করে এসেছে, মনে করেছে তাতে দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হচ্ছে বুঝি। কিন্তু এখন সে উপলব্ধি করেছে সমস্ত হৃদয়ে বসে একজনই ভোক্তা সবকিছু ভোগ করছেন। সমস্ত কর্মের মধ্যে যা

কিছু তৃপ্তি একমাত্র সেই জনার্দনেরই তৃপ্তি। যিনি প্রত্যেকের অন্তর্যামীরূপে বসে আছেন, তাঁরই তৃপ্তির জন্য মানুষ চেষ্টা করে। একটা নিষ্প্রাণ দেহকে খাওয়াবার জন্য কেউ প্রয়াস করে না। সচেতন যিনি রয়েছেন, তাঁকেই তো খাওয়াবার জন্য ছুটোছুটি মারামারি করছে মানুষ। কিন্তু সেই তৃপ্তিটা কার? সে তৃপ্তি সেই চৈতন্যের। সে চৈতন্য প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠাতারূপে বসে আছেন, 'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্,' এবং তিনি 'সর্বলোকমহেশ্বরম্,' সমস্ত লোকের তিনি নিয়ন্তা, মহেশ্বর, অধিষ্ঠাতা।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাবি সেই ঈশ্বর, অধিষ্ঠাতা, কোথায় কত দূরে বসে আছেন, আমি যে আমার দুঃখের জ্বালায় জ্বলে মরছি, তিনি কি আমার দুঃখ দূর করবেন? কিন্তু এখন আমি জানছি তাঁকে কীভাবে? 'সুহৃদং সর্বভূতানাম্,' সমস্ত ভূতবর্গের তিনি সুহৃদ। যখন আমি জানি আমার এমন একজন সুহৃদ বা বন্ধু আছেন যিনি সমস্ত দুঃখ থেকে, সংকট থেকে আমাকে ত্রাণ করতে পারেন, তখন আমি যদি বিপন্নও হই তবু আমি নির্ভরসা হই না, তখন আমার বল-ভরসার অভাব হয় না। আমি জানি, যত বিপদেই পড়ি না কেন, আমার এমন একজন বন্ধু আছেন যিনি সমস্ত সংকট থেকে আমাকে ত্রাণ করতে পারেন। এইজন্যই সে 'শান্তিমৃচ্ছতি,' সমস্ত অশান্তি তার দূর হয়ে যায়, শান্তির অটল ভিত্তি রচিত হয় তার মনে।

এই হল একমাত্র শান্তির পথ, সন্ন্যাসের পথ, যার কথা বলা হয়েছে উপনিষদে, বেদে, গীতায়। কিন্তু গীতার বৈশিষ্ট্য হল এই যে পরের পর ধাপগুলি এখানে ভগবান রচনা করে দিচ্ছেন। এইজন্য প্রথম আমরা কর্ম বা যজ্ঞ দিয়ে আরম্ভ করেছি সুনিয়মিত, সুসংযত হ'য়ে এই শান্তির পথে যাত্রা, তারপর সেই কর্মকে সন্ন্যাস বা সমর্পণ ক'রে এগিয়ে যেতে হবে যোগে এবং এই যোগের অনুশীলন কেমন করে করতে হয়, তার প্রতিটি ধাপও ভগবান শিখিয়ে দেবেন ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

প্রথম বৃত্ত-রচনা। circle টানা এবং circle টানার সঙ্গে সঙ্গেই যে-কেন্দ্র বা centre ফুটে উঠল মাঝখানে, এখন সেই কেন্দ্র বা centre-এর দিকে এগিয়ে চলা। তার নামই যোগ এবং প্রথম circle টানার নাম হ'ল যজ্ঞ। যোগ যত নিবিড় হয়ে ওঠে তত একত্বের দিকে, দুই মিলে যাওয়ার দিকে এগিয়ে চলে। তারই নাম একত্ব বা অদ্বৈত জ্ঞান, যেখানে আর দুই থাকেনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

সাধনার সোপান-পরম্পরার সঙ্গে একান্তভাবে সংযুক্ত ও অখণ্ড মালিকার মতো সুগ্রথিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার যে অর্থের অনুধাবন করছি, এবং সেই অর্থের অনুধাবন করতে করতে আমরা এখন যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছি, তাকে আমরা একটি উপমার সাহায্যে বুঝবার চেষ্টা করতে পারি। সেটি হচ্ছে এই যে, কোনো মন্দিরে প্রবেশ করবার সময় আমরা যেমন ক্রমশ ক্রমশ তার বাইরের নাটমন্দির বা গোপুরম্‌ ইত্যাদি অতিক্রম করে গর্ভগৃহের দিকে, যেখানে দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন তার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাই, এখানেও এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান সাধককে এনেছেন সেই অন্তঃপুরে, গর্ভগৃহে। তার আগে ঐ যে চতুর্দিকের পরিবেষ্টনী, মন্দিরের প্রাকার তিনি রচনা করেছেন, যা তৃতীয় অধ্যায় থেকে আরম্ভ করেছিলেন, সেটির নাম আমরা শুনেছি ঃ 'যজ্ঞ'।

যজ্ঞের মধ্যে আমরা দুটি জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম। একটি হল, কোনো ব্যাপক বা মহান আদর্শের জন্য, বিরাট আদর্শের জন্য কর্ম করা, সেইটির নাম হচ্ছে 'বিষ্ণু'। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা হচ্ছেন বিষ্ণু, 'বেবেষ্টি সর্বম্‌,' সর্বব্যাপী যাঁর সত্তা। সেই সর্বব্যাপী সত্তার উদ্দেশ্যে আমার সমস্ত ক্রিয়া যখন অর্পিত হয়, তখনই আরম্ভ হয় যজ্ঞ। আর একটি জিনিস হল যজ্ঞের 'বিধি'। এখন বিধিবোধিত কর্ম শুরু হয়েছে জীবনে। এতদিন জীবন অনিয়ন্ত্রিত ছিল, বিধিবোধিত ছিল না, এখন যজ্ঞেতে তা বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে আরম্ভ করল। একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে এবং একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে আমাদের সমগ্র কর্মস্রোত প্রধাবিত হতে থাকল। এই যে একটি কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি কর্মস্রোতকে নিয়ে চলেছি, সেই কেন্দ্রের সঙ্গে আমার ক্রমশ ক্রমশ আরও নৈকট্য, আরও গভীর গভীরতর সান্নিধ্যলাভের এই যে প্রয়াস, তারই নাম হচ্ছে যোগ। সেই যোগের কথা শ্রীভগবান শোনালেন অর্জুনকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে, এবং এটা হচ্ছে চিত্তকে, ইন্দ্রিয়কে, মনকে ক্রমশঃ গুটিয়ে আনা। বাইরের ছড়ানো জিনিস এখন ক্রমশ গুটিয়ে আসছে কেন্দ্রের দিকে। সেই গোটানোর সাধনা, কেমন করে চিত্তকে গুটিয়ে আনতে হয়, তারই কথা তিনি এখানে বললেন।

চিত্ত বা মনকে নিয়ন্ত্রণ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ মন অতি সূক্ষ্ম ও অগোচর থাকায় সে আমার ধরা-ছোঁওয়া বা নাগালের বাইরে থেকে যায়। আমার গোচরে যা স্থূলরূপে আছে তা হল আমার দেহ। আর সেই দেহের মধ্যেই আছে প্রাণ ও মন। তাই ছড়ানো চিত্তকে গোটাবার আগে, স্থির করার পূর্বে চিত্ত যাতে অধিষ্ঠিত, সেই দেহকে স্থির করতে হয় ঃ

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্‌ ।। ১১ ।।

আসনকে কোথায় কেমন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে? একটি শুচি পবিত্র স্থানে। 'সমং কায়শিরোগ্রীবং' রূপে দেহকে সমান করে, সুস্থির করে বসতে হবে, ছড়ানো এলোমেলো দেহকে প্রথম নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সেই দেহ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তার মধ্যে অধিষ্ঠিত প্রাণ ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রাণ সুনিয়ন্ত্রিত হলেই আস্তে আস্তে তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত মনও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে আসবে, কেন্দ্রাভিমুখী হবে। সমত্বের সাধন দেহ থেকেই আরম্ভ করতে হবে 'সমং কায়শিরোগ্রীবং' দিয়ে। তারপর এগিয়ে যেতে হবে, 'প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা'। শেষে মনের স্তরে সমত্ব আসবে 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ'। এই হল গীতার সমত্বের ক্রম।

এইটি হল যোগের মূল কথা। কিন্তু এ সবকিছুই, এই ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান যা-কিছু করতে বলেছেন, সবটাই সাধকের নিজের দায়িত্ব, সেইটেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিশেষ করে ঃ

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানাং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ।। ৫ ।।

নিজেকে আমি নষ্ট-ভ্রষ্ট করব, কি তাঁর উদ্দেশ্যে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করব, এই স্বাধীনতা আমার। আমি ইচ্ছা করলে জীবনকে সেই এক লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করতে পারি, আবার ইচ্ছা করলে নিজের প্রতি নিজেই শত্রুতা আচরণ করতে পারি। এইজন্য, নিজেই তুমি নিজের বন্ধু, নিজেই তুমি নিজের শত্রু। এখানে সব দায়িত্বটা নিজেরই উপরে।

টীকাকারেরা তাই বলেছেন, প্রথম ছয় অধ্যায়ে, প্রথম ষট্‌কেতে ভগবান শিখিয়েছেন 'ত্বং' পদার্থকে। 'তুমি'কে, তোমার স্বরূপকে আগে শুদ্ধ করো, আগে জানো। তারপর পরের ছয় অধ্যায়ে, দ্বিতীয় ষট্‌কে 'তৎ,' সেই যিনি বিশ্বে ওতপ্রোত হয়ে আছেন, যিনি ঈশ্বর, তাঁকে তুমি পরে জানবে। তখন তিনি

তোমাকে উদ্ধার করবেন। তার নাম ঈশ্বরকৃপা 'তেষামহং সমুদ্ধর্তা,' এই তাঁর অভয় আশ্বাস। আগে নিজেকে জানো, নিজেকে উদ্ধার করো। এর নাম আত্মকৃপা। এই নিজেকে উদ্ধার করবার যে ব্রত, সেই ব্রতটি তিনি এখানে গ্রহণ করালেন সাধককে, এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে। শেষে 'অসি'তে হবে পূর্ণ মিলন শেষের ছয় অধ্যায়ে, তৃতীয় ষট্‌কে। তখন উপনিষদের সেই মহাবাক্য 'তৎ ত্বম্ অসি' জীবনে সার্থক হবে।

সেইজন্য অর্জুনের মনে যে সংশয় জেগেছিল, কর্ম করব, না কর্ম ত্যাগ করব, সেই সংশয় নিরসন করতে শ্রীভগবান পরিষ্কার দেখিয়ে দিলেন যে যতদিন তুমি যোগের পথে আরোহণ করতে ইচ্ছুক, ততদিন তোমাকে কর্ম করতেই হবে। হিমগিরির উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করতে হলে আমাকে যেমন ক্রমশ ক্রমশ সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে হয়, কিন্তু একবার শিখরদেশে পৌঁছে গেলে আর যেমন পদচারণার প্রয়োজন হয় না, তেমনি এখানেও বলেছেন সেই কথা।

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ।। ৩ ।।

যিনি যোগের পথে আরোহণ করতে ইচ্ছুক হয়ে কর্ম করছিলেন, তিনিই যোগরূঢ় হয়ে শম, কিনা কর্ম-প্রশমন বা কর্ম-বিরতি, তাকেই আশ্রয় করেন। কিন্তু আগে বুঝতে হবে যে কোন্ অবস্থায় আমি আছি। যোগে যদি আরোহণ করতে ইচ্ছুক থাকো তাহলে বিপুলভাবে তোমাকে কর্ম করতে হবে। কোন্ কর্ম? ঐ যজ্ঞার্থ কর্ম। সেই যজ্ঞার্থ কর্ম করে করে আমায় এগিয়ে যেতে হবে। তারপর যখন যোগরূঢ় হব তখন কর্ম থেকে আমার বিরতি, তখনই শম বা শান্তির অবকাশ আসবে। এক অবস্থায় কর্মই উন্নতির বা অগ্রগতির কারণ, আর এক অবস্থায় শমই, কর্মবিরামই সিদ্ধির হেতু। তাই সেই অবস্থার বিশদ বর্ণনা করেছেন যাতে সেটাকে অভ্রান্তভাবে চেনা যায়, জানা যায় যে আমি যোগী হয়েছি কিনা, যুক্ত হয়েছি কিনা, যোগরূঢ় হয়েছি কিনা। সমস্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে কেবল তারই লক্ষণ শুনিয়েছেন ভগবান। যোগরূঢ়ের বা যুক্তের প্রধান লক্ষণ হল সমত্ব। যেমন বলেছেন ৮ শ্লোকে ঃ

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো, বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।। ৮ ।।

এখানে যেমন 'সম' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনি পরের শ্লোকেও দেখিয়েছেন ঃ

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ।। ৯ ।।

এই বৈষম্য ক্রমশ ক্রমশ তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে আমার চিত্ত থেকে, মন থেকে। বৈষম্য কেন ঘটে বা কে তা সৃষ্টি করে, ভগবান তা পরিষ্কার করে এখানে দেখিয়ে দিয়েছেন। তা হল এই রাগ-দ্বেষ। এই রাগদ্বেষের মালিন্যের দরুণই আমরা কাউকে ভালো, কাউকে মন্দ, কাউকে বন্ধু বা শত্রু মনে করি। এইভাবে নানারকম দ্বন্দ্ববুদ্ধির দ্বারা আমাদের চিত্ত যে আকুল হচ্ছে, তার কারণ হল এই মালিন্য। এই মালিন্য যিনি দূর করতে পারবেন তাঁর ক্রমশ ক্রমশ এই সমত্ববুদ্ধি, এই সাম্যবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সাম্যবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হলে, তখন আমি যোগে - আরূঢ় হবার, যোগে প্রতিষ্ঠিত হবার, যোগ্য হলাম।

যোগের পথে পা বাড়াতে দুটি জিনিস বিশেষ করে আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রত্যেক জিনিসের এক একটি বিশেষ অধিকার আছে। যেমন, আমি যদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করি, যজ্ঞের দ্বারা আমি নিজেকে পরিশুদ্ধ না করি, তাহলে যোগে প্রবিষ্ট হবার অধিকারই আমার আসে না। যজ্ঞ আমাদের কী দেয়? আমরা শিখেছি যজ্ঞ আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত করে, সুসংযত করে। তাই ভগবান পরিষ্কার, অভ্রান্ত ভাষায় বলেছেন ঃ

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।। ৩৬ ।।

যদি অসংযত হও অথচ যোগের জন্য পা বাড়াও, তাহলে তুমি ইতঃ নষ্ট ততঃ ভ্রষ্ট হবে। কোনোদিন তুমি যোগে আরূঢ় হতে পারবে না। কেননা যোগের অনিবার্য সর্তই হচ্ছে সংযম। সংযতাত্মা যিনি নন, তাঁর পক্ষে যোগ কোনোদিনই সম্ভব হবে না। এই যোগ-অনুষ্ঠানের যেমন একটি মূল স্তম্ভ হল সংযম তেমনি দ্বিতীয় আর একটি জিনিসও অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। তা হল—

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিন্নচেতসা ।। ২৩ ।।

এই অনির্বেদটি চাই। আমি যোগের পথে পা বাড়িয়েছি, সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, কিন্তু কিছুদূরে অগ্রসর হয়েই যদি বলতে থাকি 'আর কত দূর সেই লক্ষ্য, কতদিনে আমি সেখানে পৌঁছব,' আর এই ভেবে যদি আমার চিত্তে হতাশা আসে, নির্বেদ আসে, তাহলে আমি যোগে অটল থাকতে পারব না। যোগভ্রষ্ট হব। সেইজন্য যোগের জন্য আর একটি জিনিস যা একান্তই দরকার, তা হল অসীম ধৈর্য, মনোবল, যাঁর নাম অনির্বিন্নতা।

এইসব শ্লোকের ব্যাখ্যার সময়ে টীকাকাররা আমাদের শুনিয়েছেন সেই টিট্টিভ পক্ষীর কাহিনী, যে সঙ্কল্প করেছিল সমুদ্রের জল তার ঠোঁটে করে একটি

একটি বিন্দু সে সঞ্চয় করে আনবে, এনে বালির উপর ফেলে সমুদ্রকে শোষণ করবে। এ যেমন একান্ত অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়, এ যেমন আমাদের কাছে উপহাসাস্পদ হয়, মনে হয় যে বাতুলের প্রয়াস, ঠিক তেমনিভাবে সেই বাতুলের মতোই যে মেতে উঠেছে, এবং তার ফলে কর্ম-প্রয়াসে যার এসেছে অদম্য উৎসাহ, সে কোনোদিন কিছুতেই নিরুদ্যম নিরুৎসাহ হবে না, সে সমুদ্রকে শোষণ করবেই, আজই হোক, কালই হোক, আর অনন্ত কালেই হোক। এমনিভাবে তিল তিল ক'রে সমুদ্রশোষণে যেমন ধৈর্যের প্রয়োজন, তেমনি একদিন না একদিন আমি যোগে প্রতিষ্ঠিত হবই হব, যদি চিত্তের মধ্যে মনের মধ্যে এইরকম দৃঢ়তা থাকে, নিশ্চয়তা আসে, তাহলে সেই নিশ্চয়তা এবং অনির্বেদ, আর সেই সঙ্গে সংযম, এই তিনটিকে পুঁজি করে আমরা এগিয়ে যেতে পারব যোগের পথে।

সেই যোগের লক্ষণ আরও সুস্পষ্টভাবে দিয়ে ভগবান বিশেষ করে সাবধান করেছেন এই বলে যে নিশ্চয়তা বা দৃঢ়তা মানে জেদ বা একগুঁয়েমি নয়। যখন যোগ করতে যাবে তখন সবসময় মনে রাখবে এই যোগ হল মধ্যপথ, বুদ্ধের ভাষায় 'মধ্যমা প্রতিপদা'। সাধকরা, মহাপুরুষেরা নিজেদের জীবনে এইগুলি অনুষ্ঠান করে দেখিয়ে যান মানুষের শিক্ষার জন্য। বুদ্ধদেব যখন এই জ্ঞানের জন্য লালায়িত হয়েছিলেন, তখন দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন ঃ

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতি।

কী কঠোর ব্রত তিনি ধারণ করেছিলেন। সংকল্প করেছিলেন আমার সবকিছু চলে যাক্, দেহ অস্থিচর্মসার হোক, লয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হোক, এ সাধন আমি ত্যাগ করছি না যতক্ষণ না আমি জ্ঞানলাভ করছি। আহার-বিহার নিদ্রা সব কিছু ত্যাগ করে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সেই কঠোরতায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু দেখলেন এই কঠোরতার ফলে তার চিত্তের বা মনের মূর্ছাভাব এসে উপস্থিত হচ্ছে, অর্থাৎ কোথায় জ্ঞান লাভ করবেন, না তার জায়গায় তিনি অজ্ঞানের দিকে ঢলে পড়ছেন। তখন সেই আকাশবাণী তিনি শুনতে পেলেন 'মধ্যপথকে অবলম্বন করো।' গিরীশচন্দ্র তাঁর একটি গানে এই ভাবটি বড়ো সুন্দর ফুটিয়েছেন ঃ

আমার এই সাধের বীণা যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার।
তানে মানে বাঁধলে ডুরি তারে শতধারে বয় মাধুরী
বাজে না আলগা তারে টানে ছিঁড়ে কোমল তার।।

সাধের বীণার মরম যে জানে সে তো তার বাঁধে না টানে
যে জোর ক'রে ডোর বাঁধবে টেনে বীণা নীরব রবে তার।।*

ভগবান সেটি আমাদের এখানে অতি সুন্দর করেই শুনিয়েছেন ঃ

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ।। ১৬।।

অতি বেশি ভোজন করলেও যোগ হয় না, আবার অনশন করলেও যোগ হয় না। আবার কেউ যদি মনে করেন আমি ঘুমোবই না, একেবারে বিনিদ্র রজনী যাপন করব, তাতেও যোগ হয় না। আবার দিনরাত ঘুমোলেও যোগ হয় না। সবসময় মনে রাখতে হবে ঃ

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ।। ১৭ ।।

এইভাবে যদি যোগের অনুশীলন করতে পারি ঠিক মধ্যপথে থেকে, অর্থাৎ প্রাণকে যথাযথভাবে রেখে, প্রাণকে কোনভাবে আঘাত না করে, তাহলেই যোগ সর্বদুঃখহর হয়ে ওঠে। কেননা প্রাণকে আমার বিকশিত করতে হবে। এই প্রাণরূপেই আমার অন্তর্যামী হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সেই প্রাণকে বিকশিত করা, পরিস্ফুট করা, ফুটিয়ে তোলা, এই হল আমাদের জীবনের লক্ষ্য। সেই জীবনের থেকেই আমি ভ্রষ্ট হয়ে যাব যদি যোগকে সংকীর্ণ একপেশে দৃষ্টি নিয়ে অনুসরণ করি, যদি মনে করি যে সমস্ত ভোগ থেকে জীবনকে বঞ্চিত করে না রাখলে যোগ হবে না। এইরকম একটা জেদের বশবর্তী হয়ে কোনো যোগানুষ্ঠান হতে পারে না। প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের ধারা ধরেই সাধককে যোগের পথে অগ্রসর হতে হবে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে বা জোরজুলুম করে নয়। সেই কথাই ভগবান অভ্রান্ত ভাষায় শুনিয়েছেন।

যোগের পথে এগোতে এগোতে তারপর সাধকের কী হয়? সে যুক্ত হয়। কখন? ১৮ শ্লোকে তা শুনিয়ে দিয়েছেন ঃ

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ।। ১৮ ।।

আমি যুক্ত বা অযুক্ত তার যাচাই এইসব শ্লোকের দ্বারা নিজেকে করতে হবে। তখনই আমি যোগে আরূঢ় বা যোগভ্রষ্ট, বা এখনো যোগের পথে পা দিয়েছি কিনা, কী অবস্থায় আছি, সব তার থেকেই যাচাই হতে পারবে। যোগের সংজ্ঞায় ভগবান এই অধ্যায়ে বিশেষ করে দেখিয়ে দিলেন যে দুঃখকষ্ট পাওয়াটাই যোগ নয়, দুঃখ-কষ্ট থেকে বিরতি যেটা, সেটাই যোগ।

*দ্রষ্টব্য ঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ বুদ্ধদেব চরিত, চতুর্থ অঙ্ক।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ।। ২২ ।।

সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে যোগ শব্দটা আসলে বিয়োগ বোঝায়। কিসের বিয়োগ? দুঃখের বিয়োগ, দুঃখ-ত্রাণ। 'দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্' (২৩)। সেই যোগের আমরা আকাঙ্ক্ষা করি যে যোগের ফলে আমরা সমস্ত দুঃখ থেকে বিযুক্ত বা বিমুক্ত হতে পারি।

এখন সেই যোগকে তিনি চেনাচ্ছেন। যোগ করতে হলে কী করতে হবে? আমরা শুনলাম সমস্ত মনকে, ইন্দ্রিয়কে, প্রাণকে গুটিয়ে আনতে হবে, কেন্দ্রস্থ করতে হবে। গুটিয়ে এনে কী করতে হবে? ভগবান দুটি উপদেশ দিয়েছেন ষষ্ঠ অধ্যায়ে যা আমাদের বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। প্রথমত বলেছেন ২৫ শ্লোকে ঃ

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ।। ২৫ ।।

অন্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে। পরিত্যাগ করে আত্মাতেই মনটিকে তোমার অভিনিবিষ্ট করতে হবে। উপনিষদের ঋষি সেই একই কথা বলেছেন ঃ

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্।
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।।—মুণ্ডক ২/১/৫

এই অমৃতের সেতু পাতা রয়েছে। অন্য কথা ছাড়ো। আর সমস্ত আজে বাজে চিন্তা পরিত্যাগ করে সমস্ত মন-প্রাণকে নিবিষ্ট করো, ঢেলে দাও তাঁকেই শুধু জানবার জন্য 'তমেবৈকং জানথ'। এখানে ভগবান বলেছেন 'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'। এ বললেই তো শুধু হয় না, চিত্ত যে আমার কেবলই ছুটে যায় বাইরের দিকে, বিষয়ের দিকে। সে যখনই ছুটে যেতে চাইবে তখনই তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো, তাকে ফিরিয়ে আনো। এই সচেতনতা না থাকলে বৃথাই হবে যোগের পথে পা দেওয়া। তাই যেই দেখবে যে মন বেরিয়ে যাচ্ছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে ঃ

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ।। ২৬ ।।

আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে একটি কেন্দ্র আমি পেয়েছি। এতদিন জীবনে কেন্দ্র ছিল না, এখন একটি কেন্দ্রে বার বার আমি জীবনকে ফিরিয়ে আনতে পারি, সেই খুঁটিতে এখন বাঁধতে পারি। এতদিন জীবন ছিল উচ্ছৃঙ্খল, এলোমেলো। কেন্দ্রটির সঙ্গে পরিচয় হবার আগে যেমন যেমন বেরিয়ে যেত চিত্ত, আমিও চিত্তের সঙ্গে তেমন তেমন বেরিয়ে যেতাম, ভেসে যেতাম। কিন্তু এখন সেই চিত্ত যখনই বেরিয়ে যায়, তখনই আমি তাকে

কেন্দ্রের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারি। কেননা এখন যে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, ইষ্টদেবতা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এখন আমার নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এসেছে। সেই ইষ্টের সঙ্গে আমার সংযোগ স্থাপন এরই নাম হচ্ছে যোগ। সেই যোগের কথা এখন ভগবান আমাদের শেখাচ্ছেন।

এই যোগের পথে অগ্রসর হলে কী হয়? ক্রমশ ক্রমশ আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হতে থাকে। শুধু যে আমি নিজের মধ্যেই তাঁকে পাই তা নয়, বিশ্বের মধ্যে দেখতে পাই তিনিই রয়েছেন ঃ

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ।। ৩০ ।।

এইরূপে শুধু হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে পেলে হবে না, বিশ্বের মধ্যে, নিখিলের মধ্যে, সমস্ত জীবের মধ্যে তাঁকে পেতে হবে। এ শুধু যে আমাদের যোগশাস্ত্রের কথা বা জ্ঞানশাস্ত্রের কথা তা নয়, ভক্তি শাস্ত্রের কথা তা নয়, সমস্ত শাস্ত্রেরই এই এক কথা। আমরা সব সময়ে একদেশদর্শী বলে মনে করি যে ভক্তির পথ আর জ্ঞানের পথ বুঝি আলাদা। কিন্তু 'শ্রীমদ্ভাগবত'—যেটা ভক্তিশাস্ত্রের শিরোমণি, সেখানে শ্রেষ্ঠ ভক্তের কী লক্ষণ শুনিয়েছেন? শ্রেষ্ঠ ভক্ত তিনিই যিনি—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবম্ আত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।

ভাগবতোত্তম, শ্রেষ্ঠতম ভাগবত তিনিই, সমস্ত ভূতের মধ্যে যিনি দেখেছেন তাঁকেই। সেইজন্য এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ শুনিয়ে গিয়েছেন সেই একই কথা ঃ

বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

জীবে প্রেম মানে এই নয় যে জীবকে আমি করুণা করছি। ঈশ্বরই এসেছেন জীবরূপে, জীবের মধ্যে তিনিই প্রবিষ্ট হয়েছেন, সুতরাং জীবসেবার দ্বারা তাঁরই সেবা করছি আমি—এই ভাবকেই বলা যায় জীবে প্রেম। কোনোরকম অনুকম্পা করে তার একটু সেবা করে দিলাম, এ দৃষ্টি নিয়ে যদি পরের হিত করি, সে পরোপকারের বা charity-র কোনো মূল্য নেই আমাদের দেশে। সেইজন্য আমাদের দেশের অনুশাসন হল নারায়ণজ্ঞানে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। সেই সেবার কথা সেদিন এই যুগেও আমাদের শুনিয়ে শিখিয়ে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরই অনুসরণে জনে জনে শেখালেন স্বামী প্রণবানন্দজী, স্থাপন করলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ।

সেই কথাই এখানে ভগবান শোনাচ্ছেন, তুমি সর্বভূতের মধ্যে আমাকে দেখো। ভগবানের জন্য শুধু দু'ফোঁটা চোখের জল ফেললেই ভক্ত হয় না। যথার্থ ভক্ত হবে সে-ই, যে সর্বভূতের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে। সমস্ত ভূতের মধ্যে আমাকে দেখতে পাওয়ার ফলেই আর কখনো আমি তার দৃষ্টির অগোচরে থাকি না। সব সময়েই সে আমার নয়নে নয়নে থাকে, আমিও তার নয়নে নয়নে থাকি। আমিও তার দৃষ্টির বহির্ভূত হই না, এবং সে-ও আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হয় না। এইরূপে যোগের যখন ক্রমশ ক্রমশ গভীরতা হবে, তখন সেই গভীরতার ফলে তার আর কোনো সাধনের প্রয়োজন থাকে না, কর্মের প্রয়োজন থাকে না, সে যোগারূঢ় হয় এবং ক্রমশ যুক্ততর ও যুক্ততম অবস্থা লাভ করে। প্রথম, তাতে মনকে নিয়োজন, শেষে তাতে নিমগন।

দুটি মুখ্য সাধনের কথা এখানে ভগবান শিখিয়েছেন। যোগশাস্ত্রেও সেই একই কথা বলেছেন, অভ্যাস ও বৈরাগ্য। এই যে চঞ্চল মন ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাকে কেবল গুটিয়ে আনা, তাকে কেবল কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ করিয়ে দেওয়া, আবার সেই কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা—এই যে প্রয়াস, এতে তো হয়রান হয়ে যেতে হবে। কেমন করে তা সম্ভব? অর্জুন বলছেন, এ যে বড়ো চঞ্চল, কৃষ্ণ, তাকে কেমন করে আমি নিগ্রহ করব? কেমন করে বশীভূত করব? ভগবান স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ, মন সত্যই বড়ো চঞ্চল, মনকে বশ করা বড়োই কঠিন, কিন্তু দুটি উপায় আছে।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ।। ৩৫ ।।

এই দুটি উপায়ের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। একটির নাম অভ্যাস, আর একটির নাম বৈরাগ্য। একটি positive method, আর একটি negative method। অভ্যাস হল ক্রমশ ক্রমশ তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া, আর বৈরাগ্য হল, যে বিষয়ের দিকে মন ছুটছে সেদিকে বাঁধ দেওয়া, সেদিক থেকে মনকে ফিরিয়ে আনা। পাতঞ্জল যোগদর্শনের একটি সূত্রেও শুনিয়েছেন 'অভ্যাসবৈরাগ্যাভাং তন্নিরোধঃ—(সমাধিপাদ)। চিত্তের নিরোধ হয় কিসের দ্বারা? অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা।

একটি অনুপম উপমার দ্বারা ব্যাসভাষ্যে শুনিয়েছেন ঃ 'চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী' দু'দিকে বয়ে যায় চিত্তরূপ নদী। 'বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ', একটি কল্যাণের ধারা, আর একটি পাপের ধারা, অকল্যাণের ধারা, অমঙ্গলের ধারা। বৈরাগ্যের দ্বারা কী করতে হয়? 'বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে,' বিষয়ের স্রোতকে বন্ধ করতে হয়, অবরুদ্ধ করতে হয়, বাঁধ দিতে হয়। এইজন্য এটা negative method। আর 'বিবেকদর্শনাভ্যাসেন' কী করতে হয়? 'বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাট্যতে',

ওদিকের স্রোতকে উদ্‌ঘাটন করতে হবে। ক্ষেতে যেমন আল কেটে কেটে রাস্তা করে দিতে হয়, তবে সেদিকে জল প্রধাবিত হয়, তেমনি কেটে কেটে আমাকে সেদিকের পথ তৈরী করতে হবে, সেদিকে চিত্তের প্রবণতা বা গতি ফেরাতে হবে। চিত্তের যে বহির্মুখ গতি, তাকে অন্তর্মুখ গতি করে নিতে হবে। এই double method, দুদিকে যুগপৎ প্রয়োগ করতে হবে। সেইজন্য ভগবান 'চ' শব্দ ব্যবহার করেছেন—'অভ্যাসেন তু' আর 'বৈরাগ্যেণ চ'। এইজন্য যৌগপদ্য, দুটিকে একসঙ্গে, বাঁধ দেওয়া এবং আল কাটা যুগপৎ করে চলতে হবে। এই করতে করতে ক্রমশ যখন আমরা এগিয়ে যাব তখন কোথায় গিয়ে পৌঁছব? ভজনের রাজ্যে, 'মদ্‌গত অন্তরাত্মা'র ভূমিতে। ভগবান দেখালেন যে একবার যদি এই পথে তুমি পদার্পণ করো তাহলে কিন্তু আর ভয় নেই ঃ

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ।। ৪০ ।।

প্রসঙ্গত ভগবান যোগভ্রষ্টের কথাও শুনিয়েছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে কোনো সাধনাই নিষ্ফল হয় না, পূর্বের অভ্যাসই, এ জন্মের সাধনাই পরের জন্মে তাকে টেনে নিয়ে যায় লক্ষ্যের দিকে। সেসব শোনানোর পর উপসংহারে আমাদের শোনালেন যে তুমি যোগী হও, যুক্ত হও এবং যুক্ত হতে হতে যুক্ততম হও। যুক্ত, যুক্ততর, যুক্ততম। যুক্ততম কে? যোগীর মধ্যে তিনিই হলেন যুক্ততম যিনি 'মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা,' আমাতেই যাঁর অন্তরাত্মা বিলীন হয়েছে, চিত্তটি বিলীন হয়েছে, যিনি 'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্'।

এই ভজনের কথা ভগবান হঠাৎ শোনালেন ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে। তার মানে একটা নতুন গতির সূচনা করলেন। আমরা যজন দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। যজন মানেই যজ্ঞ, সেই যজ্ঞেরই গভীরতর অবস্থা হচ্ছে যোগ। এখন যোগের নিবিড়তার ফলে এল ভক্তি বা অনুরক্তি, অনুরাগ।

যুজ্ ধাতু থেকে যোগ। তারপর ভজ্ ধাতু, ভজনের অধিকার এল এইবার। যখন আমি 'মদ্‌গত অন্তরাত্মা' হলাম যখন যুক্ততম হলাম, একেবারে পরম নিবিষ্টতম অবস্থা লাভ করলাম ভগবানে, তখন আমার এল যুক্ততম অবস্থা। যেই যুক্ততম অবস্থা হল, অমনি একটা নতুন জগৎ আমার কাছে খুলে গেল। সেটা হল ভজনের রাজ্য, তাঁর সঙ্গে হৃদয়ের রসসুমধুর সম্পর্কের রাজ্য, যার ফলে শেষে আসবে সেই প্রেম-যমুনায় নিমজ্জনের লগ্ন, 'বিশতে তদনন্তরম্'।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সপ্তম অধ্যায় থেকে ভগবান এক নতুন জগতের সন্ধান দিচ্ছেন। সে কোন্ জগৎ? এক আশ্চর্য বিভূতির জগৎ। এখন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের যে জগতে আমরা বাস করছি, সে-জগতে কেবল কতকগুলো দৃশ্য শুধু আমাদের চোখের সামনে আসছে, কতকগুলো শব্দ আমাদের কানের মধ্যে এসে পড়ছে। এইভাবে নানারকম ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি মাত্র আমাদের হচ্ছে। তার মধ্যে তাঁর আভাস, তাঁর প্রকাশ এতদিন দেখতে পাইনি। 'মাং'কে বা 'অহং'কে, চৈতন্যস্বরূপকে দেখিনি। এখন উপলব্ধি হতে লাগল যে সকলের মধ্যে তিনিই প্রকাশিত। যেই যুক্ততম হলাম, চিত্ত যেই গুটিয়ে এল কেন্দ্রে, অমনি সেই কেন্দ্র থেকে এখন বিশ্বকে দেখি। তখন কী উপলব্ধি হয়? বুঝি, যা-কিছু দেখছি, এ সবই তাঁর প্রকৃতি। তাঁর দুটি প্রকৃতি, পরা ও অপরা। এই দুই প্রকৃতিকে নিয়ে সেই পরমপুরুষ লীলা করছেন। তিনিই নিজেকে বিচ্ছুরিত করেছেন এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে, এবং তখন আমি বুঝতে পারি যেটা ভগবান শোনালেন ৭ শ্লোকে ঃ

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।। ৭ ।।

সবকিছু মণির মতো একটি সূত্রে গাঁথা। অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্র-মালিকা মহাব্যোমে পরিভ্রমণ করছে, তারা সকলেই কিন্তু এক অলক্ষ্য সূত্রে গাঁথা রয়েছে। তাই উপনিষদে শুনিয়েছেন, এই যে দেখছ আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা, এ কার দ্বারা বিধৃত?—'এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'। এই যে তুমি দেখছিলে বিচ্ছিন্নরূপে কোথাও সূর্য চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র, তখন দেখবে সেই একই অক্ষরের দ্বারা তাঁরই সূত্রে নিখিল বিশ্ব গ্রথিত হয়ে আছে। এই গ্রথিত হয়ে থাকার প্রথম আভাস পেলাম এখানেঃ 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'। এতদিন জলকে শুধু জল বলেই দেখেছি, তাকে নানাভাবে ব্যবহার করে এসেছি। যখন পিপাসার্ত হয়েছি, জল পান করে স্নিগ্ধ হয়েছি, ক্লান্ত শ্রান্ত ঘর্মাক্ত হয়ে তাতে স্নান করে আমি তৃপ্ত হয়েছি, তখন কিন্তু জলকে

আমি চিনিনি।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ।। ৮ ।।

এখন জানলাম রসরূপে তিনিই জলের মধ্যে রয়েছেন বলেই জল আজ আমার কাছে এত রসময়, অমৃতময়। আমি সূর্যের প্রভায় উল্লসিত উদ্ভাসিত হই, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে বিমুগ্ধ হই, কিন্তু সে-প্রভা, সে-আলো কোথা থেকে এসেছে?—'প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।' সুতরাং প্রকৃতির সবকিছু থেকেই তখন আমি তাঁর সংবাদ পেতে থাকি। সমস্ত প্রকৃতি তখন আমার কাছে এক নতুন জগৎ খুলে দেয়। সে নতুন জগৎ সংবাদ এনে দেয় তাঁর, যিনি বিশ্বচরাচরে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। এইজন্য এই বিভূতির প্রসঙ্গ তিনি সপ্তম অধ্যায়ে বিশেষভাবে উত্থাপন করলেন।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে ঃ তুমি যদি এমনভাবেই ছড়িয়ে আছ এই বিশ্বে, তাহলে সবাই তোমায় দেখতে পায় না কেন? তুমি তো সমস্ত বিশ্বচরাচরে ওতপ্রোত হয়ে আছ। উত্তরে বললেন, হ্যাঁ দেখতে পায় না, তার কারণ ঐ যে আবরণ দিয়ে রেখেছি আমি।—কিসের আবরণ?

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ।। ১৩ ।।

এইভাবে ভগবান জানালেন যে কেন তিনি সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোত থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে জানতে পারি না, দেখতে পাই না। এই হল মূঢ়ত্ব। এইজাতীয় মূঢ়ত্ব বা মূর্খত্ব যার, তাকেই ভগবান 'নরাধম' বলেছেন গীতার গূঢ় ভাষায়। যারা তাঁর প্রতি প্রপন্ন হয় না তারাই হল মূঢ়, তরাই হল দুষ্কৃতিকারী, নরাধম ঃ

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ।। ১৫ ।।

এই আসুর ভাব আশ্রয় করে তারা বসে থাকে, এইজন্য তারা আমাকে চেনে না। তারা মূঢ় নরাধম এই কারণেই যে তারা প্রপন্ন হয় না আমাতে। তারা চিনল না আমাকে। এই তাঁকে না চেনার যে দুর্গতি, এই দুর্গতির মূল কিন্তু চিনিয়ে দিয়েছেন ভগবান 'দুষ্কৃতিনঃ' এই কথাটির মধ্যে। এইজন্য আবার আমাদের সেই গোড়াতে ফিরে যেতে হবে, সুকৃতিশালী হতে হবে। সুকৃতির গোড়ার কথা হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান, জীবনকে যজ্ঞময় করা। এইজন্য মনুসংহিতা

বলেছেন ঃ 'মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ,' এই তনুটিকে ব্রাহ্মী করতে হবে মহাযজ্ঞের পর মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা। সেই অগ্নির দ্বারা দেহকে, মনকে, ইন্দ্রিয়কে তার পাবকশিখায় বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। তখন চোখের ঠুলি খসে যাবে, হয়ে উঠব 'সুকৃতিনঃ' এবং তাঁর ভজনের অধিকারী।

তারপর ভগবান চেনালেন যে ভজনের নানা রকমফের আছে। অনেকেই তাঁর দুয়ারে আসে। কেউ কোনো কামনা নিয়ে আসে, কেউ কোনো বাসনার পরিপূর্তির জন্য আসে, কেউ আসে অর্থপ্রাপ্তির আশায় বা অন্য কোনো প্রয়োজনের তাগিদে, কেউ আসে তার দুঃখ-দারিদ্রের বিনাশের জন্য, আর কেউ বা শুধু তাঁকে জানবার জন্যই আসে। এইজন্য ভাবের ভেদ অনুসারে নানারকম ভক্তের যে ভেদ, সে ভেদের কথা শুনিয়েছেন ভগবান এই সপ্তম অধ্যায়ে ভজনের প্রসঙ্গে ঃ

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ।। ১৬ ।।

মনে রাখতে হবে যে এরা সবাই সুকৃতিশালী। যাঁরা ভগবানকে ভজন করেন তাঁরাই সুকৃতিশালী, তবে কারুর মধ্যে কামনার মালিন্য আছে কারুর মধ্যে কামনার মালিন্য নেই। কিন্তু এখানে একটি রহস্যের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে যাঁরা ভগবানকে ভজন করছেন তাঁরা যদি কোনো কামনা নিয়েও ভজন করেন শুধু ভগবানকে স্পর্শ করার ফলেই তাঁদের সে কামনা নিঃশেষে তিরোহিত হয়ে যায়। যেমন ধ্রুবের উপাখ্যানে আমরা শুনি, তিনি রাজ্যপদ চেয়েছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল যে তিনি রাজা হতে পারলেন না, তাঁকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন পিতা। এইজন্য মনের ক্ষোভে তিনি ভগবানকে ডেকেছিলেন। কিন্তু যখন ভগবানকে পেলেন তখন বললেন যে আমি তো শুধু কাঁচ চেয়েছিলাম, আজ কাঁচের বদলে কাঞ্চন পেয়েছি আমি, তাই অন্য সবকিছুই আজ আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। যাঁরা ভগবানকে ভজনা করেন তাঁদের কাছে শেষে সমস্ত কামনার বস্তুই তুচ্ছ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে ভজনার দুটি ধারাকে গীতায় সুস্পষ্টভাবে পৃথক বলে নির্দেশ করা হয়েছে। একটি হল ভগবানের ভজনা, আর একটি অন্য দেবতার ভজনা, ক্ষুদ্র দেবতার ভজনা। ক্ষুদ্র দেবতার ভজনায়, কামনার পরিতৃপ্তিতেই সব কারবার শেষ হয়ে যায়। এ লেনদেনের ব্যাপার, এ যেন বণিকবৃত্তি। কিন্তু ভগবানের কাছে যখন প্রপন্ন হয় মানুষ, সে অর্থের জন্যই হোক বা দুর্গতি-ত্রাণের জন্যই হোক, যেকোন কারণে তাঁর কাছে যে আশ্রয়

নেয়, সে সুকৃতিশালী। তাঁর সাক্ষাৎ স্পর্শের ফলে তার কামনা-বাসনা শুদ্ধ হয়ে যায়, নির্মূল হয়ে যায় এবং সে সেই পরম লক্ষ্যে একদিন না একদিন গিয়ে পৌঁছে যায়। আর জ্ঞানী যে পৌঁছন, তার তো কথাই নেই! কেননা, ভগবান বলছেন জ্ঞানবান আমাতে প্রপন্ন হয় সে কিন্তু অনেক অনেক জন্মের পর। সমস্ত কামনামুক্ত হয়ে শুধু আমাকে চাওয়া, এ বড়ো দুর্লভ ভাগ্যের কথা ঃ

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।। ১৯ ।।

কেননা, তাঁর এই উপলব্ধি হয় যে সমস্তই বাসুদেব, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।

সাধারণত মানুষ কামনার দ্বারা 'অপহৃতজ্ঞানা'। তারা অন্য অন্য দেবতার দুয়ারে গিয়ে মাথা কোটে এবং সেই সেই কামনার পরিপূর্তিতেই তারা তৃপ্ত থাকে। কিন্তু তারা যা পায় ক্ষণকাল পরেই তা হারায়, তার ফল সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় ঃ

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।। ২৩ ।।

অন্তবান্ সামান্য ফল, সে-ফল ভোগমাত্রেই ক্ষয় হয়ে যায়, অনন্ত ফল তারা লাভ করতে পারে না। এইজন্য তারা ভগবানের কাছে আসে না, তারা ক্ষুদ্র দেবতার কাছে যায়। তাই অর্জুন যেন বলছেন, তোমাকে যে ভজনা করব, তাতে আমার কী লাভ? অর্থাৎ বিশ্ব-সংসারে যতকিছু রহস্য, জগৎরহস্য, ব্রহ্মস্বরূপের রহস্য সেসব তো আর তাতে কিছু জানা হবে না! বললেন, হ্যাঁ, যারা আমাকে ভজনা করে তারা সবই জানতে পায়। এ ভজনের ফল কী হয় উপসংহারে ভগবান তাই শোনালেন ঃ

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ।। ২৯ ।।
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ।। ৩০ ।।

অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মস্বরূপকে জানতে চাইছ, অধ্যাত্মস্বরূপকে চিনতে চাইছ, অধিযজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চাইছ, যা-কিছু তত্ত্ব জানতে চাইছ, আমাকে আশ্রয় করেই সবকিছু জানা যায়। কেননা, আমাকে আশ্রয় করেই যে সবকিছু বিবর্তিত হয়েছে, আমাকে আশ্রয় করেই এ সবকিছুর প্রকাশ। আত্মাকে আশ্রয় করে যে প্রকাশ তা হল 'অধ্যাত্ম', যজ্ঞকে আশ্রয় করে যে প্রকাশ তা হল 'অধিযজ্ঞ', দেবতাকে আশ্রয় করে প্রকাশ হল 'অধিদৈব' ইত্যাদি। কিন্তু সবগুলিই

আমারই প্রকাশ, কেবল 'আধি' বা উপাধিযুক্ত প্রকাশ, সীমিত প্রকাশ। সমগ্রভাবে আমাকে জানাটাই হল সবচেয়ে মূল কথা। সেটা যিনি পারেন, তিনি মরণের যে ঘন আবরণ, সে-আবরণ ভেদ করেও আমাকে দেখতে পান।

মরণের ঘন আবরণ এলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে তিনি বুঝি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাবেন, ভয় হয় তখন আমি তাঁর সঙ্গে বুঝি আর যোগ রাখতে পারব না, বুঝি আমার চেতনার বিলুপ্তি ঘটে যাবে, আমার চৈতন্যের সঙ্গে আর যোগ থাকবে না। এই যে আশঙ্কা, বিভ্রান্তি, সে বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পান এই ভক্ত। প্রয়াণকালেও তিনি সেই এক লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি থেকে তাঁর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকেন। ঐ যে কেন্দ্রটি অন্তরে স্থাপিত হয়েছে, সেই কেন্দ্রে এমন অভিনিবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন তিনি, যে প্রয়াণকালেও দেহ যখন অচৈতন্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ইন্দ্রিয় যখন অবশ শিথিল, মন যখন স্তিমিত, তখনো তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা সেই পরমাত্মাতেই নিলীন হয়ে থাকবে। সেই ভক্তই তখন গেয়ে ওঠেন ঃ

'আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি—
মরণরূপে আসিলে প্রভু,
চরণ ধরি মরিব হে।'

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্মযোগ

জীবনে শ্রীভগবানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ হলেই প্রয়াণকালে তাঁকে স্মরণে রাখা সম্ভব। অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে তাই শ্রীভগবান সংক্ষেপে দুটি শ্লোকে তাঁর পাঁচটি বিভাবের পরিচয় দিয়েছেন। মূলে সেই অক্ষর পরম, যিনি 'ব্রহ্ম', যিনি 'স্ব'। তিনিই যখন ভাবযুক্ত হন, অর্থাৎ সৃষ্টির ভাবে ভাবিত হন, তখন হন 'অধ্যাত্ম', তার থেকেই হয় ভূতভাবের উদ্ভব। এই 'বি-সর্গ' বা বিশেষ সৃষ্টির নামই 'কর্ম'। সৃষ্টির মধ্যে তাঁর মুখ্য দুটি রূপ ঃ একটি ভূতের বা জড়ের মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ, যেটি 'অধিভূত', আর একটি চেতনরূপ, দেবরূপ, পুরুষরূপ, যেটি 'অধিদৈব'। আর এই সৃষ্টিযজ্ঞের মূলে তার অধিষ্ঠাতা প্রাণরূপে দেহের মধ্যেই তিনি বিরাজ করছেন 'অধিযজ্ঞ'রূপে, পরিচালনা করছেন এই বিশ্বমহাযজ্ঞ। মূল থেকে স্থূল পর্যন্ত পঞ্চাঙ্গে এইভাবে তাঁকে চিনলে তবেই প্রয়াণকালে তিনি জ্ঞেয় বা ধ্যেয় হন।

প্রয়াণকালে তাঁকে স্মরণের এই কথাই ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষ করে শুনিয়েছেন। মরণোত্তর গতির কথাও বিস্তারিতভাবে বলেছেন। সেই গতি বিস্তারিতভাবে শোনানোর মধ্যে একটি রহস্য আছে। দেখিয়েছেন যে, যোগী যে গতি লাভ করেন, আর ভক্ত যে গতি লাভ করেন, তার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে। যোগী যে গতি লাভ করেন তার পিছনে আছে তাঁর নিজস্ব প্রয়াস। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারকে রুদ্ধ করে কোনো একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে নিজের চিত্তকে স্থাপন করবার চেষ্টা করেন ঃ

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।। ১২।।

আর যিনি ভক্ত তিনি কী করেন? ভগবানে মনকে নিবিষ্ট করবার জন্য তাঁর আবার কিছুই করতে হয় না ঃ

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।। ১৪।।

অনন্যচেতা হয়ে তিনি নিত্যযুক্ত থাকেন বলে তাঁর আর এভাবে কোনো বিশিষ্ট কেন্দ্রে আয়াস-প্রয়াস করে মনকে গুটিয়ে আনতে হয় না। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে, মনের সর্বাবস্থার মধ্য দিয়ে অখণ্ড স্মরণের মাধ্যমে নিরন্তর শ্রীভগবানের সঙ্গে তিনি সংযোগ রক্ষা করে চলেন। এই নিত্য স্মরণের দ্বারা সহজ সংযোগ রক্ষা করে চলেন বলেই তিনি তাঁকে পান সুলভে, অনায়াসে। এইভাবে তাঁকে যিনি পান তাঁর কোনোদিন 'দুঃখালয়মশাশ্বতম্' এই পুনর্জন্মের মধ্যে, এই সংসার-চক্রের মধ্যে আর আসতে হয় না। এখানে এই মহারহস্যটি ভগবান উদ্‌ঘাটন করেছেন, এই অষ্টম অধ্যায়ে।

এই প্রসঙ্গে তিনি এখানে শুনিয়েছেন কালের আবর্তনের কথা। এটিও আর এক পরম রহস্য। কালের চক্র আবর্তিত হচ্ছে দুদিক দিয়ে। একটি যেন তার দক্ষিণমুখী বা অধোমুখী গতি, আর একটি তার উত্তরমুখী বা উর্ধ্বমুখী গতি। যেটা অধোমুখী গতি, দক্ষিণাবর্তের গতি, সেটাতে সে ক্রমশ ক্রমশ নেমে আসছে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। আর উর্ধ্বদিকের যে গতি, উত্তরগতি, সে উত্তরগতি ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলোর দিকে যেতে যেতে পরিপূর্ণ বিমুক্তির দিকে নিয়ে চলেছে। সুতরাং সেই বিমুক্তির দিকে যদি যেতে চাই, এই যে কালচক্র আবর্তিত হচ্ছে নিরন্তর, সেই কালচক্রের আর্বতন থেকে যদি আমি মুক্তি পেতে চাই, তাহলে আমাকে কোথায় যেতে হবে? তাঁর আশ্রয়ে যেতে হবে যিনি কালাতীত নিরঞ্জন। কেননা সেখানে না গেলে কালের আবর্তন থেকে কিছুতেই মুক্তি নেই, একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

এইজন্য আমাদের সব শাস্ত্রেই দেখা যায়, এই ব্রহ্মাণ্ডাদির সংস্থানের কথা যেখানে যেখানে শুনিয়েছেন পুরাণাদিতে বা যোগ-দর্শনাদি অন্যান্য শাস্ত্রে, সেখানেই বলেছেন যে আমরা এই যে এইটুকু জগতে বাস করছি, এরকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড চারিদিকে ছড়িয়ে আছে এবং সেখানে নানাস্তরের মহাপুরুষরা, জীবরা বাস করছেন, দেবমানব বাস করছেন। তাঁরা ধ্যানপরায়ণ, ধ্যানের দ্বারাই তৃপ্ত, তাঁরা সমস্ত প্রকৃতির অধীশ্বর। কিন্তু প্রকৃতির অধীশ্বর হয়েও সেই প্রাজাপত্য লোকে, সেই মহর্লোকে, জনলোকে, তপলোকে, সত্যলোকে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও কিন্তু 'পুনরাবর্তিনোঽর্জুন', তাঁরাও পুনরাবর্তন থেকে নিষ্কৃতি কেউ পাচ্ছেন না। একবার ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে মিলিয়ে যাচ্ছেন, আবার অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হচ্ছেন। কেননা তাঁরা এই জগৎচক্রের মধ্যেই রয়েছেন। এই জগৎচক্রের যিনি নিয়ন্তা, জগৎচক্রের যিনি অধিষ্ঠাতা, যিনি 'অব্যক্তাদপি চোত্তম', 'অব্যক্ত সনাতন' তাঁর শরণাপন্ন হতে পারেন না। তাই ভগবান বার বার বলছেন ঃ

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।। ১৬।।

এই 'মাম্ উপেত্য' কথাটির রহস্য আমাদের বুঝতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে একজন লোক বলছেন, আশ্বাস দিচ্ছেন ডাক দিয়ে যে তুমি আমার কাছে চলে এসো, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি পুনর্জন্ম থেকে ত্রাণ পাবে। এই 'মাম্' অর্থাৎ আমাকে চিনতে হবে, চিনতে হবে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপকে, যাকে চেনানোই গীতার লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই তার সূচনা হয়েছে।

ভারতের অধ্যাত্মসাধনার মূল কথা এই আত্মবাদ। এই আত্মবাদ মানে আত্মাকে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিৎ-স্বরূপকে চেনা। অন্য সমস্তই প্রকৃতির প্রকারভেদ মাত্র। প্রকৃতির মধ্যে নানারকম স্তরবিভাগ, অনন্ত কোটি বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু প্রকৃতির কোনো এক উচ্চস্তরে উঠে যদি আমরা বিভ্রান্ত হই, মনে করি এই বুঝি আত্মজ্ঞান লাভ করলাম, সেটা কিন্তু আত্মজ্ঞান নয়। কারণ সেখান থেকেও বিচ্যুত হতে হয়, পুনরাবর্তন হয়। প্রকৃতির অধীশ্বর হয়েও, হিরণ্যগর্ভ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েও, প্রজাপতিত্ব লাভ করেও মানুষ মুক্তি পেতে পারে না। এটিই আমাদের উপনিষদাদিতে বারংবার স্মরণ করিয়েছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রারম্ভে সেইজন্য ঋষি শুনিয়েছেন অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা। 'ঊষা বা অশ্বস্য' ইত্যাদি ক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা করেছেন। সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে যিনি সিদ্ধ হতে পারেন তিনি কী হন? প্রজাপতি হন। কিন্তু সেখানে দেখালেন, এই প্রজাপতি যিনি, এই সংবৎসররূপ যিনি, অখণ্ড কালচক্রের সঙ্গে একীভূত যিনি, সেই প্রজাপতিও মুক্তিলাভ করতে পারেন না। এখানেও তাই বলা হল ঃ

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।। ১৬।।

প্রজাপতির ঊর্ধ্বে আছেন যিনি কালাতীতস্বরূপ, তাঁকে পেতে হবে। সেইজন্য উপনিষদে বলেছেন 'আত্মা ইত্যেব উপাসীত'। এখানেও তাঁকেই ভগবান ইঙ্গিত করেছেন 'মামুপেত্য' বলে। উপনিষদেও তাই অভ্রান্ত নির্দেশ দিয়েছেন 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি'। এই আত্মাকে না জানলে কিছুতেই মুক্তি নেই, মৃত্যুতরণ সম্ভব নয়।

তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই আত্মস্বরূপকে চেনাবার জন্য প্রথম তাঁকে চেনালেন প্রজাপতিরূপে, সৃষ্টির অধিকর্তারূপে। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কী করে সৃষ্টির অধীশ্বর হয়ে আছেন, সেইভাবে তাঁকে জানতে হবে বটে। কিন্তু সৃষ্টির পারে যতক্ষণ আমি না যেতে পারছি, ততক্ষণ সেই বিশুদ্ধ স্বরূপে পৌঁছতে পারব না। সেইজন্য এখানেও, এই অষ্টম অধ্যায়ে, ভগবান এই কালচক্রের গতির পরিচয় দিয়ে চিনিয়েছেন যে কোন্ পথে গেলে মুক্তিলাভ করা যায়, আর কোন্ পথে পুনরায় আবর্তিত হতে হয়। যোগী এই দুটি গতিকেই চেনেন, আর সেইজন্যই শুক্লগতিকে আশ্রয় করেন। যেটা শুভ্রগতি, আলোর পথ, উত্তরায়ণ, যেটায়

মুক্তিলাভ হয়, সেই জ্যোতির্ময় পথ তিনি অবলম্বন করেন। যেটা কৃষ্ণগতি, অন্ধকারের পথ, দক্ষিণায়ন, যেটা মানুষকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনে সেই সংসারচক্রের মধ্যে, এই আবর্তনের মধ্যে, তার দিকে তিনি দৃষ্টি দেন না, তার থেকে দৃষ্টিকে তিনি প্রত্যাহৃত করেন। এজন্য ভগবান আবারও বললেন এই অষ্টম অধ্যায়ের শেষে ঃ

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন।। ২৭।।

তুমি যোগী হও, যোগী হবার চেষ্টা করো, তাহলেই কালচক্র থেকে মুক্তি পাবে। অর্থাৎ মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যোগটি রেখে চলো সর্বকালে, সর্বদা। সর্বকালে এই যোগ একমাত্র যুক্ততম যোগী অর্থাৎ ভক্তের পক্ষেই লাভ করা সম্ভব, কারণ তিনি 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি' এবং শ্রীভগবানের আদেশমতো 'মামনুস্মর যুধ্য চ' এই মহামন্ত্রটি সম্বল করে জীবনের পথে পাড়ি দিয়েছেন। তাই মরণের মুখেও, প্রয়াণকালেও তিনি 'নিয়তাত্মা' বলে তাঁরই ধ্যানে ডুবে থাকেন। এইভাবে ঃ

যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।। ৪।।

প্রয়াণের এই পরম রহস্য, উত্তর ও দক্ষিণ গতির ভেদরহস্য, সবই শ্রীভগবান উদ্‌ঘাটন করলেন এই অধ্যায়ে, যে-অধ্যায়টির তাই সার্থক নাম 'অক্ষরব্রহ্মযোগ'। আর সবই ক্ষরণশীল, বিনাশশীল, আবর্তনশীল, কেবল তিনিই শুধু অক্ষর, কালাতীত, নিরঞ্জন, 'ব্রহ্ম পরমম্', একমাত্র যাঁকে লাভ করলেই এই নশ্বর সংসারের পারে যাওয়া যায়। তাই নিজ মুখেই তাঁর পরম আশ্বাসময় এই উদাত্ত উদ্‌ঘোষণ ঃ

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।। ১৫।।

উপনিষদের ভাষায় 'অতো অন্যদ্ আর্তম্', এই আত্মস্বরূপ ছাড়া আর সবকিছুই আর্ত, পীড়িত, দুঃখে জর্জরিত। দুঃখের পারে যাবার তাই অন্য উপায় নেই, এই আত্মাকে জানা ছাড়া। সেই আত্মাকে, 'মাম্'কে আরও নিবিড়ভাবে জানবার জন্যই পরের অধ্যায়ের অবতারণা, যেখানে পরম রহস্য, পরম বিদ্যাটি তিনি অর্জুনকে দান করবেন, যা হল রাজবিদ্যা অর্থাৎ সকল বিদ্যার রাজা ও রাজগুহ্য অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা গহন গোপন রহস্যও বটে। আমরা উৎসুক হয়ে এখন তাঁর শ্রীমুখ থেকে সেইটি শুনব।

নবম অধ্যায়

রাজযোগ

এইবার রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য পরম রহস্য নবম অধ্যায়ে। রাজবিদ্যা রাজগুহ্য অর্থাৎ গুহ্যেরও যেটি রাজা, গুহ্যেরও যেটি গুহ্যতম কথা, বিদ্যারও যেটি রাজা মানে শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠ কথাটি ভগবান নবম অধ্যায়ে এসে শোনালেন। সেই পরম বিদ্যা, চরম রহস্যটি কী? আগের সপ্তম অধ্যায়ে তাঁর বিভূতির কিছু বর্ণনা দিয়েছেন এবং সবকিছু তার মধ্যে অনুস্যূত, সূত্রে মণিগণের মতো গাঁথা, একথাও জানিয়েছেন। তাহলে কি তিনি সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, কার্য-কারণ সম্পর্কে বাঁধা হয়ে আছেন? এরই উত্তরে দেখাচ্ছেন নবম অধ্যায়ে তাঁর সর্বাতিশায়ী রূপ, সর্বাতিক্রান্ত মহিমা, যেটি হল তাঁর স্বরূপের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রহস্য। সেই রহস্যই এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাই নবম অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হল যে সৃষ্টির মধ্যে থেকেও আমি রয়েছি সৃষ্টির অতীতে। এই রহস্যটি যদি তুমি ধরতে পারো যে সবকিছুর মধ্যে থেকেও আমি নেই, তা হলেই আমাকে স্বরূপত জানা হবে তোমার।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।। ৪।।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।। ৫।।

প্রারম্ভে এই ৪ ও ৫ শ্লোকেই এই রাজগুহ্য কথাটি তিনি শুনিয়েছেন যে, সমস্ত ভূত আমাতে আশ্রিত, অথচ আমাতে আশ্রিত নয়। বিভূতির মধ্যে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু তাতে জড়িয়ে নেই তিনি। এই যে তাঁর নির্লিপ্ত স্বরূপ, অলেপ স্বরূপ, 'উদাসীনবদাসীনমসক্তং', এই অসঙ্গ স্বরূপ, সেই অসঙ্গস্বরূপের মহারহস্যটি তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন এই নবম অধ্যায়ে এসে। এইটিই তাঁর ঐশ্বর যোগ বা অলৌকিক শক্তি বা সামর্থ্য। তাই একদিকে যেমন তাঁর স্বরূপের এই রহস্যটি, রাজগুহ্য রূপটি দেখিয়েছেন, তেমনি আর একদিকে সেই স্বরূপলাভের উপায়টিও, রাজবিদ্যাও শিখিয়েছেন, চিনিয়েছেন তাঁর ভজনের রহস্য। সেই রহস্যটি কী তা ১৩ শ্লোকে দেখিয়েছেন ঃ

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।। ১৩।।

ক্ষয়শীল এই ভূত-সৃষ্টির মূলে আমি, আর মূলে থেকেও আমি অক্ষয়, অব্যয়। সেই অক্ষয় অব্যয় রূপটিকে যিনি চেনেন, তিনি কীভাবে ভজনা করেন?

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।। ১৪।।

তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে ভজন করেন, সব সময় তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কীভাবে যুক্ত থাকেন? কীর্তনের দ্বারা, তাঁর ভজনের দ্বারা, নমস্কারের দ্বারা নিরন্তর যুক্ত থাকেন, যার বিশদ বর্ণনা করেছেন ভাগবতে ঃ

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্।।

এই নবধা ভক্তি। কিন্তু এইটিই যে ভগবদ্ ভজনের একমাত্র উপায় তা নয়। অনন্তরকম তাঁর ভজনের রূপ আছে ঃ

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।। ১৫।।

সুতরাং সবগুলিই হচ্ছে ভগবানের ভজন। যাঁরা মনে করেন যে ভক্তির পথ একরকম এবং জ্ঞানের পথ বুঝি তার থেকে একটা আলাদা পথ, তাঁরা যে কত বিভ্রান্ত তা এইসব শ্লোক থেকে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। ভগবান বলেছেন তাঁরাও আমাকে 'উপাসতে', উপাসনা করেন। কিসের দ্বারা? জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা উপাসনা করেন। এই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা উপাসনা, এইটি নবম অধ্যায়ে শেখালেন এবং ভক্তের উপাসনাও এরই পাশাপাশি দেখালেন। দুটি ধারাকে মিশিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তার সঙ্গে শোনালেন ঐ সপ্তম অধ্যায়ে যা বর্ণনা করেছিলেন সেই বিভূতির কথা আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে।

তিনি তাঁর এই পরম রহস্যের কথা উদ্‌ঘাটন করতে যেমন ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি কীভাবে ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে গেছে তাঁর আত্মপরিচয় সেটি বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিস। সপ্তম অধ্যায়ে তাঁর বিভূতির পরিচয় দিয়েছিলেন কীভাবে? আধার-আধেয়ভাবে, দ্রব্যগুণভাবে। জল যে রয়েছে, জলের মধ্যে রসরূপে আমি রয়েছি, শশী-সূর্য রয়েছে, তার মধ্যে প্রভারূপে আমি রয়েছি। কিন্তু এখানে ভগবান অভেদরূপে সেই বিভূতিকে দেখাচ্ছেন। এখানে যে বিভূতির বর্ণনা করেছেন তাতে আধার-আধেয় ভাব নেই, দ্রব্যের মধ্যে গুণরূপে তাঁকে খোঁজা নেই, সবটা জুড়েই তিনিই। এখানে ১৬ শ্লোক থেকে বর্ণনা ক'রে দেখালেন ঃ

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ স্বধাহমহমৌষধম্
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।। ১৬।।

এখানে সবকিছু স্বরূপের বা অহং-এর সঙ্গে একীভূত করে দেখাচ্ছেন। তুমি কার আশ্রয়ে যাবে? সবই তো আমি ঃ

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।। ১৮।।
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন।। ১৯।।

সৃষ্টি-লয়, অমৃত-মৃত্যু, যতকিছু দ্বন্দ্ব সব কিছুর মূল হলাম আমি। আমি ছাড়া বিশ্বচরাচরে কোথাও কিছু নেই। আগে যেমন একটা জিনিস রেখে তার মধ্যে আধারের মধ্যে আধেয়রূপে, গুণরূপে, সাররূপে নিজেকে দেখিয়েছিলেন, এখন ভালো-মন্দ সবকিছুর মধ্যে অভিন্নরূপে সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে তিনিই শুধু বিরাজিত, এইভাবে নিজেকে দেখালেন। এই যে সমগ্ররূপে সব জুড়ে নিজের অস্তিত্বের পরিচয়টুকু দিলেন, 'যাহা কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যপিয়া', এই অতি গুহ্য তত্ত্বের দরুণ এই অধ্যায়টি রাজগুহ্য, রাজবিদ্যা। এইরূপে ভগবানকে যাঁরা জানেন, তারাই তাঁকে তত্ত্বত জানেন, অন্যথা তত্ত্বত না জানার ফলে ঘটে বিচ্যুতি বা স্খলন।

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।। ২৪।।

২৪ শ্লোকে এইভাবে জানালেন যে যাঁরা তাঁকে তত্ত্বত জানেন, তাঁরা কোনোদিন চ্যুত হন না। আরও বললেন ঃ 'আমাকে পাওয়া, আমাকে ভজনা করা অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত সুলভ।' তার জন্য কী করতে হয়?

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। ২৬।।

ভক্তি করে তুমি যাই দাও, ফল-জল, পত্র-পুষ্প, ভক্তিমাখা সেই উপহার আমি সানন্দে গ্রহণ করি, উপভোগ করি। সেই সঙ্গে আর একটি কাজ শুধু তুমি করো ঃ

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।। ২৭।।

তোমার খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা স্বাভাবিক কর্মই বলো, আর তোমার

নিয়ন্ত্রিত বিধিবোধিত যজ্ঞ বা তপস্যাদি কর্মই বলো, সবই আমাকে অর্পণ করো। এই দুরকম কর্মেরই উল্লেখ এখানে আছে।

আহারাদি কর্ম হল স্বাভাবিক কর্ম, প্রকৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম, আমাদের সকলকেই করতে হয়। আবার বিধিবোধিত কর্মও আছে। কখনো তপস্যা করছি, কখনো আহুতি দিচ্ছি, কখনো বা যজ্ঞ করছি। ভগবান বলছেন যেরকম কর্মই করো, সব কর্মই তুমি আমাকে অর্পণ করে দাও। এইভাবে আমাকে অর্পণ করলেই কী হবে? এই কর্মসূত্রের দ্বারা নিরন্তর আমার সঙ্গে তোমার সংযোগ, সর্বদা সম্বন্ধ বজায় থাকবে, কোনোদিন কোনো সময়েই সে-সংযোগ ছিন্ন হবে না। সাধনার দিক দিয়ে এইটিই নবম অধ্যায়ের রাজগুহ্য কথা।

একদিকে সাধ্য বা লক্ষ্য বা স্বরূপের দৃষ্টি দিয়ে তাঁর যে পরম রহস্য, গুহ্যতম তত্ত্ব, অর্থাৎ বিশ্বের মধ্যে থেকেও তিনি কেমন করে বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন, সেই 'ঐশ্বরং যোগং', অসাধারণ শক্তি বা মহিমা এটি যেমন চিনিয়েছেন এই অধ্যায়ে, তেমনি সাধনের দৃষ্টিতে তাঁকে পাওয়ার সুলভতম উপায় যেটি, সেটিও চিনিয়ে দিয়েছেন। সব কর্ম যদি আমাকে অর্পণ করতে পারো, সব কর্মের দ্বারা সব সময়ে যদি আমার সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে পারো, তাহলে আমাকে পাবেই। তাই চরম মন্ত্রটি আবার অধ্যায়ের শেষে শুনিয়েছেন ঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। ৩৪।।

আরম্ভ করতে হয় শেষ থেকে। 'মাং নমস্কুরু', এই নমস্কার থেকে শুরু করো। দুটি হাত জোড় করে প্রণতি জানাতে পারলেই, এই সামান্য নমস্কার থেকেই হবে 'মদ্‌যাজী', যজনা আরম্ভ হয়ে যাবে। যজনা হতে হতে ভজনা আরম্ভ হবে, মানে 'মদ্ভক্ত' হবে। মদ্ভক্ত হলেই 'মন্মনা', মনটি ভরে তখন শুধু তিনিই, চিত্ত তখন হবে চিতি বা চৈতন্যময়, এবং মন্মনা হলেই 'মামেবৈষ্যসি'। এমনি পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ এই সহজ সাধনমালা, স্বয়ং শ্রীভগবানের দ্বারা নির্দিষ্ট। তাই আশ্বাস দিয়ে শেষে বলছেন ঃ "তখন তুমি আমাকে পাবেই পাবে, কারণ আমাতে তোমার মন তখন অর্পিত হয়ে যাবে।" তাঁর জন্য যদি দুটি হাত জোড় করে শুধু প্রণাম করতে শিখি, সেই প্রণতির দ্বারাই হবে তাঁর সঙ্গে আমার সংযোগ স্থাপন।

এইজন্য হিন্দুদের প্রত্যেকটি কাজের আগে ভগবানকে স্মরণ করবার বিধান রয়েছে, যদিও আমরা হয়তো যান্ত্রিকভাবে করে যাই তাঁর স্মরণবন্দন। ব্যবসায়ী যে, সে ব্যবসা করতে বসেও 'শ্রীগণেশায় নমঃ' বা 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' লিখে তবে তার হিসাবের খাতাটি লিখতে আরম্ভ করে। একখানি চিঠি লিখতে গেলেও

আমরা 'শ্রীগুরবে নমঃ' বা 'শ্রীশ্রীকালী সহায়' লিখে চিঠি আরম্ভ করি। আহার করতে বসেও, আহারের সময় আচমন করে, বিষ্ণুকে অর্পণ করে, তবে আহার করি, নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করি। এমনি প্রত্যেক কর্মে তাঁকে স্মরণ, তাঁরই বন্দন, এইটি যদি অভ্যাস করতে থাকি, তাহলে সর্বদা তাঁর সঙ্গে আমার সংযোগ বজায় থাকবে এবং শেষে তাঁকে আমি পেয়ে যাব পূর্ণরূপেই। অর্থাৎ তাঁর অনন্ত 'বিভূতি' বা বিস্তারের মধ্যে যে তিনিই সব জুড়ে বিরাজিত, আর তাঁর 'যোগ' বা অলৌকিক সামর্থ্যে, শক্তিতে তিনি যে সেসব ছাপিয়ে বা ছাড়িয়ে তার ঊর্ধ্বেও বিরাজিত, তা-ও জানতে পারব। এই দুইভাবে জানলেই যে তাঁর সঙ্গে অবিকম্প যোগে যুক্ত হওয়া যায়, সেই কথাই শোনাবেন পরের দশম অধ্যায়ে।

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান যে রাজবিদ্যাটি শেখালেন তাতে তাঁর সঙ্গে নিরন্তর সংযোগের পথ প্রশস্ত করলেন। এই সংযোগ বজায় থাকলে কী হবে? সমস্ত বিশ্বচরাচরে যে তিনি ওতপ্রোত সেইটি উপলব্ধি করা হবে। তারই কথা এবার দশম অধ্যায়ে তিনি বলছেন আর এইভাবে ক্রমশ বিশ্বরূপের দিকে অর্জুনকে এগিয়ে নিয়ে চলছেন। এখন বলছেন ঃ "তুমি আরও শোনো, আরও শোনো"! ভগবান নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করেছেন কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা না করে, প্রিয় শিষ্যের হিতকামনায় ঃ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।। ১।।

ভগবান যেন বলছেন ঃ "আমাকে তো কেউ চেনে না। আমি যদি আমার পরিচয় না দিই তাহলে কেউ তো আমাকে ধরতে পারবে না, তাই দুটি জিনিস তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। একটি আমার 'বিভূতি' আর একটি আমার 'যোগ'। নিজেকে আমি ছড়িয়ে দিয়েছি বিশ্বের মধ্যে যেভাবে, সেটিই হল আমার 'বিভূতি'। আর যে কেন্দ্র থেকে নিজেকে বিচ্ছুরিত করছি সেইটি হল আমার অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য, এইটির নাম হল 'যোগ'।" এই যোগ তাঁর অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য, নিজে এক থেকেও নিজেকে বিচিত্ররূপে বিলসিত করছেন, অনন্তরূপে প্রকাশিত করছেন। সেই সাজঘরে যদি একবার আমি ঢুকতে পারি, তাহলে কেমন করে তিনি নিজেকে নানা রূপে নানা রঙে নানা ঢঙে প্রকাশ করছেন তা দেখতে পাই সেখান থেকে।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৭।।

সেই যে গানের মধ্যে আছে—

যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড পুনঃ পেলে ধরে এঁটে
আমি তেমনিধারা ধরতে চাই মা!
(কিন্তু) কর্মদোষে যায় মা ছুটে।

সেই অবিকম্প যোগ আমার কবে হবে? অবিকম্প যোগ তখনই হবে যখন তাঁর সঙ্গে আমার যোগসূত্র কোনদিন ছিন্ন হবে না। এই নিরন্তর যোগসূত্র স্থাপিত হবে তখনই যখন আমি তাঁর বিভূতিকে চিনব আর যোগকে চিনব, তত্ত্বত জানব বা বুঝব। ৮ শ্লোকে বলছেন ঃ

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।। ৮।।

ভজনের রীতিটি লক্ষ্য করবার মতো। 'ইতি মত্বা', এইরূপে জেনে, জ্ঞানলাভ করে তবে ভজন হয়। সে-জ্ঞানের স্বরূপটি কী? 'অহং সর্বস্য প্রভবো', বিশ্বে যা-কিছু বিকশিত হচ্ছে, প্রসূত হচ্ছে, প্রকাশ পাচ্ছে, তার মূলে হলেন তিনি। এই মূলের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে, 'প্রভব' বা উদ্ভবস্থল বা sourceকে চিনতে হবে। তবে বুঝব 'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে', যা কিছু প্রবর্তিত হচ্ছে, বিশ্বের মধ্যে যা-কিছু বেরিয়ে আসছে, যা-কিছু প্রকাশ হতে দেখছি, সব প্রকাশের মূলে তিনি। এইজন্যই তাঁকে এইভাবে যাঁরা বোঝেন, জানেন, সেই ভক্তেরা—

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।। ৯।।

অন্য কোনো কথালাপে আর তাঁদের আনন্দ থাকে না, দিনরাত শুধু তাঁরই কথা, তাঁরই লীলাকীর্তনে তাঁরা মগ্ন থাকেন। এইভাবে তাঁতে মগ্ন থেকে, বিভোর থেকে তাঁরা আর সব ভুলে যান। কিন্তু তাতে লাভ কী হল? জগতের রহস্য তো কিছুই জানা হল না, ব্রহ্মস্বরূপ চিনবেন কী করে?

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।। ১০।।

এইখানে চাবিকাঠিটি ভগবান ধরিয়ে দিয়েছেন দশম অধ্যায়ে। তাঁকে পাবার এছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় পন্থা নেই। তিনি যদি আমার বুদ্ধিযোগটি না এনে দেন, তাহলে তাঁকে জানা সম্ভব হয় না। কেননা, আমার বুদ্ধির মধ্যেই তিনি উদ্ভাসিত হবেন, প্রকাশিত হবেন, তাঁকে তো বাইরে কোথাও লাভ করতে যেতে হবে না। পেতে হবে হৃদয়ে, নিজের বুদ্ধির মধ্যে। কিন্তু হৃদয়ে, বুদ্ধিতে সেই যোগটি করতে পারছি না তাঁর সঙ্গে। করতে পারছি না বলেই তাঁকে পারছি না উপলব্ধি করতে। কিন্তু সেই যোগটি তিনিই তখন ঘটিয়ে দেন। কীভাবে ঘটিয়ে দেন? বলছেন ঃ

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।। ১১।।

আত্মভাবস্থ তিনি হন। 'আত্মভাবস্থ' মানে, তাঁর আত্মা বা স্বরূপের ভাবে ভাবিত বা অবস্থিত। অর্থাৎ আমার চিত্ত এখন যেমন বিষয়ের ভাবে ভাবিত হয়ে

আছে, তখন আমার সেই বুদ্ধি ব্রহ্মাকারা বৃত্তি লাভ করে, ভগবদাকারা বৃত্তি লাভ করে, তদ্‌ভাবভাবিত হয়। আমার সমস্ত চিত্ত, সমস্ত মন-বুদ্ধি-প্রাণ সবকিছুকে আক্রান্ত করে, পরিব্যাপ্ত করে বিরাজিত থাকেন শুধু সেই পরম চৈতন্যস্বরূপ। ভূতাবেশের মতো তখন তাঁর আবেশ ঘটে, তিনি যেন এসে ভর করেন আমার চিত্তে, তখন সেই পরমাত্মা এসে আমার বুদ্ধিকে আশ্রয় করেন। এই বুদ্ধিযোগ তিনি ঘটিয়ে দেন বলেই তাঁকে জানা সম্ভব হয়। তাঁকে জানবার এই কৌশলটি তিনি শুধু তাকেই দেন যে সতত তাঁর সঙ্গে যোগ রেখেছে। এই সতত যোগ রাখতে রাখতে হঠাৎ যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে হৃদয়ের কেন্দ্রস্থল, এবং তার ফলে যিনি সেই 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং' তাঁকে যেন আমরা জেনে ফেলি। সেই হৃদয়ের প্রদীপ তখন হঠাৎ জ্বলে ওঠে, 'তদোকো অগ্রজ্বলনম্',* শিখার অগ্রভাগে কে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়, এবং সেই প্রদীপের আলোয় তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করতে হলে তার সঙ্গে সব সময় যোগসূত্রটি বজায় রাখতে হবে। যোগসূত্রটি বজায় রাখতে রাখতে ঐ যে মূল কেন্দ্র যেখানে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনের সঙ্গে আমার হৃদয়দীপের শিখার কখন যেন যোগ হয়ে যায়। তখনই আমার প্রাণের প্রদীপ জ্বলে ওঠে। তাই অবিকম্প যোগে যদি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই শিখা এসে আমার হৃদয়ের মধ্যে যে প্রদীপ তাকে উদ্ভাসিত করে দেয়। কম্পিত হলে আগুন ধরে না, আলো জ্বলে না।

ইষ্টকে, আরাধ্যকে আজ স্বরূপে চিনেছেন বলে অর্জুন এখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে স্তুতি করলেন ভগবানের। স্তুতি করবার পর, সবকিছুর মধ্যে কোথায় কোথায় তিনি শ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন, সেই শ্রেষ্ঠের মধ্যে, জ্যেষ্ঠের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে তিনি কেমন করে খুঁজবেন তার নির্দেশ চাইলেন। উত্তরে ভগবান বললেন ঃ "তুমি খুঁজতে চাও আমাকে? পেতে চাও আমাকে? প্রথমে, যেখানে যেখানে উৎকর্ষ দেখবে, জানবে সেখানেই আমি আছি।" কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে এইভাবে চিনিয়ে শেষে বলছেন ঃ "তোমায় কতই বা আমি বলব? যেখানে বিশিষ্ট, ঊর্জিত, শ্রীমণ্ডিত যা যা দেখবে, সেখানেই আমার তেজের অংশ থেকে তা উদ্ভূত বলে জানবে।" সেই মূল কথাটি শুনিয়ে দিয়েছেন উপসংহারে ঃ

যদ্ যদ্ বিভুতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্।। ৪১।।

* ব্রহ্মসূত্র—৪/২/১৬

সাধারণত আমাদের সকলেরই অনুযোগ, ভগবানকে আমরা দেখতে পাই না, কোথায় তাঁর প্রকাশ? অথচ সর্বত্রই ভগবান নিজেকে প্রকাশ করে রেখেছেন। কিসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছেন? এই বিভূতির মধ্য দিয়ে। তাই ভগবান বললেন ঃ "যেখানেই বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ, ঊর্জিত ভাব দেখতে পাবে, উন্নত ভাব দেখতে পাবে, সেইখানেই আমি প্রকাশিত হয়েছি জানবে।"

এইজন্য হিন্দু সূর্যকে উপাসনা করেছে, এইজন্য হিন্দু অগ্নিকে উপাসনা করেছে। কেন উপাসনা করেছে? তারা যে শুধু জড়বুদ্ধি নিয়ে উপাসনা করেছে তা নয়, কোনো animism fetishism-এর ভাব নিয়ে তারা উপাসনা করেনি। তাদের যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি ছিল। বাইরের চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র দেখে ভয়ে বিহ্বল বা হতচকিত হয়ে গিয়ে তারা তাদের উপাসনা করেছে, এ কথা ঠিক নয়। এ দৃষ্টি নিয়ে তারা উপাসনা করেননি। চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রের মধ্যে তারা দেখেছে সেই পরম স্বরূপের প্রকাশ। সেই পরম স্বরূপকে, তাঁর জ্যোতিকে তাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হতে দেখেছে। সেইজন্যে বুঝেছে 'জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্' অথবা 'নক্ষত্রাণাং অহম্ শশী'। অনন্ত গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে দীপ্যমান তিনি হলেন রবি-শশীরূপে বিরাজিত। যেখানে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট দেখছি, সেই শ্রেষ্ঠের মধ্যে তাঁরই প্রকাশ দেখছি। এইরূপে যদি তাঁর বন্দনা করতে পারি, তাহলেই তাঁর উপাসনা হয়, তাহলেই আমার তাঁকে লাভ করা হয়ে যায়। সুতরাং শ্রেষ্ঠকে, উৎকৃষ্টকে যদি আমি চিনতে শিখি, বরণ করতে শিখি, বন্দনা করতে শিখি, তাহলেই অধ্যাত্মপথে পদক্ষেপ করা সার্থক হয়ে ওঠে।

আবার মূলে ফিরে গেলাম দ্বিতীয় অধ্যায়ে, সেই যে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন অর্জুন 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে', সেই জিজ্ঞাসার উত্তর মিলল এইখানে। এই শ্রেয় বুদ্ধি তখনই জাগে মানুষের যখন সে শ্রেষ্ঠকে চেনে। নইলে সাধারণত প্রেয় বুদ্ধি নিয়ে আমরা চলি, যা আমাদের কাছে রম্য, সুন্দর, আপাত মনোরম সেই তাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ মনে করি। কিন্তু শ্রেয় বুদ্ধি যখন জাগে, যখন উৎকর্ষ বুদ্ধি আসে, যখন শ্রেষ্ঠকে আমরা চিনতে শিখি, বরণ করি এবং তাঁর চরণতলে নিজেকে লুটিয়ে দিতে শিখি তখনই যথার্থ ভগবানের উপাসনা আরম্ভ হয়।

এইজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত এই তত্ত্বটিকে বিশদ করেছেন। বলেছেন, 'মহাপুরুষং অভ্যর্চ্য', এই মহাপুরুষকে অভ্যর্চনা করেই তুমি ভগবৎ সান্নিধ্যে যেতে পারো। নারদভক্তিসূত্রে বলেছেন, ভক্তি লাভ হয় কিসের দ্বারা? ভগবানের কৃপা থেকেও লাভ হয়, আর 'মুখ্যতস্তু মহৎ-কৃপয়ৈব—ভগবৎ-কৃপালেশাদ্ বা', এই মহৎ-কৃপা

থেকেই সেটা লাভ হতে পারে। তাই নারদভক্তিসূত্র বলছেন, নারদ যেন সবাইকে ডাকছেন ঃ 'তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্', শুধু তাই সাধো, তাই সাধো, সেইটিই শুধু সাধবার জিনিস, এই মহাপুরুষের সঙ্গ, এই শ্রেষ্ঠের সৎপুরুষের সঙ্গ । তাঁরই আশ্রয় নাও। তাঁরই আশ্রয়ে যদি থাকতে পারো, নিরন্তর সৎকথার মধ্যে, সৎশাস্ত্রের সঙ্গে, সৎপুরুষের সঙ্গে যদি সঙ্গ বা যোগ রাখতে পারো, তাহলেই তোমার ভগবৎসঙ্গের ফল হবে।

এইজন্য ভাগবত শব্দটিরও দুটি অর্থ। ভাগবত মানে ভগবান সম্বন্ধীয় কথা। 'ভাগবত পুরাণ' একটি আছে ভগবান সম্বন্ধীয় বলে। তেমনি ভগবানের যাঁরা জন তাঁরাই হলেন ভাগবত জন। সেই ভাগবত জনের সান্নিধ্য, সেই ভাগবত শাস্ত্রের সান্নিধ্য, ভগবানের কথার সান্নিধ্য, ভগবানকে যাঁরা লাভ করেছেন সেই ভাগবত পুরুষের সান্নিধ্য, এইসব সান্নিধ্যের দ্বারাই, এই বিভূতির মাধ্যমেই আমরা সেই মুখ্যস্বরূপে ভগবানে একদিন গিয়ে পৌঁছতে পারব। সেখানে যখন পৌঁছব, একাদশ অধ্যায়ে উপনীত হব যখন, তখন দেখব বিশ্বচরাচরে সমস্ত ব্যাপ্ত করে অগ্নির লেলিহান শিখা যেমন সবকিছুকে গ্রাস করে তেমনি সমস্ত জগৎ দেদীপ্যমান তাঁরই কালরূপ অগ্নিশিখায়। সুতরাং চরাচরে কোথাও এমন ঠাঁই নেই, এমন জায়গা নেই যেখানে তিনি নেই। এই বিশ্বরূপের দিকে ভগবান এখন অর্জুনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বিভূতিরূপ থেকে এখন বিশ্বরূপের দিকে যাত্রা।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শনযোগ

শ্রীভগবান অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে ক্রমশ সাধককে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। প্রথম মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলাম আমরা। এখন অঙ্গন থেকে গর্ভগৃহে পৌঁছেছি। এখন দেবতা-দর্শন, বিগ্রহ-দর্শনের সময় এসেছে। এই একাদশ অধ্যায় সেইজন্য হল দর্শনের অধ্যায়। এখন সাক্ষাৎ সম্মুখস্থ হয়ে আমরা দেবতাকে দর্শন করছি। এইজন্য অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন প্রার্থনা করলেন ঃ

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।। ৩।।

এতক্ষণ তিনি শুনে আসছিলেন, এখন দেখার লগ্ন এসেছে। তাই তিনি দর্শনের জন্য প্রার্থনা জানালেন। সেই দর্শনের প্রার্থনা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের কাছ থেকেও অনুমোদন পাওয়া গেল। কেননা, তিনি যদি দেখা না দেন তাহলে মানুষ বা সাধক তাঁকে দেখতে বা ধরতে পারে না। তাই অর্জুনকে তিনি বললেন ঃ

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।। ৮।।

আমি তোমায় দিব্য দর্শন, দিব্য নয়ন দিচ্ছি, তার দ্বারা তুমি দেখো। কী দেখবে? না—

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।। ৭।।

নিখিল জগৎকে তুমি দর্শন করো একত্র, বহুকে একের মধ্যে অবস্থিত রূপে। এই বলে তিনি অর্জুনের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন।

এখন সম্মুখে বিগ্রহ, দেবতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, দেখবার লালসা জেগেছে এবং দেবতা অনুগ্রহ করে দর্শন দিচ্ছেন। সেইজন্য অর্জুন তাঁর সেই যে প্রসিদ্ধ স্তবটি আরম্ভ করেছেন, তার প্রথম কথাটিই হল 'পশ্যামি', দেখছি। 'পশ্যামি' দেবাংস্তব দেব দেহে' (১৫), তোমার দেহের মধ্যে আজ আমি দেখছি। এই যে 'পশ্যামি', দেখছি, এই কথাটি এক অভিনব অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, এবং সেই কথাটিই তাই সর্বপ্রথম তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে স্তোত্রের প্রারম্ভেই। কিন্তু

তিনি কী দেখলেন? সেই দেখার বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে।

একটি স্তুতির মধ্যে যে-রূপের বর্ণনা অর্জুন দিলেন বিহ্বল হয়ে, ভাবে গদগদ হয়ে, তার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে তিনি ভেবেছিলেন একটা খুব সুন্দর জিনিস হয়তো দেখব এবং সেইজন্যই তিনি ভগবানের রূপ-দর্শনের জন্য বিশেষ আকাঙ্খা জানিয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন, তখন প্রথম থেকেই বলা আরম্ভ হয়েছে—'দুর্নিরীক্ষ্যং', সে-রূপের দিকে তাকানো যায় না, অসহ্য তার আলো। তা 'দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্,' দীপ্ত অনল বা অর্কের মতো দ্যুতি বা দীপ্তিসম্পন্ন। যেন সহস্র অগ্নি একসঙ্গে জ্বলছে, সহস্র সূর্য যেন আকাশে দেদীপ্যমান। বার বার সেইজন্য বলছেন, এ যে 'রূপমুগ্রম্', এ তো স্নিগ্ধ সৌম্য রূপ নয়, এ যে উগ্ররূপ। সেই উগ্ররূপ দেখে বলছেন ঃ

বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে।। ২২।।

এই রূপের দিকে তাকিয়ে সকলেই বিস্মিত হতচকিত এবং শুধু বিস্মিতই নয়, 'লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ', প্রকৃষ্টরূপে ব্যথিত। কেন?

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।। ২৫।।

যেন দংষ্ট্রাকরাল মুখগুলি ব্যাদান করে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। কাল-অনল, কালের আগুন যেন জ্বলছে, তার মধ্যে সবকিছু দগ্ধ হচ্ছে। তাই তিনি বার বার কাতরে প্রার্থনা করছেন ঃ 'প্রসীদ-দেবেশ জগন্নিবাস', তাঁর প্রসন্নতা ভিক্ষা করছেন।

স্তোত্রে এইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই বর্ণনায় ক্রমেই যেন দীপ্তি অসহনীয় হয়ে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে তার শিখা চারদিকে, আর পতঙ্গের মতো সবকিছু তাতে ঝাঁপ দিচ্ছে, পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। অর্জুন তাই দেখে ক্রমেই ভয়ে বিস্ময়ে হতচকিত, অন্তরাত্মা তাঁর প্রব্যথিত, ধৈর্য ও শান্তি তাঁর অবলুপ্ত। বুঝতে পারছেন না এ রূপের তাৎপর্য কী। উপসংহারে তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা করছেন ঃ 'আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো' (৩১)।

এইটি তাঁর আকুল জিজ্ঞাসা ঃ কে তুমি? আমাদেরও জিজ্ঞাসা, অর্জুন কী দেখলেন? এতদিন উদগ্র লালসা নিয়ে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে এসেছিলাম। গর্ভগৃহ থেকে এখন মুখোমুখি দেবতার সামনে, বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এ কী দেখলাম? কে তুমি? তুমি 'প্রসীদ', প্রসন্ন হয়ে বলো।

এইজন্য সাধক প্রথমে যে দর্শন পায় সে কার দর্শন? দর্শনেরও নানারকম ভূমি আছে, স্তর আছে। দর্শনের লগ্ন যখন আসে, মনে রাখতে হবে, তখনই মানুষ যথার্থ প্রবুদ্ধ হয় বলা চলে। তার আগে পর্যন্ত সে যেন ঘুমন্ত, নিদ্রিত। যেমন, যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি, চোখ বুজে থাকি, কিছু দেখি না, ঠিক তেমনি অজ্ঞানের মধ্যে জড়তার মধ্যে যখন আমরা আচ্ছন্ন হয়ে থাকি, সেইটি হল আমাদের মৃত্যু, তখন আমাদের সত্যিকারের সচেতনতাই নেই, তখন আমরা অচেতন। যখন সচেতন হলাম, চোখ মেললাম, তখন কী দেখলাম? এতক্ষণ ভগবানের মুখ থেকে শুধু শুনছিলাম যজ্ঞ, যোগ, বিভূতি বা তাঁর প্রকাশের কথা। এই প্রথম দর্শনের ভূমিতে আমরা দাঁড়িয়েছি। এইতো হল প্রকৃত সচেতনতার ভূমি। এইজন্য আগম বা তন্ত্রের ভাষায় একেই বলা হয় কুণ্ডলিনীর জাগরণ। একটি পারিভাষিক শব্দমাত্র, আমরা শুনে রাখি, কিন্তু তার তাৎপর্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি না। এটা একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিস নয়। যে-জীবন এখন আমরা যাপন করছি, মৃত্যুর লক্ষণ তার মধ্যে সুপরিস্ফুট। কেন মৃত্যুর লক্ষণ পরিস্ফুট? কারণ চারিদিকে অগ্নির তাণ্ডবলীলা চলছে, অথচ আমরা নির্বিকার, সে বিষয়ে কোনো বোধই আমাদের নেই ঃ

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।। ৩০।।

এই লেলিহান শিখা সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সবকিছুকে দগ্ধ করছে তার তাপ। কিন্তু পাথর যেন নিষ্প্রাণ ; সে যেমন অগ্নির তাপ বোঝে না। তেমনি আমরাও এ অগ্নির তাপ উপলব্ধি করি না। অর্জুন সেটাকে দেখতে পেলেন এই প্রথম। তাই তিনি যখন জানতে চাইলেন তুমি কে, এ কাকে আমি দেখতে পাচ্ছি? তখন ভগবান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ঃ

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।। ৩২।।

এই কালরূপের দর্শন, এইটি হল যোগের প্রথম দর্শন। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও বলা হয়েছে যে যোগী এইটিই উপলব্ধি করেন। একেই সেখানে নাম দেওয়া হয়েছে 'বিবেকজং জ্ঞানম্'—'ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্'—(বিভূতিপাদ ৫২)। ক্ষণের ক্রমেতে যিনি সংযত হতে পারেন, সমাধিস্থ হতে পারেন, তাঁরই বিবেকজ জ্ঞান জন্মায়। তিনি দেখেন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বিশ্ব

পরিণত হচ্ছে। বিশ্বের মধ্য দিয়ে এক পরিণামের ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে। আমার রক্তের মধ্যে, ধমনীতে ধমনীতে, শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে অগ্নিস্রোত, ক্ষণে ক্ষণে আমি বদলে যাচ্ছি, রূপান্তরিত হচ্ছি, অথচ মনে করছি আমি যা ছিলাম তাই আছি। শুধু আমারই নয়, এই বাড়ি, এই ঘরদুয়ার, বিশ্বের সবকিছুরই রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই রূপান্তরটা আমরা বুঝব আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে বা একশো বছর পরে যখন সবকিছু জরাজীর্ণ হয়ে যাবে, সবকিছু ভেঙ্গে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে।

মনে পড়ে জনসন-এর প্রসঙ্গে মনীষী কার্লাইল-এর কথা। জনসন এক জায়গায় লিখেছিলেন ঃ অনেকে বলে ভূত-প্রেত আছে, কিন্তু ভূত-প্রেত একটা কুসংস্কার, মূর্খের কল্পনা, মূঢ়তামাত্র। ওসব কিছু নেই। কেননা সারারাত আমি এক কবরখানায় কাটিয়েছি, কোনো ভূত-প্রেতের সাড়াশব্দও পাইনি। আমরা যারা commonsense-এর জগতের লোক, matter of fact দুনিয়ার লোক, প্রখর বাস্তববুদ্ধির লোক, তারা বলে থাকি ওসব আজগুবি ব্যাপার, মূঢ় লোকেরাই শুধু বিশ্বাস করে ভূত-প্রেত। কার্লাইল তার সমালোচনা করে বলেছেন, হায় বোকা জনসন! তিনি কিনা বিলাতের সেই ঠাণ্ডায় সারারাত কবরখানায় কাটাতে গেলেন শুধু ভূত নেই এইটুকু প্রমাণ করবার জন্য।

এখানে আমাদের যেমন চৌরঙ্গী, বিলেতে তেমন পিক্যাডিলী। আলো ঝলমল সন্ধ্যায় দলে দলে লোক বেরিয়েছে বেড়াতে। জনসনও তো বেড়ান। কার্লাইল বলছেন, সেখানে তাঁর আশেপাশে যে অসংখ্য ভূত-প্রেত ঘুরছিল, তা কি তিনি দেখতে পেলেন না? ভূত-প্রেত কাকে বলে? যার সত্তা ছায়াময়, মায়াময়, বাস্তব সত্তা যার নেই, আজ আছে কাল যে নেই। যেকোনো সন্ধ্যায় পিক্যাডিলীতে যারা সমবেত হয়েছে তাদের মধ্যে এক বছরের যদি একটি শিশুও থাকে, সেই শিশু থেকে আরম্ভ করে বাকি সকলেরই একশো বছর পরে কোথাও আর কোনো চিহ্নও থাকবে না। এই যে কালের স্রোতের মধ্যে সব বিপরিণত হচ্ছে, এই আছে এই নেই, সবকিছু অবাস্তব, ছায়াবাজি, এই তত্ত্বটি অধিগত করবার জন্য, ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব বাতিল করবার জন্য গোরস্থানে যাবার দরকার হয় না। সবটাই ভূতের কারবার, ক্ষণিকের চপলা চমকের মতো অস্থির, ক্ষণস্থায়ী।

দরকার শুধু জেগে ওঠা, ঘুম ভাঙা, সচেতন হওয়া। 'বুদ্ধ' মানে জাগ্রত, ঘুম যখন ভাঙল, তখন সিদ্ধার্থ, গৌতম হ'লেন বুদ্ধ। জেগে কী দেখলেন? বুদ্ধদেবের তাই একটিমাত্র বৃদ্ধকে দেখে, মাত্র একটি মৃতদেহকে দেখে এই পরম উপলব্ধি জেগে গিয়েছিল। মানুষ যখন জাগে তখন সে দেখতে পায়, উপলব্ধি করে, কী

দুর্নিবার বেগে অবিরাম এই কালের ধারা বয়ে চলেছে। সবই 'আধাবতি কালতন্ত্রম্', ধেয়ে চলেছে কালের অধীন হয়ে। সেইজন্য বুদ্ধদেবের উপলব্ধি হল 'সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং শূন্যং শূন্যম্'। এই হল ক্ষণিকত্বের অনুভব, বিশ্বে সবকিছুই যে স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, খড়ের কুটোর মতো ভেসে চলেছে তার অনুভব। অথচ আমি মনে করছি সবকিছুই এক জায়গায় স্থিতিশীল, যেন আমি বাসা বেঁধেছি এখানে কায়েম হয়ে, মনে করছি সবই বুঝি চিরস্থির এ জগতে। কিন্তু তা তো নয়। এ যে নিরন্তর প্রতিক্ষণে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং সেই রূপান্তরিত করছে তাকে কাল। 'চির স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে!'

এই হল তাঁর বিশ্বরূপ। বিশ্বের মধ্যে তিনি অনুস্যূত হয়ে আছেন, বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছেন এই কালরূপে। এই অনুভব আমার তখনই হবে, তাঁর সেই স্পন্দন অনুভব করতে আমি তখনই পারব, যখন তাঁর সঙ্গে আমি তন্ময় হতে পারব। উপনিষদ তাই বলেছেন ঃ 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'—(কঠ উপনিষদ, ২। ৩। ২), জগতে যা কিছু দেখছ, জানবে এ প্রাণই কম্পিত হচ্ছে, নিঃসৃত হচ্ছে। এই যে প্রাণের কম্পন, জীবনের স্পন্দন তা কখন আমরা অনুভব করি? যখন আমরা জেগে উঠি, সুপ্তির ঘোর থেকে মুক্ত হই। তার আগে আমরা সবাই সুপ্ত বা মৃতপ্রায়।

সেই জাগরণ বা উপলব্ধির একমাত্র কারণ ভগবান। এই অধ্যায়ের শেষে নির্দেশ করেছেন, বলেছেন কিসের দ্বারা লাভ হয় এই দর্শন বা উপলব্ধি।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।। ৫৩।।

দান, যজ্ঞ, তপস্যা, কোনো অনুষ্ঠানের আচরণের দ্বারা পাওয়া যায় না এই উপলব্ধিকে। এই উপলব্ধিকে পাওয়া যায় কিসের দ্বারা?

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।। ৫৪।।

শুধু অনন্যা ভক্তি হলেই তাঁর উপলব্ধি সম্ভব।

আমরা মনে করি ভক্তি একটা emotion বা ভাবাবেগ মাত্র। একেই আমরা ভক্তি বলে মনে করি। কিন্তু ভক্তি মানেই হচ্ছে তাঁর সঙ্গে চরম তন্ময়তা, 'মদ্‌গত অন্তরাত্মা' হয়ে যুক্ততম অবস্থা। এই পরম ও চরম তন্ময়তার ফলেই, অর্থাৎ এই স্রোতের মধ্যে যখন আমি নামতে পারি, তখনই এই প্রতিক্ষণে পরিণামের উপলব্ধি হয়, বিশ্বরূপের, কালরূপের দর্শন হয়। এখন স্রোত থেকে দূরে আলগা হয়ে তটের উপর দাঁড়িয়ে আছি, সেইজন্য স্রোতের বিপুল বেগকে আমি কিছুই উপলব্ধি করতে পারছি না। যখন স্রোতে নামলাম, তখনই আমি উপলব্ধি

করলাম, স্রোতের সঙ্গে তন্ময় হলাম, স্রোতের সঙ্গে মিশে গেলাম। এইজন্য দেখতে হবে যে বিশ্বচরাচর জুড়ে তিনি রয়েছেন। কীভাবে রয়েছেন? না, সমস্ত বিশ্বকে তিনি পরিণত করে বদ্‌লে নিয়ে চলছেন, বিশ্বের মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন পরিণামকারী কালরূপে।

এই হল তাঁর সৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য। উপনিষদ বলেছেন, 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ,' সৃষ্টি করে আবার তার মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন। সৃষ্টি করে তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবার মানে কী? বাড়ি করে আমরা যেমন তার মধ্যে বাস করি, ঢুকে যাই, তেমনি জগৎ কি একটা আলাদা জিনিস? তার মধ্যে প্রবেশ করার মানে হচ্ছে যে সেই চৈতন্য, যিনি সৃষ্টি করছেন, সেই সৃষ্টির মধ্যে তিনি অন্তর্ভূত, অনুস্যূত হয়ে আছেন। অন্তর্ভূত হয়ে আছেন বলেই প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টিটা নবায়মান হচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে। আমি একটা বই লিখলাম, আমি একটা গান করলাম, আমি একটা ছবি আঁকলাম, আমি যা-কিছু করি সেটা আমার বাইরেই রয়ে গেল, সেইখানেই তার পরিণাম শেষ হয়ে গেল। সে আর grow করে না, বিকশিত হয় না, সে আর দিন দিন রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু ভগবানের সৃষ্টি, সে প্রতিক্ষণে বিপরিণত হচ্ছে। তার কারণ হল, স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন, তাকে রূপান্তরিত করছেন নিরন্তর। আমি সৃষ্টি করে আমার সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারি না, আমার সৃষ্টি আমার বাইরেই থেকে যায়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির এইখানেই বৈশিষ্ট্য যে তিনি সেই সৃষ্টির সঙ্গে তন্ময় হয়ে আছেন, তার সঙ্গে একীভূত হয়ে আছেন।

সুতরাং একাদশ অধ্যায়ে যে রূপের পরিচয় আমরা পেলাম, এইখানে যে দর্শন হল, সেটা তাঁর কোনরূপ? যখন আমরা উপসংহারে এসে পৌঁছব পঞ্চদশ অধ্যায়ে, তখন দেখব সেইটি হল তাঁর ক্ষর রূপ। ক্ষরণশীল রূপ, যা রূপান্তরিত হচ্ছে নিরন্তর, যেটা পরিবর্তিত হচ্ছে। এই নিরন্তর পরিবর্তনের প্রথম ছবিটা যখন আমরা দেখতে পাই, যখন সেই স্পন্দনকে প্রতিক্ষণে অনুভব করতে শিখি তখন আমরা এসে দাঁড়াই বিশ্বরূপ দর্শনের ভূমিতে। কিন্তু সেই প্রতিক্ষণ পরিণাম সহ্য করতে পারে না আমার ব্যক্তিগত সত্তা, যাকে আমি খাড়া করেছি সত্যরূপে, যাকে আমি কায়েম করতে চাচ্ছি, মনে করছি এই ব্যষ্টিসত্তা বুঝি চিরকাল থাকবে। ব্যক্তিরূপ আর বিশ্বরূপের এই সংঘাত নিরন্তর চলছে। জীব যখন দেখে প্রতিক্ষণে তার মৃত্যু আসন্ন, প্রতিক্ষণে সে মরণকে বরণ করছে, তখন সে শিউরে ওঠে। অর্জুনও এখানে ভয়ে শিউরে উঠলেন। বললেন, "ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে" (৪৫), বার বার বলছেন, "প্রসীদ", "ক্ষাময়ে", "প্রসাদয়ে", "তোমাকে প্রসন্ন

করছি, তুমি ক্ষমা করো।" আবার তাঁকে সেই সৌম্যরূপ, তাঁরই মতো সেই মানুষের রূপ, সেই ব্যক্তিরূপ ধারণ করতে বললেন। তাঁর প্রার্থনা মতো আবার ঠিক সেইভাবেই শ্রীভগবান তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। শুধু একঝলক অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন বিশ্বের পেছনে তত্ত্বটা কী। তাই বিশ্বে অনুস্যূত কালরূপ পরম তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি হল একাদশ অধ্যায়ে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

বিশ্বরূপ দর্শন দিয়েই গীতার উপসংহার হত যদি সেইটিই একমাত্র চরম তত্ত্ব, পরম প্রাপ্তব্য হতো। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে যার সূচনা বা আভাস দিয়েছিলেন ভগবান, এখনও সেই উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছানো হয়নি। তাই আরো এগিয়ে যেতে হবে সেই দুরারোহ পথে, 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' যেখানে 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'। তাই বিশ্বরূপ দর্শনের পর এগিয়ে চললাম যখন আমরা দ্বাদশ অধ্যায়ে, তখন অর্জুনের মনে একটা প্রশ্ন জাগল। অর্জুন ভাবলেন, এই যে বিশ্বরূপের দর্শন হলো, এই কি চরম ও পরম দর্শন? এখানে ভক্ত তন্ময় হয়ে ব্যক্ত ও ক্ষরণশীল সমগ্র বিশ্বে অনুস্যূত তাঁকে সবকিছুর পরিণামপ্রদাতারূপে, মহাকালরূপে দেখল।

আবার এ তো শুনি, কূটস্থ অচল, বিশ্বাতীত তাঁর একটা রূপ আছে, এই যে নিশ্চল, অচল রূপ, অক্ষর রূপ, তাকে যারা জানে, আর এই সচল নিয়ত পরিণামের সাধনকারী কাল বা বিশ্বরূপকে, ক্ষররূপকে যারা জানল, তার মধ্যে তারতম্য কিছু আছে কি? কেননা এই ক্ষররূপের বিশ্বরূপের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে খটকা লাগে যে বিশ্ব চরাচরের সবকিছু যদি পুড়ে ছারখারই হয়ে যায়, তাহলে বিশ্বে শেষপর্যন্ত কিছুই কি আর থাকবে না? তাহলে বিশ্বের আসল রূপটা কি, যথার্থ স্বরূপটা কি? বিশ্বের শেষ কথা কি শুধু ধ্বংস বা বিনাশ? কবির ভাষায় ঃ 'সকলই কি অর্থহীন, শূন্য শূন্যে হবে লীন'? স্বভাবতই হতচকিত হয়েছিলেন অর্জুন। আমরাও হই, যখন আমরা উপলব্ধি করি কালের করাল গ্রাসে সবকিছুর ধ্বংস অনিবার্য। তখন অক্ষররূপের দিকে আমাদের দৃষ্টি যায়।

সেইজন্য দ্বাদশ অধ্যায় থেকে সূচনা হবে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে শুরু করে ভগবান দেখাবেন যে বিশ্বে কালাতীত একটি সত্তা আছে, নিরঞ্জন একটি সত্তা আছে, যে শুধু বোধ মাত্র, যে শুধু দেখে মাত্র। সেই বোধের গায়ে কোনরকম কালের কালি, অঞ্জন বা লেপ লাগে না, সে নিরঞ্জন, নির্লেপ। নানারকম এই যে ছবির পর ছবি আসছে, রূপান্তরের পর রূপান্তর ঘটে চলেছে, সে কিন্তু এই রূপান্তরের মধ্যে নিজে ভেসে যাচ্ছে না, প্রতিক্ষণে সেই রূপান্তরকে সে শুধু দেখে চলেছে। এই হল

বিশ্বলীলার মূল বৈচিত্র্য। একদিকে অবিরাম রূপান্তর, একদিকে প্রতিক্ষণ পরিণাম, আর একদিকে সেই অগ্নিকাণ্ডের পরিণামের যিনি সাক্ষী, যিনি বোধমাত্র, যিনি দেখছেন মাত্র এই কালরূপ অগ্নির মহা তাণ্ডবলীলাকে। সৃষ্টির একটি পরিণামধারা নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে, 'নাপরিণম্য ক্ষণমপি অবতিষ্ঠতে', একক্ষণ তার বিরাম নেই, কিন্তু তাকে আমি দেখে চলেছি মাত্র। একটু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেই আমি অনুভব করি যে, একদিন যে আমি ছিলাম শিশু, সেই আমি আর একদিন হলাম যুবা, আর তারপর সেই আমিই ক্রমশঃ হলাম বৃদ্ধ, সেই 'ক্ষণং বালো ভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ'। কিন্তু ফেলে আসা সেই শিশু বা যুবা আমিকে আমি আবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পারি। তাহলে সেই যে 'আমি', তার কোনো জায়গায় পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে না। তা যদি ঘটত, তাহলে সেই আমির সঙ্গে এই 'আমি'কে সংযুক্ত করতে পারতাম না, Link up করতে পারতাম না! একসূত্রে গাঁথতে পারতাম না। মনে করতাম যে সে আমি মরে গিয়েছে, নতুন এক আমি জন্মেছে বা উদ্ভূত হয়েছে। শিশুকালে আমার দেহের যে গঠন ছিল, মনের যা চিন্তাধারা ছিল, প্রাণের যে সব আকুতি ছিল, আকাঙ্খা ছিল, আজ তার সবকিছু বদলে গিয়েছে। কিন্তু দেহ-মন-প্রাণের আকৃতি-প্রকৃতি আমূল বদলে গেলেও সেই আমি তার মধ্যে অবিচ্ছিন্নরূপে অখণ্ডরূপেই আছে। সেই আমি যেমন সে-অবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল না, তেমনি এখনকার এ-অবস্থার সঙ্গেও সে যুক্ত নেই। অবস্থার পর অবস্থাকে অতিক্রম করে সে এগিয়ে চলেছে। সে যেন প্রকোষ্ঠ থেকে প্রকোষ্ঠে চলেছে, একঘর থেকে আর একঘরে বাসা বাঁধছে।

উপনিষদে বারবার এই তত্ত্বগুলি অপূর্বভাবে বর্ণিত হয়েছে। কখনো যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে শোনাচ্ছেন, কখনোও বা গার্গীকে বলছেন বা অন্য ঋষির প্রশ্নের উত্তরে আলোচনা করছেন। সেখানে এই দৃষ্টি দিয়েই 'আমি'কে বা আত্মাকে ধরার প্রয়াস। স্বপ্নান্ত, বুদ্ধান্ত। একদিকে স্বপ্নের মধ্যে, নিদ্রার মধ্যে আমরা একবার করে ডুবে যাচ্ছি, আবার প্রবুদ্ধ হচ্ছি। স্বপ্নের অন্তে, ঘুমের শেষে জেগে উঠছি, আবার জাগরণের শেষে, প্রবুদ্ধের অন্তে ঘুমে ঢলে পড়ছি। এ যেন এক মহামৎস্য উভয় কুলে সঞ্চরণ করছে, একবার এ-তীরে যাচ্ছে, আর একবার ও-তীরে যাচ্ছে। একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। এইভাবে সে এ-ঘর থেকে ও-ঘর গতাগতি বা যাতায়াত করছে। তার যেন তিনটি আবাসস্থল আছে, 'ত্রয় আবসথাঃ'।* একটা সুষুপ্তির প্রকোষ্ঠ, একটা স্বপ্নের প্রকোষ্ঠ, একটা জাগ্রতের প্রকোষ্ঠ।

এখন জাগরিত অবস্থায় এই চোখ মেলে সব ইন্দ্রিয় দিয়ে এই জগৎকে আমি দেখছি। একটু পরেই আমার চোখে আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসবে অন্ধকার,

*ঐতরেয় উপনিষদ্ ১। ৩। ১২

ইন্দ্রিয়ের আলো নিভে গিয়ে তখন আমার মধ্যে এক আলো জ্বলে উঠবে এবং সেই আলোয় তখন আমার মনের মধ্যে কামনা-বাসনার নানা ছবি ফুটে উঠবে। কামনা-বাসনার সেই ছবি নিয়েই তখন আমি বিভোর হয়ে থাকবো, তন্ময় হয়ে দেখতে থাকবো। সেও কিন্তু আমি দেখছি। এখন এই জগৎকে যেমনভাবে দেখছি তখন স্বপ্নাবস্থায় সেই কামনায় রঙিন বাসনার জগৎকেও আমি তেমনি তন্ময় হয়ে ও বিভোর হয়ে দেখি। হঠাৎ যদি কেউ ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, চমকে উঠে ভাবি, 'ওমা! এতক্ষণ কী সব দেখছিলাম, আবার এ কোথায় এসে জাগলাম!'

আবার অনেক সময় এমন হয় যে, সুষুপ্তির গভীর নিদ্রার মধ্যে সেসব মনের ছবিও মিলিয়ে যায়, শুধু থাকে এক ঘন কৃষ্ণ আচ্ছাদনের, কিছু না জানার অনুভূতি এবং এক অনন্ত সুখের মধ্যে যেন আমি ডুবে থাকি। কিছুই যেন জানিনি, সব যেন আমার কাছ থেকে মুছে গিয়েছিল, অথচ আমি কিন্তু ছিলাম। এক গভীর সুখের মধ্যে ছিলাম, কিছু না জানার গভীর আনন্দের মধ্যে ছিলাম। তাহলে যখনই কিছু না থাকে তাকেও সেই 'আমি' দেখে, যখন সবকিছু থাকে অন্তরে, মনে বা বাইরের ইন্দ্রিয় রাজ্যে, তাকেও সে দেখে। আবার মনের নানা রঙ আকাশে নানা বৈচিত্র্যের মতো যখন ফুটে ওঠে, তাকেও সে দেখে। এখন সেই যে নিশ্চল, অচল, সর্বদা একরূপ পরমতত্ত্ব, তাকে ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ের পর থেকে বোঝাবার সূচনা করবেন। এরই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা' (২। ১৩) ইত্যাদি শ্লোকে। এই 'আমি'কে চিনলে দেহান্তর প্রাপ্তিতেও 'ধীর' আর ন মুহ্যতি' মোহগ্রস্ত হন না, কারণ তিনি জানেন এ শুধু পট পরিবর্তন এবং তিনি তার সাক্ষীমাত্র, দ্রষ্টামাত্র।

অর্জুন সেইজন্য প্রশ্ন করলেন ঃ 'একদিকে তোমার এই ব্যক্তরূপ বিশ্বরূপ তুমি আমাকে দেখালে, ক্ষররূপ দেখালে। অনেকে এর উপাসনা করে থাকে। আর শুনেছি অব্যক্ত অক্ষররূপকে আবার কেউ কেউ উপাসনা করে। এদের মধ্যে 'যোগবিৎতম', যোগীশ্রেষ্ঠ কে? তোমার যোগ বা পরম রহস্যের বেশি জ্ঞাতা কে? অর্থাৎ এদের মধ্যে কি কোন তারতম্য আছে?' ভগবান উত্তরে বললেনঃ 'না, কোনো তারতম্য নেই। কেননা এটাও আমারই রূপ, সেটাও আমারই রূপ। তবে সেই অব্যক্ত রূপকে ধরা, সেই অক্ষর, সেই অচল নিশ্চলরূপকে ধরা এই দেহধারীর পক্ষে বড় কঠিন।' কেননা দেহের নিগড়ে ব্যক্তের রাজ্যে আমরা বাঁধা। তার মানে পরিণামের রাজ্যে আমরা রয়েছি। স্রোতের ওপারে সেই যে নিশ্চল অচল রূপ তাকে আমরা ধরতে পারছি না। সেইজন্য সেটাকে বললেন, 'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্'। তবে সঙ্গে সঙ্গে জানালেন ঃ কিন্তু এ যেন মনে করো না তারা অন্য কোনো তত্ত্বকে বা আলাদা জিনিসকে ধরতে যাচ্ছে, আমাকে ধরতে যাচ্ছে

না, 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ' (৪)। তারাও আমাকেই পাবে, কারণ ভক্তও ক্ষররূপে তাঁকেই 'পর্যুপাসতে' এবং অব্যক্ত অক্ষররূপের উপাসকও 'অক্ষরং পর্যুপাসতে'। তাই পর্যুপাসনার ফল একই, তাঁকে পাওয়া।

এইজন্য এখন ভগবান পর্যুপাসনার ক্রম দেখাচ্ছেন। ভক্ত কিভাবে উপাসনা করে? ভক্ত 'মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে', ভক্ত তাঁকে করে ধ্যানরূপে উপাসনা, তাঁর সঙ্গে তন্ময় হয়ে উপাসনা। এই তন্ময়তা লাভের জন্য কী করতে বললেন ভগবান?

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ।। ৮।।

"তোমার মনটি আমাকে দাও, বুদ্ধিটিও আমাতে নিবিষ্ট করো।"

যেমন বুদ্ধির ক্ষেত্রে তেমনি মনের রাজ্যেও তাঁকে অধিষ্ঠিত করতে হবে। এই যে মনের মধ্যে আমাদের নানারকম বিকার, একের পর এক নানারকম ভাব জাগছে, আমরা চেষ্টা করি সেই মনকে দাবিয়ে রাখতে। ভগবান বলছেন, "এভাবে তো আমাকে পাওয়া যায় না। শুধু বুদ্ধি স্থির হলে তবে আমাকে পাবে তা নয়, মনের রাজ্যেও যতরকম ভাব হচ্ছে, তুমি শুধু দেখো যে সেসব ভাবের পিছনেও আমিই রয়েছি। সুতরাং আমাকেই মনটা দাও, আমাকেই বুদ্ধিটাও দাও।" নইলে একথা বললেই হত শুধু বুদ্ধিটা আমাকে অর্পণ করো, মনটা তোমার বিষয়ে লেগে থাক, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। "মনও আমাকে দাও, বুদ্ধিও আমাকে দাও, তাহলেই তুমি নিরন্তর আমাতেই নিবাস করবে।"

মন ও বুদ্ধি দুই-ই তাঁকে অর্পণ করতে না পারলে আমরা তাঁতে নিবাস করতে পারব না। একটুক্ষণের জন্য ঠাকুরঘরে গেলাম, অনেক চেষ্টা সাধ্য-সাধনা করে বুদ্ধিটাকে একাগ্র করলাম, এবং শেষে সেই একাগ্র বুদ্ধিকে তাতে অর্পণ করলাম। কিন্তু তার ফলে তাতে নিবাস হল না। যেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম এই কল-কোলাহলের মধ্যে, নেমে এলাম মনের রাজ্যে, অমনি তখন আবার সব হারিয়ে গেল। তাই সাধক প্রার্থনা করে ঃ

কোলাহলের বেগে ঘূর্ণি উঠে জেগে
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা।

সুর পাকা হয়েছে কিনা, মনের স্তরে, বিক্ষেপের স্তরেই তার পরীক্ষা। মনটিও যখন তাঁতে আমি দিতে পারব, তখন মন যেখানেই বিচরণ করুক, সে বিচরণ করবে তাঁতেই। এইজন্য যোগীরা বলে থাকেন ঃ 'যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ', যেখানে যেখানেই মন যাচ্ছে, সেখানে সেখানেই সে সমাধি লাভ

করছে। অর্থাৎ মন যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই সেই আত্মস্বরূপকে, সেই বোধস্বরূপকেই উপলব্ধি করছে বলেই কোনো জায়গায় তার বিক্ষেপের সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই। সে দেখছে এক পরম অখণ্ড বোধের মধ্যেই সমস্ত বিচিত্র বিলাস, এই বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্য সব বিস্ফুরিত হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে সেই 'শাশ্বত প্রকাশ—পারাবারে।'

কিন্তু এভাবে মন-বুদ্ধি সব তাতে অর্পণ করে কৃতার্থ হওয়া সহজসাধ্য তো নয়, প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই এরপর ভগবান একের পর এক দেখালেন যে যদি তা-ও তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, অভ্যাসযোগ করো তাহলে, 'অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়' (৯)। অভ্যাসও যদি না করতে পারো, যদি বলো ওসব আমার দ্বারা হবে না, তাহলে 'মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি' (১০), আমার জন্য কর্ম করো। কিন্তু সে-কর্মও আমি পারি না। তাহলে তুমি কী করবে? 'সর্বকর্মফলত্যাগং' (১১), সমস্ত কর্মফল তুমি আমাকে ত্যাগ করে দাও। অর্থাৎ কর্তৃত্ববোধ যদি তুমি ত্যাগ করতে না পারো তোমার ভোক্তৃত্ববোধটা আমাকে দিয়ে দাও। এইরূপে যদি তাঁকে আমি ফলটি দিতে পারি, তাহলেই আমার শান্তি। 'কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্' (১২)। এইটিই তো মানুষ খুঁজছে, নিরন্তর শান্তি শান্তি করছে, কিন্তু শান্তির এ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো পন্থা নেই, 'ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্'।

এই হল ভারতবর্ষের সনাতন বাণী যে ত্যাগ ছাড়া মানুষ শান্তি পেতে পারে, না। 'ত্যাগেন অমৃতত্বমানশুঃ'। কিসের ত্যাগ? ঐ যে নিজের ক্ষুদ্র বোধ, সঙ্কীর্ণ অহংবোধ, তার ত্যাগ। এই যে নিজের বাসনা-কামনার জালে আমি জড়িয়ে আছি সেইটে ত্যাগ করে যদি আমি এই কর্মস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিই, তবে কোনো জায়গা থেকেই আমাকে সরে আসতে হবে না, কোথাও কোনো কিছু আমাকে বর্জন করতে হবে না। এইখানে আমার বর্তমান অবস্থার মধ্যে থেকেই আমি গভীর শান্তির মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারি। গীতায় ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোর কর্মে নিরত থেকেই এই শান্তি লাভ করতে উপদেশ দিয়েছেন। এখানে স্মরণীয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবানের সেই অনুপম উপমাটি ঃ

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ।। ২।৭০।।

সমুদ্র যে তার গভীর অতলে চির প্রশান্ত, সে কি জলের রাশি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে? অনন্ত জলরাশি নিরন্তর তার মধ্যে এসে প্রবল বেগে প্রবিষ্ট হচ্ছে, তোলপাড় করছে, কিন্তু অতলের সেই প্রশান্তি তাতে এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না। তেমনি সমস্ত কামনার স্রোত যখন আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আমাতেই মিলিয়ে যায় আমার মনের গভীর অতলে, যখন তারা কেউ কোনোরকম আলোড়ন, কোনোরকম কম্পন সৃষ্টি করতে পারে না, তখনই আমি শান্তিলাভের অধিকারী হই। এখন এক একটা কামনার স্রোতের পিছনে আমিই ছুটে বেরিয়ে যাই। তখন আর আমি ছুটে বেরিয়ে যাই না কামনার পিছনে, স্রোতের পিছনে। তখন আমি ঘরেই বসে আছি, 'স্বে মহিম্নি', আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, আর অনন্ত কামনার স্রোত প্রবাহিত হয়ে আসছে আমার মধ্যে, আর আমার হৃদয়ের গভীর অতলে তারা এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে সমস্ত কামনার স্রোত যখন আমার হৃদয়ের অতলে মিলিয়ে নিতে পারব, তখনই আমি শান্তিলাভ করব। এরই নাম হল 'ত্যাগাৎ শান্তি'। সেই ত্যাগের পথ ভগবান এই দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে শেখালেন।

প্রসঙ্গত ভক্তের যে নানারকম লক্ষণ এই অধ্যায়ের উপসংহারে শোনালেন, মনে রাখতে হবে তার মধ্যে প্রধান লক্ষণটি হল 'অদ্বেষ্টা', সর্বপ্রথম যে শব্দটি উচ্চারণ করেছেন তার মধ্যেই নিহিতঃ

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।। ১৩।।

ভক্ত তাকেই বলে যে কাউকে দ্বেষ করে না। দুফোঁটা যার চোখের জল পড়ে, বা পুলক, কম্প, অশ্রু যার উদ্‌গত হয় তাকেই ভক্ত বলে না। ভক্তের যেটি মুখ্য বা প্রধান লক্ষণ, সেটি হল 'অদ্বেষ্টা', তার দ্বেষ থাকে না। আমরা আগে দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুনে এসেছি স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের মধ্যে যেটি মুখ্য বা প্রধান, সেটি হল কামনার ত্যাগ, "প্রজহাতি যদা কামান্" (২।৫৫)। এই কামনা মানুষ ত্যাগ করতে পারে, রাগ বা আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারে নিজের চেষ্টা দ্বারা। কামনা আমি সব ত্যাগ করেছি, আর কিছু চাই না জীবনে। কিন্তু আর একজন এসে আমাকে আঘাত করছে, তার প্রতি আমার দ্বেষ জন্মাবে না, এটা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না যতক্ষণ আমার পৃথক সত্তাবোধ আছে। তাই আমি রাগ অর্থাৎ কামনা ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু দ্বেষ ত্যাগ করতে পারি না।

দ্বেষ কখন ত্যাগ হয়? যখন প্রেমের পরমভূমিতে আমি উঠতে পারি, যখন দেখি আমাকে যে আঘাত করছে সে তো আমারই আত্মভূত, আমারই স্বরূপ।

যেখানে দুই-ই আমার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অর্থাৎ যেমন জিভটাও আমার অঙ্গ, দাঁতটাও আমার অঙ্গ, সেখানে আমার দাঁত যদি কোনো কারণে জিভকে কামড়ে ফেলে, কেটে রক্তাক্ত করে, তখন কি নোড়া দিয়ে আমার দাঁতকে ভাঙতে যাই? এই কারণেই ভাঙি না যে আমি জানি, জিভ যেমন আমার অঙ্গভূত, দাঁতও তেমনি আমার অঙ্গভূত। তাই সেইভাবে যখন উপলব্ধি করি, আমাকে যে আঘাত করছে সে-ও আমারই আত্মস্বরূপ, আত্মভূত তখনই আমি হতে পারি 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্'। তখনই আমরা বুঝতে পারি কেমন করে ঘটল নবদ্বীপে সেই আশ্চর্য ঘটনা।

জগাই মাধাই যখন এসে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে মারল কলসির কানা দিয়ে, তখন তিনি তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আঘাতকারীকে এমন করে নিত্যানন্দ জড়িয়ে ধরেন কেন? তিনি জানেন, যে আঘাত করল, সে তাঁরই আত্মভূত। সে যে তাঁর আত্মভূত, একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

সে তার পুরানো সবকিছু হিংসা, দ্বেষ, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা ভুলে গিয়ে তাঁর চরণে নিপতিত হয়ে আত্মভূত হয়ে গেল, তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেল। এই ভূমিটা লাভ করা শুধু ভক্তের পক্ষেই সম্ভব, কারণ তিনি 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্'। তাই যখন সমস্ত বিশ্বচরাচর আমার আত্মভূত হয়ে যায়, তখনই আমি যথার্থ ভক্ত হতে পারি। ভাগবত সেই একই লক্ষণ শুনিয়েছেন ভক্তের ঃ

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।। ১১।৩।৪৫।।

উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ভাগবত কে? ভক্ত কে? 'সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবম্'। সমস্ত ভূতের মধ্যে যে তাঁকে দেখতে পায়। নিখিল চরাচরে যখন আমি সেই ভগবানের রূপ, অর্থাৎ আত্মার রূপ, নিজেরই স্বরূপকে প্রতিবিম্বিত দেখি, তখনই আমি ভক্ত হলাম। তখনই আমি দেখলাম বিশ্বচরাচরে যা-কিছু পরিণত হচ্ছে, যেখানে যা-কিছু 'ভূত' বা ভবনধর্মী অর্থাৎ পরিণামী, সেসব তিনিই। তাই লক্ষণীয়, ভগবানের দেওয়া ভক্তের এই লক্ষণগুলির মধ্যে সমত্বেরই প্রাধান্য। 'সমদুঃখসুখঃ' (১৩), 'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ, 'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ' (১৮) ইত্যাদির মধ্যে সমত্বই সুপরিস্ফুট। যার মধ্যে এই সমতা, তার মধ্যেই ফোটে যথার্থ মমতা। সমতাবোধ আনে জ্ঞান আর মমতা জন্মায় ভক্তি।

এখন সেই সমত্বেরই পরাকাষ্ঠার দিকে আমাদের যাত্রা এই দ্বন্দ্ব বা বিষমতার রাজ্য থেকে, কারণ 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম', সেই নির্দোষ সমতায় না পৌঁছন

পর্যন্ত, সেই ব্রহ্মচেতনায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যাত্রার শেষ নেই, সাধনার সমাপ্তি নেই। গীতার শেষ ষট্‌কে অর্থাৎ বাকি ছয় অধ্যায়ে এখন সেই পুরুষোত্তমের পরম তীর্থের দিকে পদক্ষেপ বা অন্তিম অভিযান, যেখানে ক্ষর-অক্ষরের দ্বন্দ্ব সব সমাহৃত, সমন্বিত বা অতিক্রান্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

দ্বিতীয় ষট্‌ক শেষ হল দ্বাদশ অধ্যায়ে। এবার তৃতীয় ষট্‌কে শেষ পর্বের আরম্ভ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। এখান থেকে এক নতুন ধারার সূচনা—বিশ্লেষণের, বিভাগের। এতক্ষণ আমরা কী করছিলাম? সংশ্লেষণ বা সংযোগ। বিশ্বরূপ যে দর্শন করে এলাম, সেটা হল তাঁর সঙ্গে তন্ময় হয়ে, যুক্ত হ'য়ে, একাকার হয়ে, এবং তাঁকেও দেখলাম বিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে সংশ্লিষ্টরূপে। এই সংশ্লেষ, সংযুক্তি বা একাকারের পর, এখন তাঁকে বিশ্লেষণ করে, বিযুক্ত করে, পৃথক করে দেখা।

এই দুটো ধারা আছে আমাদের সাধনায়। একটা হল যোগের ধারা, আর একটা হল বিয়োগের ধারা। যোগ হল তন্ময়তার ধারা। তন্ময় হয়ে আমরা দর্শন করলাম বিশ্বের মধ্যে তিনি ওতপ্রোত হয়ে, অনুস্যূত হয়ে কেমন করে সবকিছুকে পরিণত করে চলেছেন। আর এই পরিণাম থেকে যদি আমি তাঁকে বিযুক্ত করতে পারি, আলাদা বা পৃথক করতে পারি, তাহলেই দেখতে পাব সেই অমর অচল সত্তাকে, যিনি এই কালের আগুনে পুড়ছেন না, যাঁকে কোনো জায়গায় কোনো পরিণাম স্পর্শ করছে না, যিনি সর্বদা সনাতন একরূপ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তারই পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন। সুস্পষ্ট ভাগ করে দেখালেন। অধ্যায়ের নাম সেইজন্য ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ। লক্ষণীয়, এরপরে পঞ্চদশ ছাড়া একেবারে অষ্টাদশ পর্যন্ত সব অধ্যায়েই প্রায় এই 'বিভাগ' কথাটি যুক্ত এবং তারই বর্ণনা। এই দুটি জিনিসকে বুঝতে হবে, ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ। বিশ্বরূপে যা-কিছু পুড়তে দেখলাম, ছারখার হয়ে যেতে দেখলাম, তা সবই হল 'ক্ষেত্র'। 'ক্ষেত্র' পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু 'ক্ষেত্রজ্ঞ' যিনি, ক্ষেত্রের মধ্যে বাস করে যিনি সবকিছু বোধ করছেন, জানছেন, তিনি কিন্তু এই কালের অনলে, এই কালাগ্নিতে দগ্ধ হন না, তিনি কালাতীত নিরঞ্জন। তাঁকেই এখন চেনাচ্ছেন। তাই বলছেন ঃ

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।। ৩।।

লক্ষ্যণীয়, ক্ষেত্রশব্দে বহুবচন, ক্ষেত্রজ্ঞে একবচন। ক্ষেত্র অনেক, ক্ষেত্রজ্ঞ এক, অখণ্ড অবিকারী। ভগবান তাই বলছেন, সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে আমি বসে আছি ক্ষেত্রজ্ঞ হয়ে। সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে এখন চেনো। ক্ষেত্রের পরিচয় দিলেন 'সমাসেন',

অর্থাৎ সংক্ষেপে। তারপর দিলেন জ্ঞানের পরিচয়। তুমি জ্ঞান জ্ঞান করছ, শুধু পুঁথি পড়লেই কি জ্ঞান হয়? এইবার গীতার মতে জ্ঞানের লক্ষণগুলি তিনি বর্ণনা করছেন। এইগুলি যিনি অর্জন করেছেন, এইগুলি যাঁর মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে, তাঁরই লাভ হয় স্বরূপের জ্ঞান ঃ

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।। ৮।।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্।। ৯।।
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।। ১০।।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।। ১১।।
অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।। ১২।।

এছাড়া আর সবই অজ্ঞান, এইগুলিই জ্ঞান। এইভাবে জ্ঞানকে তিনি চেনালেন। এইজন্য যার মধ্যে জ্ঞানের শিখা জ্বলে, তিনিই শুধু দেখতে পান উজ্জ্বল ভাস্বর দৃষ্টি নিয়ে যে বিশ্বচরাচরের মধ্যে সেই কালাতীত বোধস্বরূপ কেমন করে বিরাজ করছেন। কাকে তিনি জানেন, জ্ঞেয় কে, সে বিষয়ে অর্জুনের মনে পাছে কোনো শঙ্কা জাগে ঃ "জ্ঞান তো বললে, কিন্তু জ্ঞেয় কে?" তাই সেটার কথাও তাকে বললেন ঃ

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।। ১৩।।

এখানে যেটি জ্ঞেয় তাকে কোনো কোঠার মধ্যে, কোনো category-র মধ্যে ফেলা যায় না। তিনি সৎও নন, অসৎও নন। কার্যও নন, কারণও নন, কারণ তিনি আদিমান নন। এইখানে তাঁর আদি বা আরম্ভ, এমন কালের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা নন তিনি। এই কার্য-কারণ উভয়ের ঊর্ধ্বে যিনি, তিনিই হলেন জ্ঞেয় অর্থাৎ যিনি কালাতীত। তাই বলে তিনি একটা কিম্ভূতকিমাকার অনির্বচনীয় বস্তু বা আমাদের নাগালের বাইরে, একথা মনে কোরো না। তিনি সর্বত্র রয়েছেন ঃ

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।। ১৪।।

সবকিছুকে ঢেকে তিনিই বিরাজিত। তাঁকে তুমি দেখো চেয়ে, তাঁকে তুমি

উপলব্ধি করো। তিনিই হলেন একমাত্র জ্ঞেয়। সেই জ্ঞেয়ের স্বরূপকে এখন জানতে হবে, বুঝতে হবে এইভাবে ঃ

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।। ১৫।।

পড়লেই মনে হয় যে সবই বিরুদ্ধ কথা। একটা কথা বলছেন, ঠিক তার পরই উলটো বিশেষণটি দিচ্ছেন। একদিকে বলছেন সব ইন্দ্রিয়ের গুণের দ্বারা তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন, আবার পরক্ষণেই তিনি বলছেন 'সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত'। বলছেন, তিনি অসক্ত, কোনোকিছুর সঙ্গে যুক্ত নন, আবার তিনিই সবকিছু ধরে রয়েছেন, ভরণ করছেন। সকলের মূলে তিনি রয়েছেন। তিনি নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা। এই যে তাঁর রূপের বৈচিত্র্য, তা তখনই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যখন জ্ঞানের এই পরাকাষ্ঠায়, এই চরম সীমায় সে এসে পৌঁছয়। তখনই সে চিনতে পারবে যে স্বরূপত তিনি কী। এইজন্য বলছেন, আমি রয়েছি সবকিছুর ভিতরে বাহিরে ঃ

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।। ১৬।।

এইখানেই রয়েছেন তিনি, অথচ তাঁকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। কেননা তিনি এখন আমার কাছে সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্মতার দরুণ তিনি আমার অগোচর থেকে যাচ্ছেন। আমি স্থূল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছি বলে আমার হৃদয়ের অতলে সূক্ষ্মরূপে যেটি আছে, তাকে ধরতে পারছি না। এইজন্য দৃষ্টিকে সূক্ষ্মাবগাহী করতে হবে। এই সূক্ষ্মাবগাহী দৃষ্টি কেমন করে হয় তার সাধন ঐ বললেন অমানিত্বাদির বর্ণনায়। আমি যদি চঞ্চল হয়ে থাকি, বিষয়ের নানা দিকে আমার মন যদি প্রধাবিত হয়, তাহলে মনকে আমি অতলে, গভীরে নিয়ে যেতে পারি না। তাই তাঁকে আমি চিনতে পারি না। যদি চিত্তকে এইভাবে সূক্ষ্মে আমি নিয়ে যেতে পারি, তাহলেই আমি চিনতে পারব, জানতে পারব তিনি স্বরূপত কেমন করে এই বিশ্বে ওতপ্রোত হয়ে থেকেও তাকে অতিক্রম করে আছেন।

এইজন্য চিনতে হবে প্রকৃতি তত্ত্ব আর পুরুষ তত্ত্ব। যা-কিছু ক্রিয়া চলছে, যা-কিছু পরিণত হচ্ছে, তা কে করছে? প্রকৃতি। কর্তৃত্ব তাই প্রকৃতির।

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।। ২১।।

আর এই পরিণামজনিত সুখ-দুঃখের অনুভবকর্তা, এই সবের ভোক্তা হয়ে

আছেন কে? পুরুষ। ভোক্তৃত্ব তাই পুরুষের। তাই বুঝতে হবে যা-কিছু কর্তৃত্ব সে কার? যা-কিছু ঘটাচ্ছে সে কে? সে আমার প্রকৃতি। এইজন্য একদিকে প্রকৃতির পরিণামের ধারা চলছে, আর সে প্রকৃতিকে বোধরূপে উপলব্ধি করছেন তিনি। তিনি ঃ

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।। ২৩।।

এই তিনি দ্রষ্টারূপে বসে আছেন, সবকিছুকে নির্নিমেষ নয়নে দেখে যাচ্ছেন মাত্র। সাংখ্যদর্শনে একেই বোঝানো হয়েছে 'অন্ধ-পঙ্গু' ন্যায়ে বা উপমার সাহায্যে। প্রকৃতি অন্ধ, সে চোখে দেখে না, শুধু চলে, আর পুরুষ পঙ্গু, চলতে পারে না, শুধু দেখে। দুনিয়াটা এই দুজনের কারবার, অন্ধের কাঁধে পঙ্গু চড়েছে, অচেতন প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত হয়েছে সচেতন পুরুষ। এদের আলাদা করে দেখতে হবে, জানতে হবে।

কিন্তু তাঁকে দেখবার বা জানবার কী উপায়? ধ্যানের দ্বারা দেখতে পারো, কিংবা সাংখ্য--যোগের দ্বারা দেখতে পারো, কেউ কর্মযোগের দ্বারা দেখতে পায়, কেউ বা 'শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে' (২৬)। কিন্তু যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, যতক্ষণ না এঁকে দেখতে পাচ্ছে, ততক্ষণ মুক্তি নেই। এই বোধস্বরূপে যতক্ষণ সে এসে না দাঁড়াতে পারছে ততক্ষণ তার নিস্তার নেই। তাই সে চরম রূপটির কথা বলে দিয়েছেন ২৮ শ্লোকে ঃ

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। ২৮।।

ঐ একটি 'তিষ্ঠন্তং' কথার যে কী ব্যঞ্জনা, তা যিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই তাঁর স্বরূপের মহিমা জানতে পারেন। 'তিষ্ঠন্তং' মানে তিনি শুধু আছেন মাত্র, অবস্থিত মাত্র, 'Is' মাত্র। উপনিষদ বলেছেন ঃ

অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।। কঠ ২/৩/১২।।

তাঁকে আমি আর কী করে বলব তোমাকে, যম বলছেন নচিকেতাকে। 'অস্তি' মাত্র, আছেন মাত্র। তিনি আছেন, মানে তাঁর কোনো রূপান্তর নেই, তিনি আছেনই। এইজন্য তিনি বলেছেন ঃ 'সমং সর্বেষু ভূতেষু,' সমস্ত ভূতের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত। 'ভূত' মানে যা 'ভবতি' হচ্ছে, নিরন্তর যার রূপান্তর ঘটছে। তার মধ্যে তিনি রয়েছেন সমরূপে অবস্থিত, অবিনাশী।

'বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং,' আর সবই বিনাশশীল, ঐ যার পরিচয় পেলাম আমরা বিশ্বরূপের মধ্যে। সব বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এটা বহুবচন, 'বিনশ্যৎসু,' আর তার মধ্যে এক 'অবিনশ্যন্তম্'। 'যঃ পশ্যতি স পশ্যতি,' এইটে যিনি দেখেন তিনিই ঠিক

দেখতে পান। উপসংহারের দিকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বার বার ঐটি বলছেন ঃ

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।। ২৯।।

এই সমবস্থিত ঈশ্বরকে তুমি দেখো। এইরূপে যদি তুমি চিনতে পারো তাহলেই তাঁকে তুমি যথার্থভাবে জানবে, ক্ষেত্রের স্বরূপ চিনবে এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপও চিনবে। তিনি এই দেহের মধ্যে রয়েছেন ঃ

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।। ৩২।।

দেহের থেকে আলাদা হয়ে দূরে সরে গিয়ে তিনি নির্লিপ্ত হয়ে নিজের শুদ্ধস্বরূপ বজায় রাখেননি। শরীরের মধ্যে থেকেই, সর্বত্র অবস্থিত থেকেই, তিনি 'নোপলিপ্যতে' বিন্দুমাত্র লিপ্ত হন না। এই হল আত্মার নির্লেপতার মহিমা। কারণ 'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।* তাই তাঁকে কোনোরকম মালিন্য যে স্পর্শ করে না, সমস্তের মধ্যে থেকেও তিনি যে কেমন নির্লিপ্ত, কেমন অনাসক্ত, এই উপলব্ধিটি যিনি করতে পারেন, তিনিই ধীরে ধীরে সেই পুরুষোত্তমের দিকে এগিয়ে যান, যেটা আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে পাব।

*বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪। ৩। ১৫

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগযোগ

যে সাংখ্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান দিয়ে গীতার আরম্ভ দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এখন শেষ ষট্‌কে সেই জ্ঞানেরই বিস্তৃত ও বিশদ উপদেশ। চতুর্দশ অধ্যায়ে তাই ভগবান আরও বললেন যে তোমায় আমি 'জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্' (১) বলছি। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তোমায় দিচ্ছি। বিশ্বটা কীভাবে চলছে দেখো। এই বিশ্বের মূলে কে? একদিকে যোনি বা উদ্ভব স্থান, জননীরূপিণী যিনি, তিনি হলেন 'মহদ্‌ব্রহ্ম' (৩) । আর তার 'বীজপ্রদ পিতা' (৪) হলাম আমি ঃ আমারই সংকল্পে, আমারই ইচ্ছাতে এই বিশ্ব প্রসব করেছেন কে? সেই মহদ্‌ব্রহ্ম। মহদ্‌ব্রহ্ম মানে হচ্ছে ব্যাপক বিশাল প্রকৃতি। সেই পরমা প্রকৃতি যিনি, তিনি বিশ্বকে এই নানারূপে বিবর্তিত করছেন, প্রকাশ করছেন পিতা বা পুরুষ যিনি, তাঁরই ইচ্ছায়।

প্রকৃতির মধ্যে তিনটি রূপ। কোনোটা শুভ্র উজ্জ্বল রূপ, তাকে আমরা সত্ত্বরূপ বলি, কোনোটা কামনায় রঞ্জিত রক্তিমরূপ, তাকে রজোরূপ বলি, কোনোটা একেবারে গভীর কালো অন্ধকারের আবরণে ঢাকা রূপ, কৃষ্ণরূপ, তার নাম হচ্ছে তমোরূপ। সুতরাং এই লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ রঙের রকমফের এখানে হচ্ছে বটে, কিন্তু স্বরূপে যিনি আছেন তাঁর গায়ে এতটুকু রং লাগছে না। তিনি সত্ত্বের দ্বারা উজ্জ্বল হন না, তমের দ্বারা মলিন হন না, রজের দ্বারা রক্তিম হন না। স্বরূপের এই মহিমাটিকে চিনতে হবে। অথচ তিনি এই তিনরকম পোশাক পরে সত্ত্ব, রজ ও তমের আবরণ ধারণ করে এই বিশ্বচরাচরে খেলা করছেন। এই গুণের সঙ্গে তাঁর যে খেলা, এইটে যিনি দেখতে পারেন, তিনিই তাঁর স্বরূপ লাভ করেন। এইটিই তিনি ১৯ শ্লোকে দেখালেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক সব রূপের বিশদ পরিচয় দিয়ে শেষে বললেন ঃ

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি।। ১৯।।

গুণই সব করছে, আর তিনি শুধু দ্রষ্টা, এইরূপে যিনি দেখতে শেখেন, শুধু এই বোধে দাঁড়িয়ে মাত্র দ্রষ্টারূপে যখন তাঁকে অনুভব করেন, আর

'গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি,' গুণের পারে তিনি, এইরূপে তাঁকে যিনি জানেন—'মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি,' তিনিই মদ্‌ভাব ভগবদ্‌ভাব লাভ করেন। এরই নাম হল ভগবদ্‌ভাব লাভ করা। 'গুণানেতানতীত্য' (২০)—'অতীত্য' কথাটির মধ্যে এই অসীম ব্যঞ্জনা, গুণগুলিকে অতিক্রম করে। কোন্ গুণগুলি? 'দেহসমুদ্ভবান্,' যেসব গুণ দেহেতে উদ্ভূত হচ্ছে। আজ আমি সাদা জামা পরেছি, কাল লাল জামা পরছি, পরশু কালো জামা পরছি। এ সবই হল আমার দেহসমুদ্ভব, বাইরের পোশাকের তারতম্য। গুণের পোশাককে সরিয়ে একে অতিক্রম করে যখন দেহী আমিকে দেখতে পাই, তখন—

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।। ২০।।

তখনই আমি জন্ম-মৃত্যু, জরা-দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতত্ব লাভ করি। এই হল অমৃতত্বের লক্ষণ। অর্জুন জানতে চাইলেন কাকে গুণাতীত বলে, কোন্ লক্ষণে তাঁকে চেনা যায়। ভগবান সেইজন্য তাঁকে চিনিয়ে দিলেন ঃ

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।। ২৩।।

গুণ যাঁকে বিচলিত করতে বা নাড়াতে-চাড়াতে পারে না, যিনি সব সময় উদাসীন কূটস্থ, তিনি শুধু অবস্থান করেন, 'অবতিষ্ঠতি'। তিনি বসে আছেন, তাঁর সামনে দিয়ে নানা রঙের লীলা হয়ে চলেছে, তিনি দেখে যাচ্ছেন। পরের শ্লোকেও (২৪) দেখিয়েছেন—'স্বস্থঃ', তিনি নিজেতেই নিজে অবস্থিত। 'সমদুঃখসুখঃ,' সুখ-দুঃখের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, সুখের ঢেউয়ে তিনি স্ফীত, উৎফুল্ল হন না, আবার দুঃখের ঢেউয়ে অবসন্ন, উদ্‌বিগ্ন হন না, কিন্তু তার মধ্যে তিনি 'স্বস্থঃ', নিজেতেই নিজে তিনি রয়েছেন আনন্দে বিভোর—'গুণাতীতঃ স উচ্যতে' (২৫)। তখনই আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর কাছে কেন সবই তুল্য বা সমান।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।। ২৫।।

শুধু মনে করছি শত্রুও যা, মিত্রও তাই, এরকম একটা মনে মনে ভাবনা করে নেওয়া নয়। সব তাঁর কাছে একাকার হয়ে গিয়েছে। মিত্রতার দ্বারা তাঁর উল্লাস নেই, শত্রুতার দ্বারা তাঁর বিষাদ নেই, কেননা তিনি জানেন যে এ হল গুণের খেলা। গুণের দ্বারা কেউ বন্ধু হয়, কেউ শত্রু হয়, কেউ আমার অনুকূল হয়, কেউ প্রতিকূল হয়। স্বরূপের সঙ্গে এই বৈষম্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

পঞ্চদশে পূর্ণিমার পূর্ণতা। মাত্র কুড়িটি শ্লোকের এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে শ্রীভগবান সংসারের মূল থেকে স্থূল পর্যন্ত সবকিছুর পরিচয় দিলেন। সেই সঙ্গে সংসার থেকে নিষ্কৃতির পথ, যেখানে গিয়ে পৌঁছলে আর ফিরতে হয় না, সেই পরম ধামের কথা এবং যে-পুরুষোত্তমকে জানলে মানুষ কৃতকৃত্য হয়, তার পরিচয়ও দিলেন। যার যোনি বা উদ্ভবস্থল মহদ্‌ব্রহ্ম আর যাঁর বীজপ্রদ পিতা তিনি, ভগবান সেই বিশ্বের ছবিটি পরিপূর্ণভাবে এঁকে দিলেন পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে, বিশ্লেষণের ধারাকে আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে।

সেই ঊর্ধ্বে যার মূল, আর নিচে যার শাখা-প্রশাখা নেমে এসেছে, সেই সংসারবৃক্ষটি হল 'অশ্বত্থ', আজ আছে কাল নেই। 'শ্ব' মানে আগামী কাল। আগামী কাল পর্যন্ত যা না থাকে তাই অ-শ্ব-ত্থ। এই ক্ষণস্থায়ী অনিত্য সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে কর্মানুবন্ধী নানা জালে জীব তুমি জড়িয়ে পড়েছ, একে তুমি ছেদন কর। কিসের দ্বারা ছেদন করবে? 'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা' (৩)। এই অসঙ্গ, নির্লিপ্ত হয়ে তার থেকে তুমি পৃথক হয়ে যাও, আলাদা হয়ে যাও। এইরূপে যদি তুমি সংসারবৃক্ষকে ছিন্ন করতে পারো, নির্মূল করতে পারো, তাহলেই তখন ঊর্ধ্বপথে যাত্রা বা পরিমার্গণ সম্ভব হবে। যাত্রা করে কোথায় যাবে? 'যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ,' (৪) যেখান থেকে আর ফিরতে হয় না। ফিরতে হয় না মানে কী? ঐ পরিণামের যে চাকায় পিষ্ট হচ্ছি নিরন্তর, ঘুরে ঘুরে আবর্তিত হচ্ছি, ফিরে ফিরে আসছি, তার থেকে তখন আমি নির্মুক্ত হই, তার অতীত হয়ে যাই। তার উপায় হল ভগবানে প্রপন্ন হওয়া, নিজের আদ্যপুরুষ স্বরূপে, আত্মস্বরূপে প্রপন্ন হওয়া।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।। ৪।।

এই যে স্রোতধারা, এই সৃষ্টিধারা যেখান থেকে নির্গত হয়ে এসেছে, অর্থাৎ যে মূল থেকে তার উৎপত্তি, সেই মূলে আমি পৌঁছলাম তখন। মূলে পৌঁছবার ফলে এই স্রোতকে এখন সেখানে বসে দেখছি। যেমন, আমি যদি গঙ্গোত্রীতে

যাই, সেখান থেকে দেখতে পাব সেই হিমবাহ থেকে কেমন করে গঙ্গার শুদ্ধ স্বচ্ছ ধারা নিঃসৃত হয়ে এসেছে, আর তারপর বিপুল তরঙ্গভঙ্গে কেমন করে ক্রমশ ক্রমশ মর্ত্যের সমতলের দিকে সে এগিয়ে চলেছে। এটা যেমন দেখতে পাই সেই উত্তুঙ্গ-চূড়ায় বসে তেমনি এখানেও তার পাদমূলে বসে সৃষ্টিধারার পর্যবেক্ষণ।

ঠিক একই কথা পাতঞ্জল দর্শনেও বলেছেন। যিনি প্রাজ্ঞ তিনি কি করেন? 'প্রজ্ঞাপ্রাসাদং আরুহ্য', এই প্রজ্ঞার প্রাসাদে বা প্রসাদে, স্বচ্ছতার শিখরে আরোহন করে তিনি 'অশোচ্যঃ', শোকের পরে চলে যান, এবং শোক করছে যারা, সেই 'শোচতো জনান্' শোকাহত মানুষদের তিনি দেখেন 'ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্বান্ প্রাজ্ঞোহনুপশ্যতি—(সমাধিপাদ ৪৭)। শৈলস্থ, শিখরস্থ পুরুষ, মাটিতে যারা চলছে ফিরছে তাদের যেমন দেখে, সেই প্রাজ্ঞ পুরুষ শোক-মোহের পারে দাঁড়িয়ে শোকসাগরে নিমগ্ন জনগণকেও তেমনিভাবে দেখেন। তাই এই দর্শন ফোটে তখনই যখন মানুষ মান-মোহ থেকে মুক্ত হয়, সঙ্গ-দোষকে জয় করে, কামনা থেকে নিবৃত্ত হয়, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব থেকে বিযুক্ত হয়—এক কথায়, যখন 'অমূঢ়' হয়, মোহের ঠুলি যখন খসে যায় চোখ থেকে। শ্রীভগবান তাই বলছেন, তারাই দেখতে পায়, যারা—

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।। ৫।।

এইরূপে সমস্ত সঙ্গ থেকে মুক্ত হলে তবেই এই দর্শন ফোটে। তখন সে বুঝতে পারে এই দেহের মধ্যে, এতে অধিষ্ঠান করে কে এই খেলা করছেন।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।। ৯।।

এ তো বিষয়কে উপসেবন, উপভোগ করবার জন্য আমি এই পোশাকটা নিয়েছি। এই পোশাক গ্রহণ করবার মানে হচ্ছে দেহইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হওয়া। আমি বিষয়কে ভোগ করবার জন্যই এইভাবে অধিষ্ঠিত হই। আমাকে কোথাও বেড়াতে যেতে হবে তখন আমি আমার মোটরগাড়িতে অধিষ্ঠিত হই। মোটরটাই তো আমার স্বরূপ নয়, সেটা বিচরণ বা বিহারের একটা যন্ত্র মাত্র। সেটাতে অধিষ্ঠিত হয়ে আমি নানা দৃশ্য উপভোগ করি ও বেড়ানো শেষ হলে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি ফিরে যাই। তেমনি দেহতে অধিষ্ঠিত হয়ে এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের রাজ্যে বিচরণ করি, ভোগ করি বিষয়। ভোগ করে সে

কাজ চুকে গেলে তারপর যখন খুশি দেহযন্ত্রকে এখানেই ফেলে দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাই। কিন্তু বিমূঢ় যারা তারা তা দেখতে পায় না ঃ

উৎক্রামন্তং স্থিতং ব্যপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।। ১০।।

দেহে থাকাকালে কে ভোগ করলেন এত সুখ-দুঃখ, কে-ই বা দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন, এই তাঁর আসা-যাওয়া জ্ঞানী ছাড়া কেউ তা দেখতে পায় না, 'বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি'। 'অমূঢ়া'রা দেখেন 'বিমূঢ়া'রা দেখতে পায় না। এই যে আমি কথা বলছি, চলছি-ফিরছি, এসব চলাফেরা বলা-কওয়ার মধ্যে কে যে চলছেন-ফিরছেন, তাঁকে কোনোদিনই খুঁজলাম না। উপনিষদ বলেছেন, 'আরামম্ অস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন'।* 'আরাম' মানে গৃহ বা বাড়ি যেখানে তিনি বিরাজ করছেন, যে দেহের মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান। তাঁর সেই বাড়ি আমরা সকলে দেখলাম, কিন্তু বাড়ির মালিককে তাঁর থাকাকালে কেউ দেখতে পেল না, 'ন তং 'পশ্যতি' কশ্চন'। একটি 'পশ্যন্তি' বহুবচন আর একটি 'পশ্যতি' একবচন। আবার যখন খুশি বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে চলে যান, তখন হায় হায় পড়ে যায়, কান্নাকাটি পড়ে যায়। কিন্তু তিনি থাকতেও তাঁকে চিনলাম না, বেরিয়ে যেতে দেখেও ধরতে পারলাম না। কিন্তু 'পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ'। এজন্যই বলেছেন তাঁকে কে চিনতে পারে? যাঁরা 'কৃতাত্মা', যাঁরা শুদ্ধাত্মা। নইলে শত চেষ্টা করেও যারা অকৃতাত্মা, অশুদ্ধাত্মা তারা তাঁকে চিনতে পারে না। সেইজন্য যখন এই দৃষ্টি খোলে তখন দেখা যায় জগতে যা কিছু আলো দিচ্ছে সে সবই তাঁরই আলো ঃ

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।। ১২।।

সূর্যের যে তেজ, চন্দ্রের যে তেজ এবং সমস্ত চরাচরে যা-কিছু তেজ বা প্রকাশ রয়েছে সবকিছুর মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে তিনিই বিরাজিত। তাছাড়া—'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো' (১৫)। শুধু বাইরের আলোই নয়, অন্তর আলো করে তিনিই বিরাজিত। তাই বলছেন, সকলের হৃদয়ে সম্যকরূপে আমিই নিবিষ্ট, আমিই অধিষ্ঠিত। পৃথিবীতে আবিষ্ট হয়ে তিনি ওজঃরূপে সব ভূতকে ধারণ করে আছেন, আবার রসরূপে সব ওষধি শস্যসম্পদকে তিনিই পোষণ করছেন। আর সে-সবের ভোক্তারূপে প্রাণিগণের দেহে বৈশ্বানর অগ্নিরূপেও

*বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪। ৩। ১৪

তিনিই অধিষ্ঠিত। তাই ধারণ, পোষণ, পরিণমন, সবকিছুর মূলেই তিনি। এইরূপে তাঁকে তখন চেনেন যাঁরা 'জ্ঞানচক্ষুষঃ', যাঁরা 'কৃতাত্মা'।

অর্জুনকে বলছেন, সমগ্রভাবে আমাকে জানতে হলে জানতে হবে 'পুরুষ' বা চৈতন্যরূপে। আমার তিনটি রূপ! তোমাকে দেখিয়েছি ক্ষররূপ একাদশ অধ্যায়ে, তারপর বর্ণনা করলাম অক্ষররূপ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ করে। তখন তোমার খটকা লাগল, ক্ষেত্র একটা আলাদা জিনিস আর ক্ষেত্রজ্ঞ একটা আলাদা জিনিস, একদিকে পরিণাম, আর একদিকে অপরিণাম। এই দুইকে মিলাই কি করে? এই দেখো, দুইকেই আমি ধারণ করে রয়েছি। কী রূপে? পুরুষোত্তমরূপে।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।। ১৭।।

এই সমস্ত ত্রিলোকের যে ব্যয়শীল, ক্ষয়শীল নানা খেলা, এই ক্ষররূপ এ সবকিছুকেই যিনি অব্যয়, অক্ষর থেকেও উত্তম ঈশ্বররূপে ধারণ করে রয়েছেন, ভরণ করে রয়েছেন, সেই ঈশ্বর, সেই পরামাত্মা বা উত্তম পুরুষই হল আমার পুরুষোত্তম রূপ। তাই বলছেন ঃ

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।। ১৮।।

এই শ্লোকটির বিশেষ এক রহস্য রয়েছে। ভগবান দেখাচ্ছেন যে পুরুষোত্তমরূপে তিনি ক্ষরের অতীত, কারণ তিনি পরিণামগ্রস্ত হচ্ছেন না। সেইজন্য ক্ষরের বেলায় তিনি বললেন, ক্ষরের আমি 'অতীত'। অক্ষরের বেলায় বললেন না, যে অক্ষরেরও আমি অতীত। কেননা অক্ষরও যা তিনিও তাই। অক্ষরকে তিনি অতিক্রম করে যাচ্ছেন না, তবে অক্ষরের চেয়ে তিনি আর একটু 'উত্তম'। তাঁর এই উত্তমতা বা শ্রেষ্ঠতা কোথায়? তিনি ক্ষরকে নিজের বুকের মধ্যে ধারণ করেছেন। ক্ষর থেকে বিলক্ষণ হয়ে তিনি অক্ষর হননি। ক্ষর থেকে আলাদা হয়ে কূটস্থ হয়ে তিনি অক্ষর নন। অক্ষরের চেয়ে তাঁর উত্তমত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে লোকত্রয়ে আবিষ্ট হয়ে তাকে ভরণ করেও তিনি অক্ষর। সেইজন্য 'অক্ষরাদপি চোত্তমঃ'। এইরূপে যিনি তাকে জানেন—

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত।। ১৯।।

এই পুরুষোত্তমকে আমায় চিনতে হবে। আমার মধ্যেই পুরুষ অর্থাৎ, আত্মার তিনটি অবস্থা আছে। আমার একটা অবস্থা নিরন্তর রূপান্তরিত হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে, চেতনার এই একটি রূপ। আরেকটি, চেতনার অপরিবর্তিত

রূপ। তৃতীয় আর একটি রূপ হচ্ছে এই পরিবর্তিত রূপ এবং অপরিবর্তিত রূপ, দুটোই যার লীলামাত্র, দুটো যার pole, দুটি প্রান্ত, 'যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ',* যার দুটোকে নিয়ে দুই ভঙ্গিতে তিনি লীলা করছেন। একদিকে কূটস্থ অচল হয়ে আছেন, অন্যদিকে পরিণামের স্রোতে, অবিরাম পরিবর্তনের ধারায় নিজেকে রূপান্তরিত করছেন, নিজেকে বিপরিবর্তিত করছেন। এই উভয়কে যিনি ধরে রেখেছেন তিনি পুরুষোত্তম। এইজন্য ত্রিকোণের ঊর্ধ্ববিন্দু, সে যেমন নিচের দুটি বিন্দুর মধ্যে দিয়ে নিজেকে বিপরিবর্তিত করে, তেমনিভাবে সৃষ্টির এই ত্রিকোণের মধ্যে সকলের ঊর্ধ্বে রয়েছেন পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তমের দুই প্রান্তে দুইটি রূপ, একটি হল অক্ষর রূপ, আর একটি হল ক্ষররূপ। এই রূপে যে তাকে জানে সে-ই 'স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত'। সে হল তখন সর্বের জ্ঞাতা, অর্থাৎ ক্ষর-অক্ষর উভয় রূপ এবং পুরুষোত্তম রূপ, সবকিছুই সে জেনেছে, তাই সে তখন তাঁকে সর্বভাবে ভজনা করে।

যজনার পরে ভজনার যে সূচনা করেছিলেন, ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে, এইখানে এসে তার পরাকাষ্ঠা। সর্বভাবে ভজন তখনই হয়, যখন এই পরম বোধস্বরূপ যিনি, সবকিছু পরিণামকে নিজের অখণ্ড বোধের মধ্যে ধারণ করে রেখেছেন যিনি, সেই সুতো দিয়ে গাঁথছেন যিনি মালা, অর্থাৎ অখণ্ড চেতনার সূত্রে, তাঁকে যখন জানতে পারি, তখনই তাঁর সর্বভাবে ভজনা হয়। এই হল গুহ্যতম শাস্ত্র, যা তিনি অর্জুনকে শেখালেন। যে রাজগুহ্য অনুশাসনের সূচনা করেছিলেন নবম অধ্যায়ে, এখানে এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান তারই উপসংহার করলেন। এটি যদি কেউ জানতে পারে, এটি যদি কেউ শিখতে পারে তাহলেই তাকে যথার্থ বুদ্ধিমান বলা যায় ঃ

এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।। ২০।।

তাই আমরা যদি কৃতকৃত্য হতে চাই তাহলে এই পুরুষোত্তমের অনুসন্ধান করতে হবে। গীতার সূচনায় আমরা যে দেবতার মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম সেই দেবতার দর্শন করতে গিয়ে প্রথম গর্ভগৃহে প্রবেশ করে দেখলাম যে দেবতার যেন এক অসহনীয় দ্যুতি, 'তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্' (১১/১৭)। দেখেছি এক চোখ ঝলসানো আলো, 'দ্যুতিমপ্রমেয়ম্' (১১/১৭)। সে আলোর বা দ্যুতির দিকে তাকানো যাচ্ছে না, 'দুর্নিরীক্ষ্যম্ সমন্তাৎ' (১১/১৭)। তারপর দেখলাম, এই ঘোর রূপের পিছনে তারই মধ্যে রয়েছে এক পরম শান্তরূপ। তার মধ্যে কোন রূপান্তর নেই, পরিণাম নেই।

*ঋগ্বেদ ১০। ১২১। ২

তখন তার শান্ত রূপ, শিব রূপ, অঘোর রূপ দেখতে পেলাম। এইজন্য শিবের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে, তাঁর একটা হল রুদ্র রূপ, ঘোর রূপ, আর একটা হল অঘোর রূপ, শান্ত সৌম্য রূপ। উপনিষদে, বেদে, তার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে ঃ

রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

তোমার দক্ষিণ মুখ দিয়ে আমাকে রক্ষা করো। তোমার বাম মুখ দেখিয়ো না, আমার প্রতি বিমুখ হয়ো না, ভয়ংকর রূপ দেখিও না।

সেই দেখেছিলাম একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বদেবতার এক ভয়ংকর রূপ, ক্ষেত্রের মধ্যে তার পরিণামের রূপ, সর্বগ্রাসী কালের করাল রূপ। আর ত্রয়োদশে ক্ষেত্রজ্ঞ দেবতাকে দেখলাম কালাতীত, শান্ত, স্নিগ্ধ, সৌম্য রূপে। একটি তার শক্তিরূপ, ক্ষররূপ, আর একটি তার শিবরূপ, অক্ষররূপ। আর এখন শিবশক্তি সমাযোগে ক্ষর-অক্ষরের মিলনে তিনি পুরুষোত্তম রূপ।

তারপর আরো যখন অন্তঃস্থলে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম তিনি নিজেকে বাইরের এই দুটি রূপ দিয়ে পরিণাম ও অপরিণাম দিয়ে, ঘিরে রেখেছেন। আমার চোখ তখন ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি শান্তরূপও যা ঘোররূপও তাই। সেই শান্তরূপের উৎস থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার এই অনন্ত উচ্ছল স্রোতের ধারা। উপনিষদ্ যেমন বলছেন—সেই এক অগ্নি থেকে যেমন তার অনন্ত বিস্ফুলিঙ্গ 'ব্যুচরন্তি', বিচ্ছুরিত, নিঃসৃত হয়, তেমনি এই মহাভূতের থেকে এই অসংখ্য ভূতের নিঃসরণ চলেছে নিরন্তর। তখন দেখতে পাই, সেই এক পরম কেন্দ্রে তিনি বসে আছেন এবং সেই কেন্দ্র থেকে অগ্নিশিখার মতো অনন্ত স্ফুলিঙ্গ বা ছটা নিঃসৃত হচ্ছে নিরন্তর। গুণের বা পরিণামের ধারা তার থেকেই 'প্রসৃতা পুরাণী', (৪) আবার গুণাতীতরূপে তিনিই 'পদমব্যয়ং তৎ' (৫)। সেই 'তৎ' বা অনির্দেশ্য পরম রূপকে চেনানো হ'ল পঞ্চদশে।

এরপর শেষ কয়েক অধ্যায়ে সব কিছুর বিভাগ বা বিশ্লেষণ ক'রে ক'রে ভগবান এইসব তত্ত্বকে আরও বিশদ করে বুঝিয়ে গুণাতীত ভূমির সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়ে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সেই পুরুষোত্তমে শরণাগতির মন্ত্রটি দিয়ে শেষ করবেন। এক হিসেবে গুহ্যতম কথা পঞ্চদশ অধ্যায়েই বলা শেষ হয়ে গেল পুরুষোত্তমের পরিচয়ের মধ্যে।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ

পঞ্চদশেই গীতার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত, যেহেতু সেখানে পুরুষোত্তম তত্ত্বের প্রতিপাদন এবং আমূল সংসারবৃক্ষের বর্ণন সবই করা হয়েছে। কিন্তু এখনও ষোড়শ কলায় পূর্ণতা বাকি আছে। সেইটিই মূল কলা, আদি কলা, অমা কলা বা নির্বাণ কলা, যাকে নিত্যা ষোড়শী কলা বলেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে! সেই কলাটির উদয়-অস্ত, ক্ষয়-ব্যয় কিছুই নেই। শ্রীভগবান অর্জুনকে নিয়ে যেতে চান সেই নিত্য স্থিতিতে, যেখান থেকে আর চ্যুতি বা স্খলনের ভয় নেই। কিন্তু সেখানে কিছুতেই পৌঁছন যাবে না যতদিন গুণের রাজ্য অতিক্রম না করা যাবে, গুণাতীত না হওয়া যাবে। এখন শেষের তিন অধ্যায়ে শ্রীভগবান তাই এই গুণত্রয়কে তন্ন তন্ন করে প্রতি বস্তুতে সুস্পষ্টভাবে চিনিয়ে দিয়ে সেই গুণের নাগপাশ থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করবেন।

আমরা দেখেছি গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ আরম্ভ হয়েছে অর্জুনের শোক-মোহকে উপলক্ষ্য করে। এই শোক-মোহের মূলে আছে রাগ-দ্বেষ। তাই শ্রীভগবান সেই রাগ-দ্বেষের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় হিসাবে দুটি প্রধান ভূমি বা অবস্থান বর্ণনা করেছেন। একটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের ভূমি, আর একটি দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের ভূমি বা অবস্থা। আমরা দেখেছি স্থিতপ্রজ্ঞের ভূমিতে 'সর্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি' (২/৫৫)। কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ রাগ বা আসক্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। কিন্তু দ্বেষ তখনো নির্মূল হয় না। ভক্তের ভূমিতে আরূঢ় হলে মানুষ হতে পারে 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্' (১২/১৩) পরম প্রেমে সকলের আত্মভূত হতে পারলে, সকলকে নির্বিচারে আপন বলে মনে করতে পারলেই কারুর উপর আর দ্বেষ থাকে না, কারণ আমরা কখনো নিজেকে নিজে দ্বেষ করি না। আমার বাইরে বা আমার থেকে আলাদা কেউ আছে যে আমার ক্ষতি করতে পারে, এই বোধ থেকেই দ্বেষ জন্মায়। ভক্তির ভূমিতে দ্বেষ থেকে মুক্তি পেলে আমরা নিশ্চিন্ত বা কৃতার্থ হতে পারি এই ভেবে যে রাগ-দ্বেষ যখন চলে গিয়েছে তখন পূর্ণ প্রাপ্তি বা চরম সিদ্ধির আর বাকি কোথায়?

শ্রীভগবান কিন্তু গুরুরূপে এখনো নিশ্চিন্ত হতে পারেন না কারণ তিনি তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখতে পান যে এখনো রাগ-দ্বেষের মূল উৎপাটন হয়নি। যেসব কারণ থেকে রাগ-দ্বেষের উদ্ভব, রাগ-দ্বেষ যা থেকে জন্মায়, সেই গুণের রাজ্য এখনও অতিক্রম করা হয়নি। গুণাতীত না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। অর্জুনকে তাই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভক্তের ভূমির পর এখন নিয়ে চলেছেন গুণাতীতের ভূমিতে। সেইখানে পৌঁছলেই পাওয়া যাবে 'নির্দোষং সমং'কে (৫/১৯)। তার আগে যে সমতাকে পাওয়া গিয়েছিল সে হল সদোষ, অর্থাৎ আবার যেকোনো কারণে আকস্মিকভাবে সে-সমতা হারিয়ে যেতে পারে। কারণ গুণই আনে বৈষম্য এবং গুণ কখনো একলা থাকে না, তিনজনে মেশামেশি জড়াজড়ি করে থাকে। এই তিন পাকে জড়ানো গুণের সূত্রে ত্রিভুবন বাঁধা রয়েছে। আজ যাকে দেখছি সাধু কাল সে হয়ে উঠতে পারে চোর বা দুর্বৃত্ত, অথবা কালকের দস্যু রত্নাকর আজ মহাকবি বাল্মীকি মুনি হয়ে যেতে পারে। তার কারণ আর কিছুই নয়, তিন গুণের খেলা। কখন কোন্ গুণ প্রধান হয়ে দেখা দেয় বলা যায় না।

গুণকে অতিক্রম করবার উপায় হল দৈবী সম্পদ বাড়ানো আর আসুরী সম্পদ কমানো। ষোড়শ অধ্যায়ে তাই ভগবান্ এই দুই সম্পদকে চিনিয়ে দিয়েছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে এ জগতে এই দুরকমের জীব সৃষ্ট হয়ে এসেছে চিরদিন, 'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্' (৬)—এক দৈব, অপর আসুর। উপনিষদেও আমরা 'দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ', প্রজাপতির এই দুই সন্তানের কথা শুনি। পুরাণে তো আরও বিস্তার করে এদের উৎপত্তির কথা শোনানো হয়েছে। একই কশ্যপের দুই পত্নী দিতি ও অদিতির গর্ভে জন্মেছেন দৈত্য এবং আদিত্য বা দেবগণ। আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বের মতো এদের চিরতরে দ্বন্দ্ব। উপনিষদ বলেছেন অসুর বা দৈত্যেরাই দলে ভারি, দেবতারা দুর্বল বা মুষ্টিমেয়, 'কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরা'।* সমস্ত সাধন-সংগ্রামটা হল এই দলে ভারি অসুরদের হটিয়ে দেবতাদের জয়ী করা, অন্ধকারকে দূর করে আলোর রাজ্য স্থাপন করা। এরই নাম Kingdom of Heaven দেবরাজ্য বা স্বর্গরাজ্য, রাবণকে পরাভূত করে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

লড়াই বা সংগ্রাম করতে হলে চাই রসদ বা সম্পদ। শ্রীভগবান তাই ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই পর পর তিনটি শ্লোকে (১-৩) এই দৈবী সম্পদের পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকের 'অদ্বেষ্টা

*বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৩/১

সর্বভূতানাং' দিয়ে যেমন ভক্তের লক্ষণ আরম্ভ করে দ্বেষশূন্যতাই তার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য বলে বোঝাতে চেয়েছেন, তেমনি এখানে গুণাতীতের ভূমিতে দৈবী সম্পদের পরিচয় দিতে গিয়ে গোড়াতেই 'অভয়ং' (১) শব্দটি বসিয়ে দিয়েছেন। মানুষ অভয় হতে পারে না, নিরাপদ নিশ্চিন্ত হতে পারে না যতদিন সে ব্রহ্মানন্দ লাভ না করে! তাই উপনিষদ বলেছেন ঃ

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।*

কারুর কাছ থেকে কখনো ভয় হয় না তারই যে অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, কারণ 'দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি,'** ভয় হয় দ্বিতীয়ের কাছ থেকে। অর্থাৎ আমার বাইরে অপর কেউ আছে যে আমার ক্ষতি করতে পারে, এই বোধ থেকেই ভয়ের জন্ম বা উৎপত্তি! যেখানে আমার বাইরে আর কিছু নেই, সবই আমার অন্তর্ভূত, সেই ব্যাপ্ত চেতনার অনুভূতির নামই ব্রহ্মানন্দ। সেই আনন্দ পেলে, কায়াকে চিনলে দ্বিতীয়ের ছায়া মিলিয়ে যায়, ভয় চলে যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতো তখনই বলা যায় 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি,' তুমি অভয় লাভ করেছ, হে জনক!

দৈবী সম্পদের প্রারম্ভে শ্রীভগবান 'অভয়ং' শব্দের দ্বারা অর্জুনকে এই অদ্বয় স্থিতির ইঙ্গিত দিলেন। এরই ফলে আমাদের মৌল সত্তা অর্থাৎ দেহপ্রাণ মন সম্যক শুদ্ধ হয়ে যায়, যার নাম সত্ত্বসংশুদ্ধি। আমরা উপর উপর শুদ্ধ হই যখন রাগ-দ্বেষকে নিয়ন্ত্রণ করি বা বশে রাখি, কিন্তু আমাদের সত্ত্বের বা উপাদানের সম্যক শুদ্ধি হয় না যতক্ষণ আমরা ব্রহ্মের অভয়ে ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারি। সত্ত্বসংশুদ্ধি হলেই দেখা দেয় 'জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি,' (১) তখন জ্ঞানের ভূমিতেই হয় সহজ অবস্থান বা প্রতিষ্ঠা। আর সেখান থেকে বিচ্যুত হতে হয় না কোনোদিন।

কিন্তু এই 'সত্ত্বসংশুদ্ধি' ঘটতে পারে না, 'জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি'ও লাভ হয় না, যদি না আর পাঁচটি দৈবী সম্পদের নিরন্তর অনুশীলন করা যায়। এই পাঁচটি হল 'দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ' (১)। ষোড়শ অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে প্রথম ছত্রে শ্রীভগবান দৈবী সম্পদের সিদ্ধির ফলে যে গুণগুলি ফুটে ওঠে তারই পরিচয় দিয়ে দ্বিতীয় ছত্রে যেন সেই দৈবী সম্পদের সাধনার

*তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৯, ২/৪
**বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১/৪/২

অঙ্গগুলি নির্দেশ করলেন। 'অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ,' (১) এই সিদ্ধিত্রয়ের মূলে আছে সাধনপঞ্চক। সাধন মানেই ক্রিয়া। এই পাঁচটি দৈবী সম্পদ তাই ক্রিয়ামূলক অর্থাৎ অনুষ্ঠান বা আচরণের বিষয়। পাঁচটিই আবার এক হিসাবে ত্যাগমূলক। 'দান' হল ধনসম্পদ ত্যাগ, 'দম' হল ইন্দ্রিয়ভোগ ত্যাগ, 'যজ্ঞ' হল দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগ 'স্বাধ্যায়' হচ্ছে শাস্ত্র ছাড়া অন্য সব চিন্তা ত্যাগ, আর 'তপস্যা' হল সমস্ত কামনা ত্যাগ।

লক্ষ্য করবার বিষয়, পাতঞ্জল যোগদর্শনে সাধনপাদের প্রারম্ভে যে ক্রিয়াযোগের উপদেশ করা হয়েছে, সেখানেও এই তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান তিনটি বিষয়ই বলা হয়েছে। অন্যত্র আর এক উপনিষদে বলা হয়েছে, তাঁর সৃষ্ট তিন জীবকে, দেব, দানব ও মনুষ্যকে একটি অক্ষর 'দ' দিয়েই উপদেশ দিলেন, যেটি মেঘের গর্জনে যেন ধ্বনিত হয়ে চলেছে আজও এবং সবাইকে সজাগ করছে—দ-দ-দ অর্থাৎ দম, দান ও দয়া। দেবতারা পাছে স্বর্গীয় ভোগে গা ভাসিয়ে দেন, তাই তাঁদের 'দম' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করতে বললেন। মানুষ পাছে স্বার্থে মগ্ন হয়ে পড়ে তাই তাদের 'দান' করতে শেখালেন উদারতা আনবার জন্য, আর ক্রুর নিষ্ঠুর দানবদের বললেন 'দয়া'র অনুশীলন করতে।

যাহোক, এখানে শ্রীভগবানও সাধককে লক্ষ্য করে এই 'দানং', 'দমঃ' ও 'দয়া'র সম্পদ অর্জন করতে বলেছেন যার ফলে তার জীবন 'আর্জব' অর্থাৎ ঋজুতা বা সরলতা, অহিংসা, সত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হয়। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, দৈবী সম্পদ ও আসুরী সম্পদের প্রধান পার্থক্য বা বৈলক্ষণ্য। সেই পার্থক্যটা কী? প্রথমটির মধ্যে ফুটে ওঠে 'মার্দবং হ্রীরচাপলম্' (২) অর্থাৎ কোমলতা, লজ্জা, অচপলতা, আর দ্বিতীয়টির মধ্যে ঠিক বিপরীতভাবে 'দম্ভো দর্পো অভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ' (৪) অর্থাৎ যতকিছু রুক্ষতা, নিষ্ঠুরতা, উগ্রভাবের উদ্ধত প্রকাশ। সঙ্গে সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে দৈবী সম্পদের প্রধান লক্ষণ স্বভাবের কোমলতা হলেও তা কিন্তু তেজোহীন নয়। মহাকবি কালিদাস তাই তাঁর অমর নাট্যকাব্য 'শকুন্তলা'য় নায়ক দুষ্যন্তের মুখে সাধু মুনি তপস্বীর স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন ঃ

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।

তপোধন অর্থাৎ তপস্বীরা শমপ্রধান বা শান্তস্বভাবেরই হয়ে থাকেন কিন্তু তাঁদের অন্তরে গূঢ় বা গোপন হয়ে আছে এক সর্বদাহকারী তেজ, যা সব ছারখার করে দিতে পারে। এই তেজ তাঁদের তপস্যাসম্ভূত তেজ। আমরা মনে করি সাধুরা মেরুদণ্ডহীন নিরীহ শান্ত জীব, কিন্তু যথার্থ সাধু তিনিই যাঁর মধ্যে

ফুটে ওঠে ব্রহ্মবর্চসের অমিত দীপ্তি, অসীম তেজ। সন্ন্যাসীর এই সিংহবিক্রমকে লক্ষ্য করেই তাঁকে বলা হয় 'বেদান্তকেশরী'। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষ এই বীর সন্ন্যাসীর আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্লীব ও নির্জীব হয়ে পড়েছে। এ যুগে প্রথম স্বামী বিবেকানন্দ এবং পরে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ সন্ন্যাসীর এই দীপ্ত ছবি আবার লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই তাঁরা নমস্য।

ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান দৈবী সম্পদের মূল গুণগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনটি শ্লোকে (১-৩) দিয়ে সপ্তম শ্লোক থেকে বিস্তৃতভাবে আসুরী সম্পদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন প্রায় অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত (৭-২০)। যেগুলিকে পরিহার করতে হবে বা এড়িয়ে চলতে হবে, সেগুলিই ভালো করে চিনে রাখা দরকার। তাই শ্রীভগবান এমন বিস্তৃতভাবে আসুরী সম্পদের বর্ণনা দিয়েছেন। আসুরী সম্পদ মানুষকে বেঁধে রাখে সংসারবন্ধনে, আর দৈবী সম্পদ মানুষকে মুক্ত করে। সেইজন্যই আসুরী সম্পদ ত্যাজ্য বা হেয় আর দৈবী সম্পদ হল গ্রাহ্য বা উপাদেয়। আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণ একথা বলার তাৎপর্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন শ্রীভগবানের মুখ থেকে আমরা বিশদভাবে একে একে তার লক্ষণগুলি শুনি বা জানি।

বন্ধন হল তাই যা আমার বাইরে আর-কিছুকে স্বীকার করতে দেয় না, যেখানে 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে', যার সদম্ভ ঘোষণা ঃ 'কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া', (১৫) আমার মতো আর কে আছে? এইভাবেই 'স্বার্থ-প্রাচীর করে খাড়া, গড়ি মোরা আপন কারা'। তখন স্বভাবতই ঈশ্বরকে অস্বীকার করি। অনেকে ভগবানকে না মানার মধ্যে গৌরব বোধ করেন, বিশেষ করে আধুনিক যুগে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান ভগবানকে মানা বা না-মানা দ্বারা তিনি ছোটো বা বড়ো হয়ে যান না, তাঁর তাতে কিছুই এসে যায় না। আসলে এর দ্বারা ছোটো হই আমরা নিজেরাই। তার ফলে মনে করি, এ দুনিয়ায় সবই আমার কামনা চরিতার্থের জন্য আকস্মিকভাবে সৃষ্ট হয়েছে, এর পিছনে আর কেউ নেই বা এর অন্য কোনো উদ্দেশ্যও নেই ঃ

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্।। (১৬/৮)

তাইতো আমাদের এমন কথাও বলতে বাধে না যে আমিই তো ঈশ্বর, আমিই তো ভোগী, আমিই তো বলবান, ধনবান বা আমার মতো আর

কে-ই বা আছে?

ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।। ১৪।।
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।। ১৫।।

সবটাই তাই হয়ে দাঁড়ায় কামলীলা, 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা'র পরিপূর্তির সাধন বা উপায়। এইভাবেই সৃষ্ট হয় কংস, রাবণ, হিরণ্যকশিপু, মধু, কৈটভাদি, যারা—

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।। ১০।।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।। ৯।।

দুষ্পূরণীয় তাদের কামনা, যা চরিতার্থ করতে গিয়ে তারা জগতের ক্ষয় বা ধ্বংস করতেও পিছপা হয় না। কামনার উপভোগই তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই অপরিমেয় চিন্তাতেই তারা সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, হাজারো আশার পাশে আবদ্ধ হয়ে তাদের সমস্ত চেষ্টা তারা নিয়োজিত করে কামভোগের জন্য অন্যায়ভাবে ভোগ্যসঞ্চয়ে। আজ এটা পেয়েছি, কাল ওটা পাব, এইভাবে আশার কুহকে কামনার পিছনে পিছনে তারা ছুটে মরে। আজ ওকে, এই শত্রুকে মেরেছি, ভবিষ্যতে আর সব শত্রুদেরও নির্মূল করব, এমনি করে নিধন-যজ্ঞে, মারণলীলায় তারা মেতে ওঠে। জগতের সর্বনাশ-সাধনে হিংসাই হয় এই উগ্রকর্মাদের একমাত্র উপজীব্য, ঠিক বিপরীতভাবে যেমন অহিংসা, দয়া, ক্ষমা হল দৈবী সম্পৎশালীর স্বাভাবিক ধর্ম।

আসুরী সম্পদের এই বর্ণনা দিয়ে শ্রীভগবান এমনভাবে সেই নরাধমদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন যাতে তাদের চিনতে ভুল না হয়, যদিও তারা 'ধনমানমদান্বিতা' (১৭) হয়ে ধর্মের ভেক ধরে ধূমধাম করে নাম-যজ্ঞের আয়োজন করে এবং লোককে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করে। নিজের এবং পরের দেহে আত্মার অবমাননাকারী এই মূঢ়দের শ্রীভগবান জন্মে জন্মে আসুরী যোনিতেই ঠেলে দেন এবং তার ফলে তারা কোনোদিনই তাঁকে লাভ করতে পারে না, কেবল অন্ধকারের অতলেই তলিয়ে যেতে থাকে অধোগতিতে। সবশেষে তাই শ্রীভগবান নরকে তলিয়ে যাবার তিনটি দুয়ার চিনিয়ে দিলেন ২১ শ্লোকে, যাতে অর্জুনের মতো সাধকমাত্রেই সর্বদা এই দ্বারত্রয়কে সযত্নে পরিহার করে চলতে পারেন, যদি তাঁরা আত্মনাশ থেকে নিজেদের বাঁচাতে চান।

আমরা স্মরণ করতে পারি, গীতার উপদেশ আরম্ভ করবার সময়েই শ্রীভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে একটি শ্লোকে মূল শত্রুকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন 'কাম

এষ ক্রোধ এষ' (৩।৩৭) বলে। এখানে তার সঙ্গে লোভকে যুক্ত করে নরকের তিনটি দুয়ার, সর্বনাশের তিনটি পথ আবারও চিনিয়ে দিলেন। কাম প্রতিহত হলেই ক্রোধ দেখা দেয়, ইচ্ছা পূরণ না হলেই বা চরিতার্থ করা সম্ভব না হলেই আমরা রেগে আগুন হই। আবার কামনা চরিতার্থ হলেই, বার বার সেই কামনার বস্তুকে আস্বাদন করার তৃষ্ণা জাগে, যার নাম লোভ। এইভাবে আরও বেশি করে সবকিছু পেতে চাই, এই সামান্য টাকা পেয়ে তৃপ্তি নেই, আরও টাকা চাই, বাড়ি-গাড়ি চাই, ভোগের নিত্য নতুন উপকরণ চাই। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।

এ যে 'দুষ্পুর অনল', এ আগুনকে পূরণ করা যায় না, এ 'অনল' অর্থাৎ 'অলং পর্যাপ্তিং তৃপ্তিং ন গচ্ছতি', কোনোদিন কিছুতেই এর পর্যাপ্তি, তৃপ্তি নেই। ঈশোপনিষদের ঋষি তাই প্রথম মন্ত্রেই সাধককে সাবধান করে দিয়েছেন ঃ 'মা গৃধঃ', greed বা লোভ কোরো না। ভারতবর্ষ তাই চিরদিন ত্যাগকে বরণ করেছে স্বেচ্ছায়, তাকেই চিনেছে অমৃতের পথ বলে, 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা', 'ত্যাগেন অমৃতত্বমানশুঃ'।

আসুরী সম্পদ এত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা এবং নরকের বা বিনাশের তিনটি পথকে এভাবে চিনিয়ে দেবার উদ্দেশ্য হল মানুষকে উপলব্ধি করানো যে এই 'তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ' (২২), এই তিনটি অন্ধকারের দুয়ার থেকে নিজেকে মুক্ত করাই হল তার সর্বপ্রধান কর্তব্য। অন্ধকারে যা টেনে নামায় তার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলে তবেই আলোর পথ ধরা যায়, নিজের শ্রেয় বা মঙ্গল সাধন করা সম্ভব হয় ঃ

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।। ২২।।

আমাদের অনেকের মধ্যে শ্রেয়োলাভের সদিচ্ছা জাগে, আমরা অধ্যাত্মপথের পথিক হই, দীক্ষা নিই, জপতপ করি, কিন্তু প্রেয়ের পথ, আত্মবিনাশের পথকেও সমানভাবে আঁকড়ে ধরে থাকি। এই দু নৌকোয় পা দেবার ফলে আমাদের কোনো অগ্রগতিই সম্ভব হয় না, দোলায়মান নৌকার শেষকালে মাঝদরিয়ায় ভরাডুবি হয়! নিজের খেয়ালমতো যে চলে, 'বর্ততে কামকারতঃ' (২৩), কামনা-বাসনার প্রেরণায় যে চলে, সে কোনোদিন সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, সে না পায় সুখ, না পায় স্বস্তি, না পায় পরা গতি।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।। ২৩।।

এই কারণেই সাধনা আমাদের বিফল হয়ে যায়।

নিজের খেয়ালে, আবেগের বশে অর্জুন যুদ্ধ থেকে বিরত হতে চাইছেন। তাই শ্রীভগবান যুদ্ধ করা উচিত না অনুচিত, কার্য শ্রেয় না অকার্য শ্রেয়, এই বিষয়ে শাস্ত্রের প্রমাণ, শাস্ত্রের বিধান জানবার এবং তদনুযায়ী কাজ করবার উপদেশ দিলেন সব শেষের শ্লোকে ঃ

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।। ২৪।।

ভারতবর্ষের সাধনায় এইজন্যই শাস্ত্রের স্থান সবার উপরে। আমাদের সংস্কৃতি বৈদিক সংস্কৃতি এবং সেই বেদ অপৌরুষেয়, কোনো পুরুষ বা মানুষের মতবাদ নয়। কোনো মানুষ, তিনি যত বড়োই হোন না কেন, তিনি নিজের সংস্কার বা মনের ছাঁচেই সত্যকে উপলব্ধি করে থাকেন। এইজন্যই তাঁর জ্ঞানে সব সময়েই একটা সীমা বা সংকীর্ণতা থাকতে বাধ্য। ভারতবর্ষ তার জ্ঞানে কোনো সীমা টানতে চায়নি, সংকীর্ণতা আসতে দেয়নি। তাই সে বিশুদ্ধ, সংস্কারমুক্ত, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপ্রমাণ, স্বতঃপ্রমাণ বেদকে সকলের উপরে স্থান দিয়েছে। এ দেশে নাস্তিক তাকেই বলা হয় যে বেদ মানে না, 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ'। ভগবানকে না মানো তাতে ক্ষতি নেই, সেজন্য তুমি নাস্তিক বলে চিহ্নিত হবে না, কিন্তু বেদকে মানা চাই। ভগবানের অস্তিত্বও নির্ভরশীল এই বেদের উপর, 'তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তম্'। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমান বা যুক্তি দিয়েও সিদ্ধ করা যায় না, শুধু আগম বা শাস্ত্র থেকেই তাঁর উপলব্ধি হতে পারে।

কিন্তু শাস্ত্র মানব কেন? শাস্ত্রের উপর আমরা খড়্গহস্ত। শাস্ত্র মানাটা কি বিচার-বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেওয়া নয়? জানার বদলে শুধু মানা কি নিজের চিন্তার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ নয়? এইসব নানা যুক্তি আমরা খাড়া করি শাস্ত্রকে বাতিল করবার জন্য, তার অনুশাসনকে না মানার জন্য। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি বা বিচার যে সব সময় কলুষিত তিন গুণের দ্বারা তা আমরা উপলব্ধি করি না। গুণের রঙে রাঙিয়ে আমরা সব জিনিসকে দেখে থাকি, তাই তত্ত্বজ্ঞান আমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না।

অর্জুনের মন এখন মোহের রঙে রঞ্জিত, তাই তিনি দেখছেন আত্মীয়স্বজন বধ করা অনুচিত এবং তার স্বপক্ষে অনেক জোরালো যুক্তিও খাড়া করেছেন, যা আমরা শুনেছি প্রথম অধ্যায়ে ৩১ থেকে ৪৫ শ্লোকে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েও ৪ ও ৫ শ্লোকে। আমরা সেই যুক্তি শুনে অর্জুনের মহানুভবতাকে বাহবা দিয়ে

থাকি, যিনি আত্মীয়স্বজনকে বধ করে নিজে স্বার্থপর হয়ে রাজ্যভোগ করতে চান না, বরং সব ছেড়ে অরণ্যে গিয়ে ভিক্ষা করে খেতে চান। কিন্তু এই ভিক্ষাবৃত্তির পিছনে যে দৈন্য, যে ক্লৈব্য প্রকাশ পেয়েছে, তা একমাত্র শ্রীভগবানের দিব্য দৃষ্টিতেই ধরা পড়ল। তিনি ত্রিগুণের বাইরে থেকে, গুণাতীত ভূমি থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে বুঝলেন অর্জুন স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন মোহবশে এবং ক্ষত্রিয় তাঁর সেই স্বধর্ম হল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। সে হিসাবে দুষ্ট যদি তাঁর আত্মীয়-স্বজনও হয়, নিজের পুত্র, কলত্র, গুরু, পিতামহও হয়, তবু নিরপেক্ষভাবে তাকে দণ্ড দিতে হবে, সে-অন্যায়ের প্রতিবিধান তাঁকে করতে হবে।

গুণের রাজ্য থেকে গুণাতীত রাজ্যে না যাওয়া পর্যন্ত এই 'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ' (১৮/৫১) হওয়া যায় না, যার কথা শ্রীভগবান উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে শোনাবেন। যতদিন সে-বুদ্ধি লাভ না হয়, যতদিন আমরা গুণের নাগপাশে আবদ্ধ, ততদিন শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বন। সদ্‌গুরু, সদাগম ও সৎতর্ককে আশ্রয় করেই গুণের রাজ্য ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তখন আর শাস্ত্রের কোনো প্রয়োজন থাকবে না, 'সর্বতঃ, সংপ্লুতোদক' অবস্থায় বেদও ভেসে যাবে, বিধি-নিষেধের পারে গিয়ে তখন উপলব্ধি হবে—

নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।

সেই নিস্ত্রৈগুণ্য বা গুণাতীত ভূমিতে নিয়ে যাবার জন্যই গুণের বিস্তৃত পরিচয় ও তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ নির্দেশ করবেন শেষের দুই অধ্যায়ে।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার তিনটি শিখর ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ, ভক্ত ও গুণাতীত। আমরা দুটি শিখর অতিক্রম করে তৃতীয় বা শেষ শিখরে উপনীত হলাম। রাগের রক্তিমা, কামনার কালুষ্য থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি স্থিতপ্রজ্ঞের ভূমিতে, দ্বেষের দূরপনেয় কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছি ভক্তের অবস্থায়, এখন শেষ দূর করতে হবে অভিনিবেশ, দেহাভিমান, জীবত্বভাব। এই অভিনিবেশ, মিথ্যা অভিমান আমাদের ঘিরে ধরেছে গুণের সঙ্গে আমাদের তাদাত্ম্যের ফলে। শ্রীভগবান এখন উপসংহারে ভক্ত অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে আমাদের নিয়ে যেতে চাইছেন গুণের পারে।

আগের ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান দেখিয়ে দিয়েছেন কবির ভাষায় যাকে বলা যায়—

'জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা, পরস্পরে রাঙায় চোখ,
পুণ্য-সেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রুর হোক্।'

দৈব ও আসুর সম্পদের বিভাগ করে চিনিয়ে দিয়েছেন বিশেষ করে আসুর সম্পদকে, যার দরুণ মানুষ 'পতন্তি নরকেহশুচৌ' (১৬। ১৬) এবং 'জন্মনি জন্মনি মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্' (১৬। ২০)। আত্মোদ্ধারের জন্য তাই সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রয়োজন দৈবী সম্পদের আহরণ এবং আসুরী সম্পদের বর্জন। সম্পদের এই দুটি বিভাগের মূলে আছে ঐ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা প্রকৃতির তিনটি গুণ। আমাদের কালোর ময়লা কাটিয়ে আলোয় ফুটে উঠতে হবে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে উত্তীর্ণ হতে হবে, যার জন্য ঋষিহৃদয়ের চিরন্তন প্রার্থনা ঃ 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'।

তিনটি গুণকে তাই আমাদের ভালো করে চিনতে হবে। শ্রীভগবান চতুর্দশ অধ্যায়েই এর সূচনা করেছেন 'গুণত্রয়বিভাগযোগ' দিয়ে, ত্রিগুণের সাধারণ-লক্ষণ ও পরিচয় জানিয়ে। আমরা সেখানে শুনেছি 'ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ' (১৪। ১৮), তাই ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে হলে আমাদের সত্ত্বকে অবলম্বন

করতে হবে। তারপর শেষ শিখরে পৌঁছলে সত্ত্বকেও অতিক্রম করে গুণাতীত হওয়া যাবে। শ্রীভগবান তাই এই উপান্তিম সপ্তদশ অধ্যায়ে সেই ত্রিগুণ কেমন করে জগতের সব বস্তুতে ও ভাবে ছেয়ে আছে, তার বিশদ পরিচয় দিচ্ছেন তন্ন তন্ন করে, যাতে মানুষ প্রত্যেকটি জিনিস থেকে বেছে নিতে পারে সত্ত্বকে এবং বর্জন করতে পারে রজঃ ও তমকে।

এই সপ্তদশ অধ্যায়টির নাম শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ, তার কারণ মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব গঠিত হয় তার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং তা সাধারণত তিন ধরনের ঃ 'সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ ইতি'। (২) তিনরকমের শ্রদ্ধার বর্ণনা দেবার আগে শ্রীভগবান একটি অতি মূল্যবান কথা শোনালেন অর্জুনকে তৃতীয় শ্লোকে ঃ

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।। ৩।।

মানুষ হল শ্রদ্ধাময়, যার যেমন শ্রদ্ধা সে-মানুষ তেমনি হয়। শ্রদ্ধাই মানুষের সবকিছুর নিয়ামক। যোগদর্শনে সমাধি লাভের যে সোপান-পরম্পরা রচিত হয়েছে, তার প্রথম ধাপ বা পাদপীঠ বা ভিত্তিই হল শ্রদ্ধা, 'শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্'। বেদান্ত-দর্শনেও শ্রদ্ধার পরেই উল্লিখিত হয়েছে সমাধান। 'শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-শ্রদ্ধা-সমাধানঞ্চ ইতি'। ভক্তিমার্গে বৈষ্ণব দর্শনেও 'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ অথ ভজনক্রিয়া'। তাই যে পথেই যাই, শ্রদ্ধাই হল মূল। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব তাই যথার্থই বলেছেন শ্রদ্ধার প্রসঙ্গে ঃ 'সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি'। জননীর মতো কল্যাণী এই শ্রদ্ধা যোগীকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যান যেন তাঁর স্নেহাঞ্চলে ঘিরে, নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে। যার শ্রদ্ধা জেগে গিয়েছে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে লক্ষ্যে সে পৌঁছবেই একদিন।

প্রাচীন বেদ-উপনিষদে এই শ্রদ্ধার আর একটি নাম 'ক্রতু'। তাই ঋষি বলেছেন ঃ 'স ক্রতুং কুর্বীত'! মৃত্যুপথযাত্রী জীবকে ডেকেছেন উপনিষদ এই ক্রতু নাম দিয়ে ঃ 'ওঁ ক্রতো স্মর'। কারণ মানুষ হল ক্রতুময় বা শ্রদ্ধাময়। হিন্দুর প্রতিটি অনুষ্ঠানের আরম্ভ ক্রতু বা সংকল্প দিয়ে 'ওঁ অদ্য ....কর্ম অহং করিষ্যে' এই সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করে। তাহলেই কর্ম তার যথাযথ সমাপ্তি লাভ করে নির্বাধে, কারণ 'সংকল্প শুদ্ধ তো সংকল্প সিদ্ধ' বলে থাকেন সাধুমহাজনগণ। শ্রদ্ধা তাই উষার সেই সোনালী আলো, যা জানিয়ে দেয় সূর্যোদয় আসন্ন ও সুনিশ্চিত। কঠোপনিষদে দেখি নচিকেতার শুদ্ধ হৃদয়ে এই 'শ্রদ্ধা আবিবেশ' এবং তাই তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন আত্মজ্ঞান। ঋষির তাই অনুজ্ঞা বা আদেশ ঃ 'শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্য'।

শ্রীভগবান দেখালেন শ্রদ্ধার প্রকারভেদের দরুণই কেউ দেবতার যজনা বা উপাসনা করে, কেউ বা যক্ষ-রাক্ষসের পূজা করে, কেউ বা ভূত প্রেতের ভজনা করে ঃ

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।। ৪।।

এইজন্যেই বলা হয় 'যে যেমন, তার দেবতা তেমন'। তেমনি তপস্যারও দুটি রূপ ঃ একটি শাস্ত্রবিহিত, অপরটি অশাস্ত্রবিহিত। আমাদের আশাকরি স্মরণে আছে যে বিগত ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান সাবধান করেছিলেন যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে যে নিজের খেয়াল-খুশিমতো চলে, 'বর্ততে কামকারতঃ', সে না লাভ করে সিদ্ধি, না সুখ, না পরা গতি এবং তাই তিনি অর্জুনকে শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী চলতে বা কাজ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। এখানেও তপস্যার প্রসঙ্গে তাই জানালেন, দম্ভ বা অহংকারবশে গায়ের জোরে নিজের দেহ-প্রাণ-মন ও অন্তরাত্মাকে নিপীড়ন করে যারা অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যা করে, তারা হল নিশ্চিতভাবে আসুর ভাবাপন্ন।

আহারেরও সাত্ত্বিক, রাজস, তামস ভেদ আছে। সাত্ত্বিক আহার করলে মানুষের সুখ ও প্রীতি বর্ধিত হয়, তেমনি রাজস আহারে এনে দেয় দুঃখ, শোক, ব্যাধি, আর তামস আহার মানুষকে অপবিত্র আর কলুষিত করে। যজ্ঞ, তপস্যা, দান—এগুলিকে আমরা পুণ্য কর্ম বা সাত্ত্বিক কর্ম বলে মনে করি। কিন্তু এই সাত্ত্বিক কর্মও রাজস, তামস রূপ ধারণ করতে পারে, সে-সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকতে হবে।

ফলাকাঙ্ক্ষা করে নিজের দম্ভ বা অহংকার জারি করবার জন্য যে যজ্ঞ করা হয়, তা হল রাজস। তেমনি বিধিহীন, মন্ত্রহীন, শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ হল তামস। আমরা অনেক সময় নিজেদের মূঢ়তার দরুণ মনে করি মন্ত্র-তন্ত্রের বা বিধি-বিধানের কী দরকার, নিজের ইচ্ছামতো যেমন-তেমন করে যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি করলেই তো হয়। এইভাবে আমরা শাস্ত্রের বিধিকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করতে চাই, কিন্তু তার ফলে যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য যে চিত্তশুদ্ধি তার থেকেই যে বঞ্চিত হই, সেকথা ভাবি না।

তপস্যা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তপস্যার আসল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা, ছড়িয়ে নষ্ট হতে না দেওয়া। কায়-মনোবাক্যে শক্তিকে সংহত করার নামই তপস্যা। কায়া বা দেহের তপস্যা শুধু কৃচ্ছ্র সাধন নয়, শুধু উপবাসমাত্র নয়, যা আমরা সাধারণত মনে করে থাকি বা পালন করবার চেষ্টা করি। গীতার মতে শারীর তপস্যা হল ঃ

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।। ১৪।।

অর্থাৎ দেহটিকে শুধু মহতের সেবায় নিযুক্ত রাখা, শুদ্ধ, শুচি, ঋজু, সরল, সংযত রাখা। বাকের আমরা তেমনি কত বৃথা অপব্যয়ই না করি মিথ্যাভাষণে বা কটুভাষণে। অন্যের মনে উদ্‌বেগ জন্মাই, পীড়া দিই, আঘাত করি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে। অথচ শাস্ত্রপাঠে, স্তবস্তুতি পাঠে সে-বাক্‌কে আমরা নিয়োজিত করি না। শ্রীমদ্‌ভাগবত যেমন বলেছেন 'বাণী গুণানুকথনে,' সেভাবে তার সদ্‌ব্যবহার করি না। বাঙ্ময় তপস্যা তাই হল বাক্যের অশুভ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা, বাকের রাশ টেনে রাখা এবং তাকে শুধু সত্য, প্রিয়, অনুদ্‌বেগকর ও হিতকর করে তোলা। বাক্ ও কায়ার তপস্যা তবু সহজসাধ্য, দুর্লভ বা দুঃসাধ্য হল মানস তপস্যা। মনকে রুক্ষ করে ফেলা, শুধু বিষয়চিন্তামুক্ত করাই মানস তপস্যা নয়। মনের মধ্যে বিষাদ বা অবসাদের স্থানে আসা চাই প্রসাদ বা প্রসন্নতা, স্বচ্ছতা, সৌম্যভাব, শান্তভাব, যার ফলে মূল ভাব বা উপাদানই সংশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ তপস্যাই তাদের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত বা ভ্রষ্ট হয় যদি তাদের মধ্যে রজস্তমের মালিন্য এসে ঢোকে। আমরা পুরাণাদিতে নানা কাহিনী পড়ি অসুরদের তপস্যা সম্বন্ধে অথবা কোনো উগ্রস্বভাব মুনিঋষির প্রসঙ্গে। সেসব তপস্যা নিজের 'সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন ক্রিয়তে' (১৮) অথবা 'পরস্যোৎসাদনার্থং" (১৯)। অর্থাৎ তাদের মূল প্রেরণা হল আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপ্রণোদিত, নিজের নাম-ডাক, সমাদর ও সম্মান লাভের জন্য অথবা পরের সর্বনাশ সাধনের জন্য। তপস্যার মতো ধর্ম-কর্মও অধর্ম হয়ে ওঠে যদি তার প্রেরণা হয় ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি। সেই জন্যই শ্রীভগবান তপস্যার ত্রিবিধ রূপ চিনিয়ে দিয়েছেন সযত্নে। সব সময়েই লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের কর্মের প্রেরণা বা উৎসটি কী। কেন আমি তপস্যা করতে যাচ্ছি, ধর্ম-কর্মে কেন প্রবৃত্ত হচ্ছি তার খোঁজ বা অনুসন্ধান করি না বলে আমাদের ধর্মানুশীলন, তপশ্চরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

দান একটি পুণ্য কর্ম, কিন্তু কেন দান করছি, তার উদ্দেশ্য কী, সেদিকে দৃষ্টি না দিলে দানও কলুষিত হয়। অনেকেই আমরা দান করি প্রত্যুপকারের আশায়, যাকে দান করছি সে কৃতজ্ঞ থাকবে বলে। পরিবর্তে সে আমারও উপকার করবে এই প্রত্যাশা করি এবং যেটুকু দান করি তাও যেন অতি কষ্টে-সৃষ্টে, মনের প্রসারতা বা উদারতা থেকে নয়। এ হল রাজস দান। তামস দান

আরও খারাপ, হেলায়-অশ্রদ্ধায় যাকে-তাকে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে দান করা। কিন্তু সঠিক দান হল যথাযথ পাত্রে দান। অনুপকারীকেও দিতে হবে, অর্থাৎ কিছুর বিনিময়ে বা প্রত্যাশায় দান করা নয়, দান করা আমার কর্তব্য শুধু এই বোধেই দেওয়া।

যজ্ঞ-তপস্যা-দান এই তিনটি পাবন কর্মের এইভাবে বিশদ পরিচয় দিয়ে শ্রীভগবান চিনিয়ে দিলেন কেমন করে যথাযথ শুদ্ধভাবে এদের অনুশীলন করতে হবে। শেষ একটি সংকেত দিলেন, পরম মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন 'ওঁ তৎ সৎ', যা দিয়ে ব্রহ্মবাদীরা সতত এইভাবে পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হন। সমস্ত বেদ, সমস্ত বেদবিহিত যজ্ঞ, সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ সংকেত থেকে উদ্ভূত। তাই 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে কার্য আরম্ভ করলে সেই আদিম বা মূল শুদ্ধ প্রেরণার সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটে। তখন আমাদের যজ্ঞ-দান-তপ ক্রিয়া ফলাভিসন্ধিশূন্য সৎকর্ম, প্রশস্ত সাধু কর্ম হয়ে ওঠে, কারণ এই প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে তারই ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। শ্রীভগবান সেই ব্যঞ্জনা বা তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন ২৪ থেকে ২৭ শ্লোক পর্যন্ত।

উপসংহারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে অশ্রদ্ধাপূর্বক যে যজ্ঞ, দান ও তপ অনুষ্ঠিত হয় তা অসৎ এবং তা ইহকাল বা পরকাল কোথাও কোনো কাজে আসে না, কোনো ফল দেয় না। অর্থাৎ পুণ্যকর্মের নাম দিয়ে এসব কর্ম করা না-করারই সামিল, বরং নিশ্চিত ক্ষতিকারক। শ্রদ্ধাই যে সবকিছুর মূল তা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবান জানিয়েছিলেন। অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে অশ্রদ্ধা যে সব কর্মকে নিষ্ফল করে দেয়, তাই স্মরণ করিয়ে প্রকারান্তরে সেই শ্রদ্ধারই অপরিসীম মূল্য বুঝিয়ে দিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ

এবার আমরা পৌঁছলাম গীতার উপসংহার পর্বে। অষ্টাদশ অধ্যায়টি গীতার শেষ অধ্যায়। এটি মোক্ষযোগ নামে প্রসিদ্ধ। মোক্ষ বা মুক্তিলাভই জীবনের চরম বা পরম লক্ষ্য। রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, সুখ-দুঃখ, জরা-মরণ সবকিছু দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি-লাভই জীবের উদ্দেশ্য। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে শোক-মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তা থেকে মোক্ষ বা মুক্তিলাভের জন্যই শ্রীভগবানের উপদেশ অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে।

মোক্ষ বা মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় 'মাং'কে জানা। এই 'মাং' বা আত্মাকে না জানার ফলেই বন্ধন এবং এই অজ্ঞানই যেহেতু বন্ধনের কারণ সেই হেতু জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির কারণ। উপনিষদের তাই অকুণ্ঠ সুস্পষ্ট উদ্‌ঘোষ ঃ 'তমেব বিদিত্বা—অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। গীতা উপনিষদের সারস্বরূপ। তাই শ্রীভগবানও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে উপদেশ দিতে শুরু করলেন এই আত্মারই জ্ঞান বা পরিচয় দিয়ে এবং প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'ত্বং' রূপী যে জীবাত্মা তাকে চিনিয়ে সপ্তম অধ্যায় থেকে 'মাং'কে বা পরমাত্মাকে বিশদভাবে জানিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন ঃ

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।। ৭। ১।।

'মাং'-এর সমগ্র পরিচয় তিনি শেষ করেছেন পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম তত্ত্বে, যা ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি। পূর্ণ পরিচয় দিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত হননি, কারণ তিনি জানেন দৈব ও আসুর এই দ্বিবিধ সৃষ্টির আড়ালে তিনি আবৃত হয়ে আছেন, ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বা মানসিক প্রবণতার দরুণ শুদ্ধরূপে 'মাং'কে কেউ ধরতে বা জানতে পারে না। সপ্তম অধ্যায়ে 'মাং'-এর পরিচয় দিতে আরম্ভ করেই তাই তিনি জানিয়ে রেখেছিলেন ঃ

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।। ৭। ১৩।।

এবং শেষের দিকেও বারংবার বলেছেন, তাঁকে 'গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি' (১৪। ১৯) বা 'গুণানেতানতীত্য ত্রীন্' এই তিনগুণের পারে গিয়ে যে ধরতে পারে একমাত্র সেই 'জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে' (১৪। ২০)।

সব শেষে, এখন এই বিমুক্ত হবার উপায় বলে দিয়েছেন এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে, তাই এর নাম মোক্ষ যোগ। এই অধ্যায়ে এসে উপসংহার করতে গিয়ে শ্রীভগবান যেমন সমগ্র গীতাশাস্ত্রের যা-কিছু বক্তব্য সব আবার একত্র সমাহৃত করেছেন, তেমনি মোক্ষ বা মুক্তির চরম বা পরম উপায়টিও নির্দেশ করেছেন। যা আমাকে বেঁধে রেখেছে, তা আমাকে ছাড়তে হবে যদি আমি মুক্তি চাই।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার মূল মন্ত্রই তাই ত্যাগ—'ত্যাগেন অমৃতত্বমানশুঃ'। এরই অপর নাম সন্ন্যাস, সম্যকরূপে সব ন্যস্ত করা বা বোঝা নামিয়ে ফেলা। আমরা গুণের বোঝা আঁকড়ে আছি, কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ সাদা, কেউ কালো নানারকম পোশাক পরে বসে আছি। সব পোশাক ছেড়ে, সব আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে এবার নিরাভরণ, নিরাবরণ হতে হবে। কোনো রঙের মোহ, কোনো আবরণের, আভরণের, অলংকরণের আকর্ষণ থাকলে চলবে না। হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খসিয়ে, 'সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে,' যথার্থ সত্যরূপে তাঁকে দেখবার জন্য, পঞ্চকোষবিনির্মুক্ত করে তাঁকে উপলব্ধি করবার জন্য এখন সন্নাস ও ত্যাগের তত্ত্বটি ভালো করে বুঝতে হবে। অর্জুন তাই অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই জিজ্ঞাসাই করেছেন যথার্থভাবে ঃ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন।। ১।।

অর্জুনের এই জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নই এক হিসাবে শ্রীভগবানকে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্যের পুনরায় সুস্পষ্ট প্রতিপাদনের ও একত্র গ্রথনের সুযোগ এনে দিয়েছে। নিপুণ মালাকরের মতো গীতার যে মণিমালিকাটি তিনি গেঁথেছেন, অষ্টাদশ অধ্যায়টি হল তার মেরু বা শিখর। অর্জুনের প্রথম থেকেই সন্ন্যাস বা ত্যাগের দিকে ঝোঁক বা প্রবণতা। তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করে চলে যেতে চান, ভৈক্ষ্য বা ভিক্ষুবৃত্তি অর্থাৎ সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেন। ঘোর কর্মেতে জড়িয়ে পড়তে চান না, তাকে ছেড়ে যেতে চান। কিন্তু এই ছাড়া বা ত্যাগের তত্ত্বটি তিনি জানেন না।

সমগ্র গীতায় শ্রীভগবান পরম ধৈর্যের সঙ্গে অর্জুনের নানা আক্ষেপ-বিক্ষেপ অনুযোগ-অভিযোগ খণ্ডন করে এই ত্যাগ বা সন্ন্যাস তত্ত্বটির আসল রহস্য বোঝাতেই সচেষ্ট। যেমন পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে আমরা দেখেছি অর্জুনের

অভিযোগ ঃ তুমি একটা কিছু ঠিক করে বলছ না যাতে আমার শ্রেয় বা মঙ্গল হয়, একবার সন্ন্যাসের কথা বলছ, আবার কর্মের কথা বলছ। সেখানেও উত্তরে শ্রীভগবান পরম যত্নের সঙ্গে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যে এই দুইয়ে কোনো বিরোধ নেই, বুঝবার ভুলেই আমরা মনে করি সন্ন্যাস আলাদা জিনিস। একটাকে ঠিকমতো ধরলেই বা বুঝলেই আর একটার ফলও পাওয়া যায়, 'একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ (৫। ৪) এবং কর্মযোগ ছাড়া সন্ন্যাস অবস্থা লাভ করা বড়ো দুরূহ বা কঠিন, সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ' (৫। ৬)। কিন্তু তবু অর্জুনের বা আমাদের মতো মূঢ় জনের সংশয় যায় না, উপসংহারে তাই ঘুরে ফিরে আবার সেই মূল প্রশ্নেই ফিরে আসেন অর্জুন, শেষবারের মতো সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে চান সন্ন্যাস বা ত্যাগের তত্ত্ব, যাকে ভিত্তি করে আমাদের সমস্ত অধ্যাত্মসাধনা বা গীতার সুরম্য সৌধ বিরচিত।

শ্রীভগবানও এখানে সবশেষে আবারও সেই মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে খুব জোর দিয়ে যেন বলছেন অভ্রান্ত নির্দেশের ভঙ্গীতে ঃ 'নিশ্চয়ং শৃণু মে' (৪), 'নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ (৬)। তাঁর সুনিশ্চিত মত বা অভিপ্রায়টি এখন আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অনেকে মনে করেন কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, তাই কর্ম করতে গেলে কালিমা লাগবেই, সুতরাং কর্ম ত্যাগ করাই শ্রেয়। যজ্ঞ দান ও তপস্যা, এই তিনটি ত্যাগরূপ কর্ম হলেও কর্ম তো বটেই সুতরাং সেগুলিও ত্যাজ্য। কিন্তু শ্রীভগবান এখানে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত দিলেন ঃ 'ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ', কখনও এসব কর্ম ত্যাগ করবে না, অবশ্যই করে যাবে, তার কারণ এই তিনটি কর্মই মনীষীদেরও পাবন বা পবিত্র করে, 'যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্' (৫)। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটিও জানিয়ে দিতে ভুললেন না যে এই কর্মগুলিও করতে হবে 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ' (৬)।

সমগ্র গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান একটি কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তা হল এই যে কর্ম বন্ধন সৃষ্টি করে না, বন্ধন সৃষ্টি করে কাম। কালিমা কর্মে নেই, কালিমা কামে। এখন উপসংহারে সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়েও তাই জানালেন সন্ন্যাস হল কাম্য কর্মের ত্যাগ, সমস্ত কর্মের ত্যাগ নয়। আর সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করাই হল আসল ত্যাগ, শুধু কর্মত্যাগকে ত্যাগ বলে না। সন্ন্যাস ও ত্যাগের যথার্থ স্বরূপটি তাই এই অধ্যায়ের প্রথমেই উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে বললেন ঃ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাং।। ২।।

যাঁরা 'কবি' নন, 'ক্রান্তদর্শী' নন বা 'বিচক্ষণ' নন, তাঁরাই বিভ্রান্ত হয়ে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিকৃত অর্থ করেন এবং মোহবশে শুধু কর্ম ত্যাগ করে বসেন অথবা ঝামেলা এড়াবার জন্য, শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী এই ভেবে 'কায়ক্লেশভয়াৎ' কর্ম থেকে বিরত থাকতে চান এবং তার ফলে ত্যাগের যেটি ফল অর্থাৎ শান্তি, 'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্', (১২। ১২) তা লাভ করতে পারেন না। সাত্ত্বিক ত্যাগ বা বিশুদ্ধ ত্যাগের ছবিটি বড়ো সুন্দর করে এঁকেছেন শ্রীভগবান ৯ শ্লোকে, যা পড়লে আমরা প্রথম যেন হতচকিত হয়ে যাই। নিরন্তর কর্ম করাই হল যথার্থ ত্যাগ! কিন্তু তার সঙ্গে দুটি জিনিস ত্যাগ করতে হবে। 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব' আসক্তি ও ফল অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই দুটি বোধ বিসর্জন দিয়ে তাঁর হাতের যন্ত্রমাত্র হয়ে, কর্তব্য এই বোধে নিরন্তর কর্ম করে যেতে হবে। এরই নাম যথার্থ ত্যাগ। তাই যথার্থ ত্যাগী হলেন তিনি যিনি কর্মফলত্যাগী। তিনি কর্মের ভালোমন্দ বাছতে যান না, ভালো কর্মে আসক্ত হয়ে পড়েন না, মন্দ কর্মকে বিদ্বেষ করেন না, হেয় মনে করেন না, যখন যেমন যে কোনো কর্মই আসুক না কেন, অনাসক্ত হয়ে যথাযথভাবে সেই কর্ম সম্পাদন করে যান।

অর্জুনের সামনে এখন যুদ্ধরূপ ঘোর কর্ম এসে পড়েছে, সেটিকে তিনি 'অকুশল' অর্থাৎ অমঙ্গলজনক কর্ম, পাপকর্ম মনে করে এড়িয়ে যেতে চাইছেন, পরিহার করতে চাইছেন। কিন্তু শ্রীভগবান বোঝাচ্ছেন যে এইভাবে কর্মকে পরিহার করতে চেষ্টা করলে তার ফল থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। কর্মের সাধারণত তিনরকম ফল হয়ে থাকে ঃ অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এবং যারা যথার্থ ত্যাগী নয়, তারাই এই তিনরকম কর্ম ফলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যিনি সন্ন্যাসী অর্থাৎ সর্বকর্মফলত্যাগী, তাঁকে কখনো কোনো ফল স্পর্শ করে না। তিনি কর্মফল থেকে চিরমুক্ত, 'ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ (১২)।

কখনো কোনো কর্মফল কেন সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করে না, এটি বোঝাতে গিয়ে শ্রীভগবান আমাদের সমস্ত কর্মের প্রেরক ও কারকের বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। কর্ম কে করাচ্ছে অর্থাৎ তার প্রেরক কে এবং করছেই বা কে অর্থাৎ তার কারক কে, এই দুটি তত্ত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করলে আমরা বুঝতে পারব একমাত্র দুর্মতিই মনে করে যে সে নিজেই একমাত্র কর্তা ঃ

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ।। ১৬।।

আর যিনি এই মিথ্যা 'অহং কর্তা' বোধ থেকে মুক্ত তিনি যদি সমস্ত লোককে হত্যাও করেন, তাহলেও সেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না বা

তার ফলভোগী বা পাপভোগী হন না, অর্থাৎ সেই ঘোর কর্মের তিনি কর্তাও হন না, তার ফলও ভোগ করেন না। শ্রীভগবানের এই কথাটি শুনে আমাদের চমকে উঠতে হয় এবং মনে নানা খটকা জাগে, প্রশ্ন ওঠে। এখানে কি শ্রীভগবান জ্ঞানীর যথেচ্ছাচারের ইঙ্গিত করেছেন বা তা অনুমোদন করেছেন? লক্ষ্য কিন্তু শ্রীভগবানের তা নয়। আত্মার অসঙ্গত্ব, নির্লেপত্ব, সমস্ত কর্মসংস্পর্শশূন্যত্ব প্রতিপাদন করবার জন্যই অর্জুনকে তিনি এই কথা বলছেন। অর্জুন যুদ্ধরূপ ঘোর কর্মে লিপ্ত হতে চান না, আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনবধের ভাগী হয়ে অনন্ত পাপের পঙ্কে ডুবতে চান না। তাই শ্রীভগবান সেই যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলেই অর্জুনকে বোঝাতে চাইছেন যে লোককে হত্যা করলেও সে হননের কর্তাও হয় না, তার ফলের ভোক্তাও হয় না।

আত্মা যে অকর্তা, অভোক্তা এর কোনো ধারণাই আমরা করতে পারি না, কারণ আমরা দেহের সঙ্গে, মনের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে এখন একাত্ম হয়ে আছি। দেহ-মন-প্রাণের সবকিছু ব্যাপারকে আমরা আমার অর্থাৎ আত্মার ব্যাপার বলে মনে করে বসে থাকি ; এই ভ্রান্তি দূর করে আত্মার পূর্ণ স্বাধীন ও স্বচ্ছ নির্মল রূপ তুলে ধরাই সমস্ত উপনিষদের এবং তারই সারস্বরূপ গীতার কাজ। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মশাস্ত্রেই এই অত্যাশ্চর্য আত্মরূপের এমন নির্ভীক ও সাহসী বর্ণনা পাওয়া যায় যাকে এক হিসাবে বলা যায় সৃষ্টিছাড়া বা সমস্ত মানবিক কল্পনার অতীত। একমাত্র উপনিষদের ঋষির আতত সর্বসংস্কারমুক্ত দৃষ্টির কাছেই এই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যা বিশ্বের আর কোনো অধ্যাত্মশাস্ত্রে দেখা যায় না।

সেইজন্যই পাশ্চাত্ত্য মনীষিবৃন্দ উপনিষদ আলোচনা করতে গিয়ে বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হয়েছেন। যেমন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আর্থার ব্যারিডেল কীথ উপনিষদের মুক্ত পুরুষের ধারণা করতে গিয়ে বলে বসেছেন ঃ The idea of a liberated man in the Upanishads is to become a despot, moving up and down the worlds, doing whatever he likes! অর্থাৎ উপনিষদের জীবন্মুক্ত পুরুষ হল স্বেচ্ছাচারী, ঊর্ধ্ব-অধঃ বিভিন্ন লোকে যা খুশি তাই করে বেড়ানোই যার একমাত্র লক্ষ্য। 'স সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি', উপনিষদের এই উক্তিই সাহেবকে বিভ্রান্ত করেছে, যেমন এখানে শ্রীভগবানের 'হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে' (১৭) আমাদের হতচকিত করছে।

দুটি উক্তির লক্ষ্য কিন্তু একই—আত্মা যে কোনো কিছুতে বদ্ধ নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত এক অদ্বিতীয় পরম তত্ত্ব এইটিই

বোঝানো। 'ন কর্মণা বর্ধতে নো কনীয়ান্', কোনো কর্মের দ্বারা তার হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই ঘটে না। কেন আমি পাপ করেছি, 'কিমহং পাপমকরবম্', কেন আমি পুণ্য কর্ম করিনি, 'কিমহং পুণ্যং নাকরবম্' এরকম কোনো করা-না-করার জন্য কোনোরকম অনুশোচনা সেই মুক্তপুরুষের জাগে না, কেননা তিনি সমস্ত বিধিনিষেধের পারে চলে যান। 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ'? ত্রিগুণের পারে বিচরণকারীর বিধিই বা কী, নিষেধই বা কী?

সন্ন্যাস হল সমস্ত বিধি-নিষেধের পারে এই গুণাতীত অবস্থা, যার বর্ণনা এই উপসংহার পর্বে শ্রীভগবান অর্জুনকে শোনাচ্ছেন। তার মানে এই নয় যে মুক্তপুরুষ সব সময়েই নিষিদ্ধ কর্ম করে বেড়াবেন, যথেচ্ছাচারী হয়ে লোককে দেখাবেন যে তিনি মুক্তপুরুষ। শ্রীভগবানের বলবার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকুই যে যদি সেই মুক্তপুরুষের দ্বারা কখনো কোনো নিষিদ্ধ আচরণ বা অধর্ম অনুষ্ঠান ঘটেও, তার দ্বারা তিনি এতটুকু লিপ্ত হন না। আমরা পরমাত্মা বা ভগবানের কল্পনা করি যিনি 'সর্বদোষবিনির্মুক্ত', কোনো নীতিবিগর্হিত আচরণ যিনি করেন না, আদর্শ যাঁর চরিত্র বা স্বভাব অর্থাৎ যিনি হলেন moral God, ন্যায়-নীতির উজ্জ্বলতম প্রতিমূর্তি।

ভারতবর্ষের ঋষিরা কিন্তু যে ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন তিনি a-moral অর্থাৎ ন্যায়-নীতির ঊর্ধ্বে, সু-কু এর পারে, ভালো-মন্দের বাইরে। আমরা a-moral-কে immoral বলে মনে করি, আমাদের মানবিক দৃষ্টিতে নীতির পারে যা, তা অনীতি বা দুর্নীতির সামিল। তাই কৃষ্ণলীলা শুনতে শুনতে মহারাজ পরীক্ষিতের বিষম খটকা লেগেছিল। শুকদেবের মুখ থেকে রাসলীলার বর্ণনা শুনে চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ সে কি! কৃষ্ণের এ কী জাতীয় আচরণ? পরদারাভিমর্ষণ! 'কথং প্রতীপমচরদ্ বিভূঃ?' এমন 'প্রতীপ' বা প্রতিকূল আচরণ তিনি কী করে করলেন? উত্তরে শুকদেব সর্বভুক্ অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, চৈতন্যের সেই আগুনে সবই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, কোনো দোষ বা মালিন্য তাকে স্পর্শ করে না। 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।' একটি দৃষ্টান্ত দিয়েও সঙ্গে সঙ্গে শুকদেব সাবধান করে দিয়েছেন যে যার ভিতর সে-আগুন জ্বলেনি, আত্মার নিত্য নির্মল শিবস্বরূপকে যে উপলব্ধি করেনি, সে যদি নীলকণ্ঠের অনুকরণ করে 'অব্ধিজং বিষং' অর্থাৎ সমুদ্রমন্থনজাত হলাহল বা বিষ পান করতে যায় তাঁর দেখাদেখি, তাহলে 'মৃত্যুর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ', মরণশীল সে মরণকেই বরণ করে, কখনো

কোনোদিনই সে মৃত্যুঞ্জয় হতে পারে না।

তাই যথেচ্ছচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা গীতা বা ভাগবতের লক্ষ্য নয়। মৃত্যুঞ্জয় হবার যথার্থ পথ দেখানোই এইসব মহাগ্রন্থের একমাত্র লক্ষ্য। গীতায় সর্বলোকের হনন এবং ভাগবতে পরদারাভিমর্ষণ, এই দুটি ক্রোধ ও কামের, দ্বেষ ও রাগের চরম দৃষ্টান্ত কল্পনা করে দেখানো হয়েছে যে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' এই আত্মস্বরূপে কোনো কিছুরই দাগ লাগে না, এমনই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ তার রূপ, রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধের অতীত, লাল-কালো সব রং থেকে চির মুক্ত, সদা শুভ্র।

কিন্তু আত্মার এই পরম মহিমার বর্ণনা শোনা এক কথা, আর তাকে উপলব্ধি করা অন্য কথা। শেষ অধ্যায়ে অর্জুনকে এইভাবে চমকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীভগবান বিস্তৃতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন পরম করুণায় যে জগতে সব জিনিস, জ্ঞানই বলো, কর্মই বলো, কর্তাই বলো, বুদ্ধিই বলো, ধৃতিই বলো, সুখই বলো—ত্রিগুণের দ্বারা সব সমাচ্ছন্ন। পৃথিবীতে, স্বর্গে, এমনকি দেবতাদের মধ্যেও এমন কোথাও কিছু নেই যা এই প্রকৃতির তিন গুণের জাল থেকে মুক্ত। আর তিন গুণের পারে না যেতে পারলে আত্মার যে নির্লেপ, অসঙ্গ, অত্যাশ্চর্য মহিমার বর্ণনা দিয়েছেন, তার কোনো উপলব্ধিই কোনোদিন সম্ভব নয়। তা হলে উপায়?

এই উপায়-নির্দেশেই গীতার চমৎকারিত্ব ও অনন্যসাধারণ স্বকীয়ত্ব। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে দোগ্ধা গোপালনন্দন এই পরম অমৃতই দান করেছেন জগৎকে, যার তুলনা ত্রিভুবনে মেলে না। স্বভাব বা নিজের প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করে কখনো মুক্তি লাভ করা যায় না, এই হল গীতার সবচেয়ে মূল্যবান উদ্‌ঘোষণ। প্রাকৃতিক ধারা ধরেই মানুষকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে, কর্ম করেই কর্মজাল থেকে মুক্ত হতে হবে, এই হল গীতার অভিনব রাজমার্গ মুক্তিলাভের। কিন্তু সে কোন্ কর্ম? স্বভাবনিয়ত কর্ম, সহজ কর্ম (৪৫-৪৮)।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে চতুর্বর্ণের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই স্বভাবজ কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে ছোটো-বড়ো, নগণ্য বা মান্য, হেয় বা উপাদেয়ের প্রশ্ন ছিল না। শুধু 'স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ', আপন আপন স্বভাব থেকে উদ্ভূত গুণ অনুসারে 'কর্মাণি প্রবিভক্তানি', কর্মগুলি যথাযথভাবে বিভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণ তাঁর আপন স্বভাবেই শম-দম-তপঃ-পরায়ণ হবেন এবং তারই অনুশীলন করবেন। তেমনি ক্ষত্রিয় তাঁর শৌর্য, ধৈর্য, তেজ, দক্ষতা,

প্রভুত্ব— এ সবই প্রকাশ করবেন। বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্যে এবং শূদ্র সেবাপরিচর্যায় নিরত থাকবেন। এইসব কর্ম বাইরে থেকে তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়, তাঁদের স্বভাব থেকে উদ্ভূত, 'স্বভাবজম্' (৪২-৪৪)।

স্বভাবজ কর্মের দ্বারাই মানুষের দ্রুত বিকাশ বা উন্নতি ঘটে থাকে। যাকে যা সাজে, তার পক্ষে তাই করাই সংসিদ্ধির হেতু। যা তাকে সাজে না, অর্থাৎ প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা কৃত্রিম, তার দ্বারা বিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে যায়, যার ফল হল নিধন বা বিনাশ। অর্জুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করাই তাঁর স্বধর্ম, শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ তাঁর সহজাত। তিনি ধনুর্বান ত্যাগ করে, শৌর্য-বীর্য বিসর্জন দিয়ে, যুদ্ধে পরাঙমুখ হয়ে পরধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধর্ম শম, দম, জ্ঞান, বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে চাইছেন। শ্রীভগবান তাঁর এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা স্বভাববিরুদ্ধ কাজ কখনোই অনুমোদন করতে পারেন না। তাই তাঁকে শেখাচ্ছেন, শোনাচ্ছেন সিদ্ধিলাভের সুনিশ্চিত পথ ঃ

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ।। ৪৫ ।।

আপন আপন কর্মেই সর্বতোভাবে নিরত থেকে কেমন করে সিদ্ধি লাভ করা যায়, তার পরম মন্ত্রটি দিলেন পরের শ্লোকে চরম রহস্যটি উদ্ঘাটন করে ঃ

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ।। ৪৬ ।।

কর্ম হয়ে উঠবে উপাসনা, আমার কর্ম হবে তাঁর অর্চনা যখন আমি উপলব্ধি করব যে সমস্ত কর্মের প্রেরণার উৎস একমাত্র তিনিই এবং তিনিই সবকিছু ছেয়ে আছেন, আগাগোড়া ব্যাপ্ত হয়ে আছেন সেই কর্মে। কর্মের প্রেরক তিনি, কারকও তিনি, মানুষ শুধু নিমিত্তমাত্র, যন্ত্রমাত্র। এই বোধ নিয়ে কর্ম করাই হল আসল কথা। আমার স্বভাবজাত কর্ম যদি গুণহীনও হয়, তবু সেই কর্ম দিয়েই আমাকে তাঁর অর্চনা করতে হবে, অন্যের কর্ম ভালো করে করতে যাওয়ার মতো মূঢ়তা যেন আমাদের পেয়ে না বসে। স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করলে কখনো পাপভাগী হতে হয় না। আগুনের সঙ্গে যেমন ধোঁয়া থাকেই, তেমনি সমস্ত কর্মই দোষের দ্বারা আক্রান্ত, সব কাজেই কিছু না কিছু দোষ থাকবেই। তাই সহজাত কর্ম, স্বভাবজ কর্ম, দোষযুক্ত হলেও তাকে ত্যাগ করতে যাওয়া উচিত নয়, তাতে দোষের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। অর্জুন ভাবছেন তাঁর ক্ষত্রিয়বর্ণোদ্ভূত সহজাত কর্ম যে যুদ্ধ, তা যেহেতু আত্মীয়-স্বজনবধ ইত্যাদি দোষযুক্ত, অতএব তা ত্যাগ করলেই বুঝি দোষের হাত থেকে, পাপের হাত থেকে বাঁচা যাবে। কিন্তু তা হয় না, স্বভাবজ কর্ম ত্যাগ করে পরধর্মের অনুশীলন করতে গিয়ে আরও গভীর পাপে ডুবতে হয়।

কর্মের দোষ থেকে মুক্তি পেতে হলে তার একমাত্র সাধন, কর্মকে অর্চনায় রূপান্তরিত করা। ঐ 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য' এইটিই হল বীজমন্ত্র, জাদুমন্ত্র, যা কর্মের দোষরূপ বিষ নির্মূল করে অমৃতে পরিণত করে তাকে। তার ফলে এসে যায় 'অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র', আসক্তির জায়গায় আসে অসক্তি বা অনাসক্তি, স্পৃহাশূন্যতা, যা এনে দেয় পরমা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি (৪৯)। সন্ন্যাসের দ্বারাই এই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়, যে-সন্ন্যাসের তত্ত্ব অর্জুন জানতে চেয়েছিলেন এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে। সন্ন্যাস তাই কর্মত্যাগ নয়, আসক্তিত্যাগ, সঙ্গ ও ফলত্যাগ এবং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির অর্থ নিশ্চেষ্টতা নয়, সর্বকর্ম সর্বদা অনুষ্ঠান করেও তাঁকেই আশ্রয় করে থাকা, হৃদয়ে স্থিত হৃষীকেশকে সদা হৃদয়ে ধরে রেখে আত্মার সেই নিশ্চলতায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকা। সেই অবস্থাটি কেমন করে লাভ হয় তার অনুপম বর্ণনা ৫১ থেকে ৫৫ শ্লোকে শ্রীভগবান দিয়েছেন, যা প্রত্যেক সাধকের কণ্ঠহার করা উচিত।

সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিশুদ্ধ বুদ্ধি। আবরণ পড়েছে বুদ্ধিরই উপর, তাই অশুদ্ধ বুদ্ধির জন্যই আমরা নিত্যসন্নিহিত আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি না। বুদ্ধির এই মালিন্য দূর করে তাকে বিশুদ্ধ করাই সমস্ত সাধনার লক্ষ্য। গীতায় শ্রীভগবান তাঁর উপদেশ আরম্ভ করতে গিয়েই তাই অর্জুনকে বলেছেন ঃ 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ' (২/৪৯)। উপনিষদে আত্মোপলব্ধির একমাত্র উপায় হিসাবে এই বুদ্ধিকেই চেনানো হয়েছে ঃ 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাই তাঁর শিক্ষাষ্টকের প্রারম্ভেই এই 'চেতোদর্পণমার্জনং'-এর কথা বলেছেন, কারণ একমাত্র তারই ফলে হয় 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্'।

বুদ্ধির বিশুদ্ধি সম্পাদনে ব্রতী হয়েও আমাদের ধৃতির অভাবে শুদ্ধিসাধনা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। আমরা একটু করেই হাল ছেড়ে দিই ধৈর্যের অভাবে। তাই কোমর বেঁধে লাগতে হবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে এই ধৃতির সাহায্যে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, শুদ্ধ রাখা সম্ভব হয় না, তার আর এক কারণ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই বিষয়-সমূহের নিরন্তর মনের উপর হানা। তাই এই বিষয়দের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয় যতদিন আমরা রাগ-দ্বেষ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণ ছাড়তে না পারছি। তাই রাগ-দ্বেষকে আগে বিদায় দিতে হবে। কিন্তু তা তো সহজসাধ্য নয়, তাই নিজেকে একান্তে নির্জনবাসে অভ্যস্ত হতে হবে, গুটিয়ে নিতে হবে বাইরের বিক্ষেপের জগৎ থেকে।

আহারেও সংযত হতে হবে। মিতাহারী ও একান্তবাসী হয়ে বাক্-কায়-

মন এই তিনটিকে সংযত করতে হবে। তবেই বৈরাগ্য অবলম্বনের ফলে সর্বদা ধ্যানপরায়ণ হওয়া যাবে এবং এই ধ্যান যত গভীর হবে তত অহংকার, কাম, ক্রোধ ইত্যাদির হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব হবে। তখন পরিপূর্ণ শান্তি বা সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে চিত্তে এবং সেই শান্ত চিত্তেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হবে। তাই উপনিষদের উপদেশ ঃ 'শান্ত উপাসীত'। কিন্তু এই শান্ত হওয়ার ছনে চাই এতখানি সাধনা। আমরা ভাবি আসনে বসামাত্র আমাদের মন শান্ত হয়ে যাবে আর আমরা ভগবানকে পেয়ে যাব বা উপলব্ধি করব। কিন্তু মনকে শান্ত করার সাধনার দিকে আমরা দৃষ্টি দিই না, তাই আমাদের সাধনায় কোনো ফলও পাই না।

এইভাবে যিনি ব্রহ্মভূত হতে পারেন তাঁর অন্তরের প্রসন্নতা কখনো ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ তিনি হা-হুতাশ বা শোক করেন না, কিছু চিন্তা বা আকাঙ্ক্ষাও করেন না, 'ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি' (৫৪)। সর্বভূতে তাঁর তখন সমদৃষ্টি। এই অবস্থায় উপনীত হতে পারলে তবেই লাভ হয় পরাভক্তি। ভক্তি তাই এত দুর্লভ ধন, 'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানে না মণি'। বিষয়রূপ মণিমাণিক্য, এমনকি মুক্তিরূপ পরম মণিও যার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় তা লাভ হয় ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা হলে। শান্তির পর আসে ভক্তি এবং এই ভক্তির ফলেই সেই পরম স্বরূপকে সর্বতোভাবে যথাযথ জানা যায় অর্থাৎ অভেদে জানা যায়, এতটুকু আড়াল না রেখে। 'যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ,' যতরকম তাঁর ভেদ, সেইসব ভেদবিশিষ্ট এবং স্বরূপত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জানার ফলেই তাঁতে প্রবেশ হয়, 'বিশতে তদনন্তরম্' (৫৫), তাতে মিলিয়ে যায়, মিশে যায়। উপনিষদের ভাষায় ঃ 'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম' অর্থাৎ বিশুদ্ধ জল যেমন বিশুদ্ধ জলে মিশে যায় তেমনি ঐ 'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত' যিনি, তিনি সেই বিশুদ্ধ আত্মায় মিলে-মিশে একাকার হয়ে যান। ভক্তির আবেশের ফলেই লাভ হয় এই প্রবেশ।

আমরা শ্রীভগবানের মুখে এই অপূর্ব সাধন-সরণির নির্দেশ লাভ করে মনে করি এই একাকার হয়ে যাওয়াতেই যাত্রা শেষ, সাধনার পরিসমাপ্তি। কিন্তু গীতার সাধনা কর্মের সাধনা, স্তব্ধতা বা নিশ্চেষ্টতার সাধনা নয়। তাই এর পরেও দুটি শ্লোকে (৫৫-৫৭) শ্রীভগবান অর্জুনকে আবারও দিলেন সেই পরম মন্ত্র যাতে সমস্ত কর্ম সর্বদা করেও তাঁকেই আশ্রয় করে থাকা যায় এবং সমস্ত কর্মই তাঁকে সন্ন্যাস বা সমর্পণ করে সমস্ত দুর্গতি থেকে ত্রাণ লাভ করা যায়। এইখানেই সন্ন্যাসের তত্ত্ব সব বলা হয়ে গেল শ্রীভগবানের এবং সঙ্গে সঙ্গে

তিনি অর্জুনকে সাবধান করে দিলেন যে মূঢ় অহংকারে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি যদি স্বভাবকে অতিক্রম করে, ক্ষাত্রধর্মকে বিসর্জন দিয়ে, যুদ্ধ করব না বলে জেদ ধরে বসে থাকেন তাহলে কিন্তু তিনি বিনষ্ট হবেন। প্রকৃতি বা স্বভাব তাঁকে ঘাড়ে ধরে যুদ্ধ করাবে, তাঁর নিস্তার নেই। মোহবশে যা করবেন না বলছেন, অবশ হয়েও তা করতেই হবে।

গীতা সেইজন্য মানুষকে প্রকৃতির প্রতিকূলে, স্বভাবের বিরুদ্ধে না যেতে বারংবার সাবধান করেছেন। তাই দু দু বার উচ্চারিত হয়েছে একই শ্লোক, শ্রীভগবানের সতর্কবাণী। একবার উপদেশের প্রারম্ভে তৃতীয় অধ্যায়ে, আর একবার উপসংহারে এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ঃ

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। ৩/৩৫।। ১৮/৪৭।।

এইভাবে উপক্রম ও উপসংহারে একই সুর ধ্বনিত হয়েছে বলে গীতার একবাক্যতা বা অখণ্ড তাৎপর্যও সংস্থাপিত হয়েছে। আগাগোড়াই শ্রীভগবান প্রকৃতির ধারা ধরেই, স্বভাবের অনুবর্তন করেই, প্রকৃতিকে বা স্বভাবকে অতিক্রমের রাজমার্গ নির্দেশ করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়েও তাই বলেছিলেন ঃ 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি' (৩/৩৩), 'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ' (৩/৫), নবম অধ্যায়েও শুনিয়েছেন 'ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ' (৯/৮) এবং উপসংহারে অর্জুনকে সেইজন্য বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর মতো মহাবীরেরও বৃথা এ আস্ফালন, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, 'কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ' (১৮/৬০), কারণ 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি' (১৮/৫৯) প্রকৃতি ঘাড় ধ'রে তোমাকে দিয়ে সে-কাজ করাবেই।

বার বার এই 'অবশ' কথার উল্লেখ দেখে স্বভাবতই আমাদের মনে হতে পারে, তাহলে মানুষের কি কোনো স্বাধীনতাই নেই, সে কি চির-পরাধীন, প্রকৃতির দাস? আমাদের সমস্ত সত্তা যেন বিদ্রোহ করে ওঠে, আমরা ভাবি আমাদের সবকিছুই কি নিয়তির দ্বারা নির্দিষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত? এ হল সেই দৈব ও পুরুষকারের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, free will and determinism-এর সনাতন বিরোধ, যার কোনো সমাধান যেন আমরা খুঁজে পাই না। গীতা কিন্তু বড়ো অপূর্বভাবে এর সমাধানের স্বর্ণসূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। আমরা প্রকৃতির বশ বা তার নিয়ন্ত্রণের অধীন ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে, 'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে', কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে ওঠার স্বাধীনতা আমাদের আছে। তাই শ্রীভগবানের আদেশ ঃ 'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ' (৩/৩৪)। এই ছাড়িয়ে ওঠার ক্রমটিও তিনি আমাদের সুস্পষ্টভাবে

দেখিয়ে দিয়েছেন তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ দুটি শ্লোকে এবং ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির পারে যিনি, তাঁকে জানলেই, 'এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা'ই যে প্রকৃতির নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, শত্রুকে নির্মূল করা যায়, তা অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করেছেন।

প্রকৃতির এই সোপান-পরম্পরাকে ধরেই, এই scale of values-কে অবলম্বন করেই মানুষকে উঠতে হবে, যদি সে প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে উঠতে চায়। তম থেকে রজ, রজ থেকে সত্ব—এই হল ক্রম। ইন্দ্রিয় থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে বুদ্ধির পার, এই হল ধারা। এই প্রকৃতির ধারা অবলম্বন না করলেই বিকাশ অবরুদ্ধ হবে, 'ভূয় ইব তে তমো,' গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে, 'আত্মহনো জনাঃ' আত্মঘাতী হতে হবে। গীতা দেখাতে চাইছেন আত্মোদ্ধারের, আত্মলাভের পথ, আর অর্জুন বেছে নিতে চাইছেন আত্মহননের, আত্মবিলোপের পথ। শ্রীভগবান পরম করুণায় সেই পথ থেকে তাঁকে ফেরাবার জন্য, দুর্গ বা সংকট থেকে ত্রাণ করবার জন্য এই আত্মোদ্ধারের রাজমার্গ নির্দেশ করছেন গীতায় অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে এবং উপদেশ শেষ করে বললেন ঃ

অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।। ১৮/৫৮।।

যদি অহংকারের বশবর্তী হয়ে আমার কথা না শোনো, তাহলে তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এ যেন ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেওয়া। যিনি বলেছেন 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি,' তিনি কি এমনি করে বিনাশ বা প্রণাশের অভিশাপ দিতে পারেন অর্জুনের মতো ভক্তকে? আসলে এটি অর্জুনের অহংকারকে চূর্ণ করা। এ যেন ক্রোধের ছলে অর্জুনকে পরম অনুগ্রহের দিকে অবহিত করা, আরও কাছে টেনে এনে একাগ্র করে সর্বগুহ্যতম কথাটি শোনাবার উদ্যোগ বা আয়োজন। অর্জুন আমাদেরই মতো একজন সচেতন মানুষ, তার উপর অসীম শক্তিধর বীরপুরুষ। স্বভাবতই অচেতন প্রকৃতির অধীন হয়ে অবশে যুদ্ধ করতেই হবে নিজের ইচ্ছা না থাকলেও, এ কথায় তাঁর সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে উঠবে। তাই শ্রীভগবান তাঁকে বোঝালেন যে এ নিয়ন্ত্রণ অচেতন প্রকৃতির নয়, সচেতন এক নিয়ামক পুরুষের, যাঁর নাম ঈশ্বর। এ যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নয়, যন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ। সেই যন্ত্রীই সবাইকে এই যন্ত্রে চাপিয়ে ঘোরাচ্ছেন, 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি'। অথচ তিনি দূরে কোথাও বসে থেকে যে এই যন্ত্র ঘোরাচ্ছেন তা নয়, 'সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে' (১৮/৬১), সমস্ত জীবের হৃদয়-কেন্দ্রে, মর্মস্থলে বসেই তিনি সৃষ্টির এই ঘূর্ণনলীলা পরিচালনা করছেন। তিনি কী উদ্দেশ্যে কেন ঘোরাচ্ছেন তা তিনিই জানেন। তাই

সর্বভাবে তাঁর শরণ নিলেই মানুষ তাঁর প্রসাদে বা অনুগ্রহে পরম শান্তি ও চরম স্থিতি লাভ করতে পারে।

গুহ্য থেকে গুহ্যতর এই জ্ঞান অর্জুনকে দান করে শ্রীভগবান জোর করে তাঁর মত অর্জুনের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলেন না। তিনি বললেন ঃ "আগাগোড়া ভালো করে ভেবে দেখো এবং তারপর তোমার যেমন ইচ্ছা তাই করো।" নিজের বিমর্ষ বা বিচারের কষ্টি পাথরে যাচাই না করে অন্যের কথায় কিছুদূর পথ চলে গেলেও কোনোদিনই শেষ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছন যায় না। নিজের অন্তর যতক্ষণ সম্পূর্ণ সায় না দেয় ততক্ষণ গুরুর বা আচার্যের উপদেশ তার পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে না। চিন্তাধারার পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এখানে শ্রীভগবানের মুখের 'বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু'র (৬৩) মধ্যে তারই অপরূপ উদ্‌ঘোষণ।

কিন্তু এখনও সর্বগুহ্যতম কথাটি বলা হয়নি। আমরা জানি ভগবানই সকলের ইষ্ট, কিন্তু এখন ভক্তই হয়েছেন ভগবানের ইষ্ট, অর্জুনই তাঁর কাছে 'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি' (৬৪)। এই কারণেই তাঁর হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য সবচেয়ে গোপন মর্মকথাটি তাঁকে না বলে তিনি থাকতে পারেন না। দূর থেকে ঈশ্বরকে দেখিয়ে দিয়ে অর্জুনকে সর্বভাবে তাঁরই শরণ নিতে বলার মধ্যে (৬২) একটা পরোক্ষ ভাব থেকে গেল। প্রথম পুরুষ বা তৃতীয় পুরুষ হিসাবে এখানে ঈশ্বরকে চেনানো হল। অর্জুন ভাবতে পারেন, কে এই ঈশ্বর, কেনই বা তাঁর শরণ নিতে যাব? তাই আরও নিবিড় ভাবে কাছে টেনে নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উত্তম পুরুষে বললেনঃ 'মামেকং শরণং ব্রজ' (৬৬), এইতো আমি তোমার সামনেই রয়েছি চিরসখা সারথিরূপে। গুরুরূপে, আচার্যরূপে তুমি একমাত্র আমাকেই আঁকড়ে ধরো না আর সব ছেড়ে দিয়ে। এখানে 'সর্বভাবেন' নয়, 'সর্বত্যাগেন' 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' শরণাগতি, 'তমেব শরণং গচ্ছ' নয় 'মামেকং শরণং ব্রজ'। গুহ্যতর থেকে এইভাবে সর্বগুহ্যতমে নিয়ে এলেন এবং রাজবিদ্যা রাজগুহ্যে নবম অধ্যায়ে যে পরম মন্ত্রটি দিয়েছিলেন (৯/৩৪), উপসংহারে তারই পুনরাবৃত্তি করলেন অষ্টাদশের শেষে এসে সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার করে ঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।৬৫।।

নবমে প্রতিজ্ঞাটুকু করেননি, এখানে শপথ করে দিব্যি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে

বললেন ঃ ''সত্যিই আমাকেই পাবে।'' এই আমাকেই পাওয়ার মধ্যে গীতার পরিসমাপ্তি। যে সন্ন্যাসতত্ত্বের আলোচনা দিয়ে অষ্টাদশ অধ্যায়ের সূচনা, এই 'মামেকং শরণং'-য়ে সেই সন্ন্যাসের পরম ও চরম রূপের উদঘাটন। সব বোঝা তাঁর পায়ে নামিয়ে দেওয়াই এই সন্ন্যাস, এবং তিনিও ভক্তের সব পাপের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেন ও তাকে মুক্ত করে দেন সব চিন্তা ভাবনা থেকে, 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ (৬৬)।

সমগ্র গীতার উপদেশের মাঝে মাঝেই শ্রোতা অর্জুনকে বক্তা শ্রীভগবান অবহিত হয়ে শোনার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন ঃ 'ইমাং শৃণু' (২/৩৯), 'তচ্ছৃণু' (৭/১) 'শৃণু মে পরমং বচঃ' (১০/১), 'নিশ্চয়ং শৃণু' (১৮/৪) এবং উপসংহারে 'শৃণু মে পরমং বচঃ (১৮/৬৪) বলে। এখন সবশেষে শিষ্যের কাছে তাই যাচাই করে নিচ্ছেন ঃ 'হ্যাঁ গো! মন দিয়ে শুনেছ তো? 'কচ্চিদেতৎশ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। (১৮/৭২)। কারণ একাগ্রচিত্তে এই গীতার উপদেশ শুনলে তার ফল ফলবেই, অজ্ঞান মোহ দূর হবেই। শ্রুতি হল ফলপর্যবসায়িনী, ফলেই পর্যবসান। ফল ফলল না অর্থাৎ অজ্ঞান দূর হল না, সে শোনা শোনাই নয়। 'যথাপূর্বং সংসারিত্বম্' যদি রয়েই গেল, তাহলে গীতা শোনার কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু এখানে আদর্শ শিষ্য অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে জানালেন ঃ ''মোহ আমার বিনষ্ট হয়েছে স্মৃতি আবার ফিরে এসেছে, সন্দেহ আমার দূরে গিয়েছে, এখন তুমি যা বলছ তাই করব। কারণ এ সবই আমার লাভ হয়েছে তোমার প্রসাদে।''

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।৭৩।।

বিষাদে গীতার আরম্ভ, প্রসাদে শেষ। মোহ থেকে এর সূচনা, মোহ-মুক্তিতে উপসংহার। নিজের স্বরূপের, স্বধর্মের বিস্মৃতি থেকেই ঘটেছিল কর্তব্যকর্মে বিচ্যুতি।। আজ স্মৃতি ফিরে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে এল কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানের অকুণ্ঠ অঙ্গীকার। এই স্মৃতিলাভই সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য, কারণ 'স্মৃতির্লব্ধা সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ,' স্মৃতি ফিরে পেলেই সব গ্রন্থিমোচন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্লেটোও তাই যথার্থই বলেছেন ঃ 'All knowledge is but remembrance'।

এ জ্ঞান প্রত্যেকের অন্তরের অন্তস্তলে ঘুমিয়ে আছে, 'এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধঃ'। বাইরে থেকে এ জ্ঞান আহরিত হলে কোনোদিন তা নিজস্ব হত না, ভিতর থেকে ফুটে উঠলেই তা স্বকীয় অনুভবে পরিণত হয়, আর কে না

জানে 'অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য,' যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভবেই অবসান, অনুভব না ফোটা অবধি এ শোনার ছুটি নেই। 'শ্রোতব্যঃ' তো বটেই, কিন্তু কী জন্য? 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' তাঁকে দেখার জন্যই শোনা। দেখা বা সাক্ষাৎ অনুভবই তাই একমাত্র লক্ষ্য ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার।

শেষের সাধনা তাই দুটি ঃ শ্রবণ ও দর্শন। এরই অপরূপ বর্ণনা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে গীতার কথা যিনি শোনালেন সেই সঞ্জয়ের মুখে। শোনো 'সংবাদমদ্ভুতম্' আর দেখো 'রূপমত্যদ্ভুতম্'। এই দুটিই তখন ভক্তের স্মরণ পথে বারংবার জেগে উঠতে থাকে, 'পড়ে মনে মোর, পড়ে যে কেবলই মনে'! আর এই অবিরাম স্মরণে 'সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য', দেহে মনে প্রাণে বিস্ময়ের রোমাঞ্চ, আনন্দের শিহরণ। এরই নাম দিব্যজীবন।

'বিস্ময়ো মে মহান্' রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ।। ১৮/৭৭।।

এই খানেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ধনুর্ধর পার্থের পূর্ণাঙ্গ মিলনে 'শ্রী' বা 'সম্পদ্,' 'বিজয়' জীবন-সংগ্রামে, 'ভূতি' বা সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি এবং 'ধ্রুবা নীতি' সুনিশ্চিত ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।।

গীতায় শ্রীভগবানের আদেশ

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ	২/৩
হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ	২/৩
তান্ তিনিক্ষস্ব ভারত	২/১৪
যুধ্যস্ব ভারত	২/১৮
নানুশোচিতুমর্হসি	২/২৫
ন ত্বং শোচিতুমর্হসি	২/২৭
ন বিকম্পিতুমর্হসি	২/৩১
উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ	২/৩৭
যুদ্ধায় যুজ্যস্ব	২/৩৮
নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন	২/৪৫
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবানু (ভব)	২/৪৫
মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ	২/৪৭
মা তে সঙ্গোঽস্তকর্মণি	২/৪৭
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি	২/৪৮
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ	২/৪৯
যোগায় যুজ্যস্ব	২/৫০
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্	৩/৮
কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর	৩/৯
অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর	৩/১৯
যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ	৩/৩০
(রাগদ্বেষৌ) তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ	৩/৩৪
পাপ্মানং প্রজহি	৩/৪১
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্	৩/৪৩
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বম্	৪/১৫
যোগমাতিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ ভারত	৪/৪২
তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন	৬/৪৬
সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ	৮/৭
সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন	৮/২৭
তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্	৯/২৭
ভজস্ব মাম্	৯/৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু	৯/৩৪

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্	১০/৪১
পশ্য মে পার্থ রূপাণি	১১/৫
পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্	১১/৮
তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্	
ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্	১১/৩৩
নিমিত্তমাত্রং ভব সবসাচিন্	১১/৩৩
ময়া হতাংস্ত্বং জহি	১১/৩৪
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্	১১/৩৪
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য	১১/৪৯
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়	১২/৮
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়	১২/৯
মৎকর্মপরমো ভব	১২/১০
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্	১২/১১
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ	১৬/২১
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি	১৬/২৪
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ	১৮/৪৮
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব	১৮/৫৭
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত	১৮/৬২
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু	১৮/৬৩
শৃণু মে পরমং বচঃ	১৮/৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু	১৮/৬৫
মামেকং শরণং ব্রজ	১৮/৬৬

গীতায় শ্রীভগবানের আদেশ

গীতা হইতে আমরা শ্রীভগবানের নিজ মুখনিঃসৃত এই অমৃতময় আদেশগুলি প্রাপ্ত হই। ইহা শ্রীভগবানের আদেশ, এইজন্য ইহার বৈশিষ্ট্যই এই যে বাক্যগুলি শ্রুতিমূলে প্রবেশমাত্রই যেন একটা নব জাগরণ আনিয়া দেয়, প্রাণে একটা অভিনব শক্তি সঞ্চার করে, মনে একটা সহজ শ্রদ্ধা, একটা দৃঢ় বিশ্বাস, একটা conviction জাগাইয়া দেয়। ইহাদের মৌলিক সত্যতাই ইহাদের ভিতর হইতে এই শক্তিকে যেন ফুটাইয়া তোলে। ইহারা তাই নৈতিক বিধানের মতোই নিশ্চিত এবং স্পষ্ট আদেশ; moral law এর মতো categorical imperative। শত অসুবিধা সত্ত্বেও ইহাদের পালনের জন্য মন উদযুক্ত হইয়া উঠে, ইহারা যে অবশ্যকর্তব্য তাহা মন যেন আপনি মানিয়া লয় এবং কোনো কারণে পালনে অসমর্থ হইলে মনে একটা অশান্তি, অতৃপ্তি এমনকি গ্লানি পর্যন্ত বোধ করে।

এই আদেশগুলিকে যিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে পারেন তিনি কী কর্মক্ষেত্রে, কী যোগসাধনে, কী ভক্তির অমৃতাভিষিঞ্চনে, কী জ্ঞানের নিষ্ঠায় সমুন্নতি লাভ করিয়া জীবনকে সর্বভাবে সাফল্যমন্ডিত করিতে সক্ষম হন। কারণ আমরা এই আদেশগুলির মধ্যে কর্মীর প্রতি আদেশ, যোগীর প্রতি আদেশ ও ভক্তের প্রতি আদেশ অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই এবং এই আদেশগুলি ভগবান রণবীর ও ধর্মবীরকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত বীর সাধকগণকে দিয়াছেন। যথার্থপক্ষে এই বীরভাব, এই শৌর্য, তেজ, 'ধৃতির্দাক্ষ্যং'' এই ঈশ্বরভাব, এই নিয়মনশক্তি উদয় না হওয়া পর্যন্ত সাধন-সমরে জয়লাভ করা যায় না। তাই ভগবান সর্বাগ্রে মেঘমন্দ্রস্বরে উত্তেজনার মহাবাণী সাধকের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়া তাহার সুপ্ত কুন্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া তুলিলেন, তাহার দীক্ষার প্রথম পাঠ সমাপন করিলেন।

এমন মহা জাগরণের বাণী বুঝি আর কোথাও এমনভাবে শুনা যায় নাই। তাঁহার প্রথম আদেশ হইল মোহ বা তম ত্যাগের জন্য, দ্বিতীয় আদেশ হইল শোক বা রজ ত্যাগের জন্য। কারণ এই দুই হইল শ্রেয় পথের প্রধান পরিপন্থী। ইহাদের মধ্যে তম কাটে কর্ম-উত্তেজনায় বা আচরণে আর রজ বিদুরিত হয় বিচারণে বা বিচার সহ ধ্যানে।

সেইজন্য প্রথম কর্মাধিকারীর জন্য আদেশ হইল ঃ 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ', 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ' (২/৩), 'উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ' (২/৩৭), 'যুদ্ধায় যুজ্যস্ব' (২/৩৮)। এই প্রবল উত্তেজনার বাণী শুনিয়া যাঁহার অন্তরাত্মা ইহাতে সায় দিয়া জাগিয়া উঠে তাঁহার কাছে অমনি আসিয়া পৌঁছায় ভগবানের ঐ চিত্তশুদ্ধিকর কর্মের আদেশ, ঐ 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং' (৩/৮), 'তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর' (৩/৯), 'নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ' (৩/৩০), 'কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্' (৪/১৫)। এইরূপে নিষ্কাম কর্মের মহামন্ত্রই হইল ঃ

'কর্মণ্যেব্যধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।। ২/৪৭

অর্থাৎ এইভাবে আত্মোন্নতির জন্য যিনি কর্ম করিতে চান তাঁহাকে প্রথমেই কী করিতে হইবে? না, 'কর্মণ্যেব' অর্থাৎ অন্তঃকরণশোধক কর্মেই অধিকার, অর্থাৎ 'ময়েদং কর্তব্যং ইতি বোধো অস্তু'—আমার ইহা কর্তব্য এই বোধ, অর্থাৎ চিত্তশোধক কর্মের অনুষ্ঠানই আমার কর্তব্য এই বোধ, এই অধিকার লইয়া প্রথম কর্ম করিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে যে এখন এই অশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া জ্ঞানে, কিনা, বেদান্ত বাক্য-বিচারে আমার অধিকার উদয় হয় নাই। এই বিচার এখন আমার কর্তব্য নহে। যতক্ষণ অন্তঃকরণ অশুদ্ধ আছে ততক্ষণ আমি এই বিচারের অযোগ্য। এইভাবে ঐ শুদ্ধি-সাধনে আমার সমস্ত মনোযোগটা ঐ ভাবনাতেই কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে, সমস্ত attention টা concentrate করিতে হইবে। আর কর্ম করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে কী কর্মানুষ্ঠানকালে, কী তাহার পূর্বে বা পরে স্বর্গাদি বা সুখাদিরূপ যে কর্মফল তাহাতে যেন আমার অধিকার অর্থাৎ ইহা আমার ভোক্তব্য এ বোধ না থাকে। এ সময় কর্তাভাব মাত্র থাকিলেও ভোক্তাভাব একেবারে থাকিবে না আর কর্মটা কামনার বশবর্তী হইয়া করিলে চলিবে না, motivated by desire হইবে না, আর ফলের প্রতি দৃষ্টি চলিয়া গেল বলিয়া কর্ম-অকরণে যেন প্রীতি না দেখা দেয়, কর্ম না করার প্রবণতা না দেখা দেয়। এইগুলিই হইল নিষ্কাম কর্মীর প্রধান লক্ষণ।

প্রথমে সে শুধু কর্তব্যবোধেই কর্ম করে, তাহার ভোক্তৃত্বভাব থাকে না, সে কোনো ফল-কামনায় কর্ম করে না। তাহার কর্ম-প্রেরণাটা কামলোক হইতে আসে না, সে কামচালিত হইয়া কর্ম করে না, সে এমনকি কর্মে উদাসীনও হয় না। এইরূপভাবে আত্মশোধক পরার্থপর কর্ম যে করে, এইরূপে যে 'যজ্ঞার্থ' কর্ম করে তাহার চিত্ত হইতে রাগদ্বেষরূপ, কাম-ক্রোধরূপ রজ-তম

মল বিগলিত হইতে থাকে। সে তখন 'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ' (৩/৩৪) এই ভগবৎ আদেশ পালনের যোগ্যতা অর্জন করে এবং তাহার ফলে 'ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য পাপ্মানং প্রজহি' ও পরে 'কামরূপং দুরাসদম্ শত্রুং জহি' (৩/৪১, ৪৩) এই দুইটি আদেশ কার্যকরভাবে পালন করিয়া তাহাদের জয় করিতে সমর্থ হয়।

এইরূপ অধিকারী পুরুষই 'আত্মানং উদ্ধরেৎ নাবসাদয়েৎ' (৬।৫), আত্মাকে উদ্ধার করেন, প্রসন্ন করেন, অবসন্ন করেন না। তখনই তিনি যোগের যোগ্য হইয়া উঠেন, তখন তিনি দেহ-ইন্দ্রিয়ের শরণাগতি ত্যাগ করিয়া বুদ্ধির শরণে আসিয়া উপস্থিত হন, 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ' (২।৪৯) অবস্থা লাভ করেন এবং ভগবানের ঐ যে অমূল্য উপদেশ 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা', সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা' (২।৪৮), 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' (২।৩৮) হইয়া 'তাং তিতিক্ষস্ব' (২।১৪)—এইগুলি পালনে যত্নবান হন। তখনই তাঁহার প্রতি ঐ আদেশ, ঐ অনুজ্ঞা আসে 'যোগায় যুজ্যস্ব'। এই উপর হইতে, এই spritual plane হইতে যখন আদেশ আসে তখন তাহার সিদ্ধিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া যায়, কেননা তাহা তো অযোগ্যের প্রতি আদেশ নহে, পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তির নিকট আসে বলিয়া ইহা পরম শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া তোলে এবং এই শ্রদ্ধারূপ সংবেগ হইতেই সিদ্ধিও আসিয়া যায়। তখন তাহার দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনের সকল তন্ত্রীতেই 'যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ' (৪।৪২) এই ধ্বনি রণিয়া উঠে।

এইরূপে যোগস্থ হইয়া কর্ম করিতে হইলে দুইটি জিনিস বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হয়। প্রথম সঙ্গত্যাগ ও দ্বিতীয় সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হইতে হইবে। এই সমত্বকেই প্রধানত কর্মযোগ বলে। সাধারণত মনে হইতে পারে যে যদি কর্তৃত্ব-অভিনিবেশ ও ফলাকাঙ্খাই না থাকে তাহা হইলে তো কর্মে প্রবৃত্তিই চলিয়া যাইবে, কর্মে সমস্ত উত্তেজনাই হারাইয়া যাইবে। আমরা সকাম কর্মের ক্ষেত্রে রহিয়াছি বলিয়া, রজ ক্ষেত্রে রহিয়াছি বলিয়াই আমাদের মনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যিনি সাত্ত্বিক কর্তা তিনি 'মুক্তসঙ্গ অনহংবাদী' হইয়াও যে 'ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিত' হইতে পারেন এটা এই ভূমিতে না আসিলে, এই অবস্থা লাভ না করিলে কিছুতেই ধারণা করিতে পারা যায় না। কেবলই মনে হয় ইহা অসম্ভব। কিন্তু একবার যদি ভাগ্যক্রমে এই অবস্থা লাভ হইয়া যায় তখন দেখা যায় ইহাই তো স্বাভাবিক। গীতার উদ্দেশ্যই হইল সাধককে প্রথম সাত্ত্বিক কর্তা করিয়া তোলা এবং তাহার ফলে তাহাকে সমতার ভূমিতে স্থাপন করা।

কর্ম হইতে এই সমতারূপ যোগভূমিতে আসিতে হইলে মাঝখানে চাই বিচার। যজ্ঞরূপ কর্মের অনুষ্ঠানে, বুদ্ধিযুক্ত কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তের যে

নির্মলতা সাধিত হয় তাহাই বিচার বা বিবেকে যোগ্যতা আনিয়া দেয়। এই বিচারই মানুষকে প্রথম সুখ-দুঃখ সহনশীল করিয়া দেয়, তাহারা 'আগমাপায়ী অনিত্য' এই বোধ দৃঢ় করিয়া দিয়া তাহাদের তিতিক্ষা করার অভ্যাস করাইয়া দেয়। সেইজন্যই ভগবান যোগপথে প্রবেশ ইচ্ছুক সাধককে প্রথমেই বুদ্ধির শরণ গ্রহণ করিতে বলিলেন। এই বুদ্ধির শরণে যাওয়ার অভ্যাস করিতে করিতে যেদিন সাধক বুদ্ধিযুক্ত হয় সেইদিন তাহার সুকৃত-দুষ্কৃতও, পুণ্য-পাপও কাটিয়া যাইতে থাকে। এই কৌশলটাই 'যোগ'। কর্ম করিয়াও কর্ম যাহাতে লেপ না দেয়, কর্ম যাহাতে বন্ধন সৃজন না করে, এই কৌশলটা জানিয়াই সাধককে কর্ম করিতে হইবে।

সে-কর্ম আবার নিয়ত করিতে হইবে, নিয়মিতভাবে করিতে হইবে, নিত্য করিতে হইবে। কাহার জন্য করিতে হইবে? ভগবান বিষ্ণুর জন্য, যজ্ঞপুরুষের জন্য, নিজের 'বড়ো আমি' বা higher self-এর জন্য করিতে হইবে। প্রথমে এই উচ্চ আদর্শ, এই high ideal সম্মুখে রাখিয়া কর্ম করিতে হইবে, পরে তাহাও আবার মুক্তসঙ্গ হইয়া করিতে হইবে। তাই পরে গিয়া বলিলেন ঃ

'নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে।।' (১৮। ২৩)

এইভাবে কর্ম করিলে তবে কর্মটা একটা উঁচু পর্যায় উঠিবে, spritualised হইবে।

সাধককে এইরূপে সাত্ত্বিকতায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই ভগবানের প্রচেষ্টা, ইহাই সমস্ত সাধনার রহস্য। তাই তাঁহার আদেশ হইল 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর' (৩। ১৯), 'নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ' (৩। ৩০), 'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ, তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ' (৩।৩৪)। এই রাগ-দ্বেষকে সরাইতে পারিলেই উপরে উঠিবার পথ নিরর্গল হয়। সাধকের কল্যাণার্থ ভগবান এই কর্মাঙ্গ-শোধনের জন্যই সর্বাপেক্ষা অধিক উপদেশ একেবারে আদেশের মতো করিয়া দিয়াছেন।

এই রাগ-দ্বেষ অতিক্রম করিতে হইলে কী করিতে হইবে? প্রথমে 'ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য পাপ্মানং প্রজহি' করিতে হইবে, পরে মনকে ক্রমশ ধাপে ধাপে এক এক গ্রাম করিয়া চড়াইয়া বুদ্ধির পারে যিনি তাঁহাতে গিয়া মনকে লাগাইতে পারিলে তবে ধ্যানযোগের অধিকার লাভ হইবে এবং ধ্যান সহজ স্বাভাবিকভাবে লাগিলেই কাম নত ও শেষে হত হইবে। পূর্ব পূর্ব বরেণ্য সাধকবর্গ এইভাবে সাধন করিয়া, এইভাবে কর্ম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন

এবং এইভাবে কর্ম করাই হইল ভগবানের অভিমত।

'যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ।।' (৩। ৩১)

এই শ্লোকে তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ করিলেই আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত না করিয়া উদ্ধার করা হয় এবং ইহাই মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য।

এই কর্মপাশ ছেদন করিতে হইলে কিসে কর্মবন্ধন সৃজন করে তাহা জানাও প্রয়োজন হয় কারণ বন্ধনের কারণগুলি জানা না থাকিলে তাহাদের এড়ানো যায় না। সেইজন্যই ভগবান বন্ধনের হেতুগুলিও নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবানের তৃপ্তির জন্য কর্ম না হইয়া যদি নিজ দেহেন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির জন্য কর্ম হয় তাহা হইলেই কর্ম বন্ধনের কারণ হয়, 'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ' (৩। ৯), প্রকৃতির গুণে বিমুগ্ধ হইয়াই অজ্ঞজন ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্যে আসক্ত হয়, 'প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু' (৩।২৯), ঈশ্বরনিষ্ঠাবিমুখ অযুক্ত ব্যক্তি কামনাবশত ফলপ্রত্যাশী হইয়া বদ্ধ হয়, 'অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে' (৫। ১২)। জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া জীবসকল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে, 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ' (৫।১৫)। জগতের সমস্ত লোক ত্রিগুণাত্মক ভাবে বিমোহিত বলিয়াই ভগবানকে জানিতে পারে না এবং সেইজন্যই তাহাদের বন্ধনও ঘুচে না।

'ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।' (৭। ১৩)

ভগবানের কর্ম সম্বন্ধে আদেশগুলি পালন করিয়া এই পাশগুলি ক্ষীণ করিলে এবং ধীরে ধীরে চিত্তের মল অপসারিত হইলে 'যুক্ত' হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়, কেননা এইভাবে কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে চিত্ত যত নির্মল হয় তত মানুষ 'যতচিত্তাত্মা' হইয়া ওঠে। এই যতচিত্তাত্মারই যোগে অধিকার। সেইজন্যই বলা হইয়াছে 'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে' (৬। ৩)। ভগবানও সেইজন্য এইরূপ যতচিত্তাত্মাকেই 'যোগং যুঞ্জ্যাৎ' (৬। ১২), 'সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ' (২।৬১), 'বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্' (৩।২৬) আদি যোগসাধন-উপযোগী উপদেশ প্রদান করিলেন।

এইরূপে বিষয়প্রবণ চিত্ত যখন স্বভাবত ধ্যানপ্রবণ হইয়া উঠিল এবং সমস্ত সংকল্পপ্রভব কাম 'অশেষতঃ' অর্থাৎ নিঃশেষে চিত্ত হইতে ধুইয়া পুঁছিয়া গেল, যখন 'সমন্ততঃ' সমস্ত দিক হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম 'মনসৈব বিনিয়ম্য', মনের দ্বারাই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুণ বহির্মুখতা হইতে নিবৃত্ত হইয়া গেল, তখন যোগের আর এক ধাপ উপরে তুলিবার জন্য, যোগের নিরোধভূমি পর্যন্ত

লইয়া যাইবার জন্য ভগবান সাধককে বলিলেন 'স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা' (৬।২৩)। তবে এটা হাঁকপাঁক করিলে বা তাড়াতাড়ি করিলে হইবে না। সেইজন্যই সাধককে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন 'শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া' (৬।২৫), এবং এইরূপে শক্তি অর্জিত হইলে তখন 'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ' (৬।২৫), এবং যতবার মন এই স্থিরত্বের ভূমি হইতে, এই নিরুদ্ধ ভূমি হইতে ব্যুত্থিত হইবার উপক্রম করিবে ততবারই 'ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ' (৬।২৬)। এইরূপে নিরন্তর অতন্দ্রিতভাবে অভ্যাস করিতে করিতে যেমন অভ্যাস পরিপক্ক হইতে থাকে ও তৎসহ চিত্তের রজবৃত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে তত চিত্ত, যুক্ত, যুক্ততর ও শেষে যুক্ততম অবস্থা লাভ করে।

এইরূপে যজ্ঞের ফলে প্রথমে অসক্ত বুদ্ধি ও পরে যোগের ফলে যুক্ত বুদ্ধি লাভ করিতে পারিলে সাধক আরও উচ্চভূমিতে উঠিবার যোগ্য হয় এবং তখনই হৃত স্মৃতি, নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া পাইতে থাকে। সেইজন্য ভগবান যোগের এত প্রশংসা করিয়া বলিলেন 'তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন' (৬। ৪৬)। এখনও কিন্তু যুদ্ধ-নিবৃত্তি সম্পূর্ণ হয় নাই, তবে পূর্বে ছিল কামাদির সঙ্গে শুধু একক প্রযত্নে সংগ্রাম, এখন হইল অবিস্মৃতিকে সঙ্গে সাথী রাখিয়া সংগ্রাম, অনুস্মরণ সহযোগে যুদ্ধ। সেইজন্য এই সময়ের আদেশ হইল 'মামনুস্মর যুধ্য চ' (৮। ৭) এবং এই যুদ্ধে জয়ী হইলে তখন 'সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন' (৮।২৭)।

ইহাই হইল উপদেশ। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অসময়ে, অনধিকারে কিছুই লাভ হয় না। প্রকৃতিরূপা জননী যেমন দেহ ইন্দ্রিয়াদির পরিপোষণ ও পরিবর্ধনের সময় পরিণতির এক এক পর্ব সমাপ্ত করিয়া অন্য পর্বের অবতারণা করেন, পিতারূপী শ্রীভগবানও জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত অধিকার লাভের পরই, উপযুক্ত সময়েই তৎকাল ও তৎ তৎ অধিকার উপযোগী সাধনের আদেশ করিয়া চলিয়াছেন।

এইরূপে আত্মযোগে যুক্ত হইলে তবে ঈশ্বরযোগে যুক্ত হইবার অধিকার লাভ হয় এবং তখনই যথার্থ ভজন শুরু হয় ; ভগবানও সাধককে সর্বপ্রকারে উন্নত হইতে দেখিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া সর্বপ্রধান যে সাধন 'ভজন' এইবার তাহারই উপদেশ দিলেন ''ভজস্ব মাম্'' (৯। ৩৩)। এবং সেই ভজনের ক্রম 'মাং নমস্কুরু' হইতে আরম্ভ করিয়া ধাপে ধাপে 'মদ্‌যাজী ভব' 'মদ্ভক্তো ভব' ও শেষে 'মন্মনা ভব' (৯। ৩৪) বলিয়া পরম ভজনের ভাব শিক্ষা দিলেন। ইহাই 'মৎপরায়ণ' হইয়া 'ময়ি যুক্ত' হইবার উপায়।

এইরূপে যিনি পরম ভজননিষ্ঠ হন তিনিই ক্রমশ সকল ভাব ভগবানে অর্পণ করিয়া 'মৎপর' হইয়া 'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য' (১২।৬) করিতে

যেমন সক্ষম হন তেমনি 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি' হইয়া 'ময্যাবেশিতচেতসাম্'-ও (১২।৭) হইয়া যান। এইরূপ সাধকই 'অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে' (১২।৬) অবস্থা লাভ করেন। এই ভজন-ভূমিতে আসিয়া ভগবানের উপদেশ হইল 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্' (৯।২৭)।

এইভাবে ভক্ত যত ভগবৎভাবে ভরিত হইতে থাকেন তত তাঁহার অহংভাবও বিগলিত হইতে থাকে এবং তখন তিনি নিমিত্তমাত্র, ভগবানের হাতের যন্ত্রমাত্র হইয়া উঠেন। তাই ভগবানের আদেশ 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' (১১।৩৩)। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ আদেশ বা উপদেশ হইল 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়' (১২। ৮) এবং এখানেও ভগবান একবার সংক্ষেপে দেখাইয়া দিলেন যে ধাপে ধাপে সাধক কেমন করিয়া এই সর্ব সমর্পণের অবস্থা লাভ করে। প্রথম ফলত্যাগ, পরে মৎকর্মপরতা, পরে অভ্যাসে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা এবং শেষে মৎসংস্থতা।

এই ভূমি পর্যন্ত যে সাধক আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন তিনিই অসঙ্গ শস্ত্র অর্জন করিয়া তদ্বারা সংসারবৃক্ষের মূলসকল দৃঢ়ভাবে ছেদন করিয়া পরম পুরুষের অনুসন্ধানে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভবে আনিবার জন্য প্রবলবেগে ধাবিত হইতে সক্ষম হন এবং আদ্যপুরুষে প্রপন্ন হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত পরিচ্ছেদের পারে, সমস্ত কুণ্ঠার পারে ভগবৎধামে বৈকুণ্ঠে যাইয়া উপনীত হইবার ও তথায় নিবাস করিবার যোগ্য হন, 'নিবসিষ্যসি ময্যেব' (১২।৮) অবস্থা লাভ করেন।

এই সুমহান সুউচ্চ সাধনসৌধ নির্মাণ করিয়া পাছে ইহার গোড়ায় কিছু গলদ থাকিয়া যায় তাই একবার ইহার মূল ভিত্তির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সাধককে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিলেন যে দেখ, ইহার বনিয়াদ হইতেছে ঐ 'ত্রয়ং ত্যজেৎ' এর উপর, এটা যেন কোনোদিনই ভুল না হয়। এই সুমহান জীবন লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে ঐ ত্রিবিধ নরকের দ্বার যে কাম, ক্রোধ লোভ তাহাদের ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ইহারাই আত্মনাশের হেতু।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।। (১৬। ২১)

এই ত্যাগ না হইলে কিন্তু পরম বিশুদ্ধ পরম পবিত্র ভগবদ্ধামের দ্বারেও গিয়া পৌঁছানো যায় না, দ্বার খোলা দূরের কথা। শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম শ্রদ্ধাসহকারে করিয়াই এই নরকের দ্বার উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।। (১৬।২৪)

পাছে সাধক কোনোপ্রকার ভ্রমে পড়িয়া পথভ্রষ্ট হয়, তাই উপসংহারে

ভগবান তাঁহার 'নিশ্চিতং মতমুত্তমম্' ঘোষণা করিয়া তাহার পরম কল্যাণ সাধন করিলেন।

ভগবানের এই মত বা স্পষ্ট অভিপ্রায় শ্রদ্ধার সঙ্গে নিত্য অনুষ্ঠান করিলেই জীব যথার্থ উন্নতি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। সেই আদেশ বা উপদেশ হইল যে 'যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ' (১৮। ৫), কেননা ইহাদের মতো পাবক, পবিত্রকারক সংসারে অন্য কিছু নাই। ইহারা 'পাবনানি মনীষিণাম্' (১৮।৫)। কীভাবে এই কর্ম করিলে শুদ্ধির সাধক হয় তাহাও বলিলেন ঃ

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।। (১৮। ৬)।

এই কর্মই হইল রূপান্তরের হেতু, transforming agent। সেইজন্য সহজ কর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নয়—'সহজং কর্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ' (১৮। ৪৮)। এইরূপে কর্মানুষ্ঠানের ফলে চিত্ত যত মার্জিত, যত শুদ্ধ ও সুসংস্কৃত হইতে থাকে তত তাহার গতি উর্ধ্বাভিমুখী, ভগবৎ-অভিমুখী হইতে থাকে এবং তাহার ফলে সে বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া 'চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য' (১৮। ৫৭) করিতে সক্ষম হয় এবং এইরূপে কর্ম ভগবানে অর্পিত হইলে মৎপরতা ও সতত মচ্চিত্ততা দেখা দেয়। তখন সে সেই বুদ্ধিযোগ লাভ করে যাহার ফলে সে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় যে সমস্ত প্রেরণাটা আসিতেছে ভগবানের নিকট হইতে, এবং যত এই ধারণাটা দৃঢ় হয় তত সে সর্বভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে থাকে এবং তৎপ্রসাদে এক পরমা শান্তিতে তাহার চিত্ত ভরিয়া ওঠে। শেষ আদেশ তাই 'তমেব শরণং গচ্ছ' ও 'মামেকং শরণং ব্রজ'।

তখন এই সমস্ত তত্ত্ব সে বড়ো রসের সঙ্গে আলোচনা করিতে থাকে এবং যত আলোচনা করে তত তাহার ভগবানের পানে চিত্তের গতি মহাবেগে ধাইয়া চলে এবং সে একেবারে তাঁহার চরণে নিজেকে ঢালিয়া দেয়, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন হইয়া যায়। এইরূপে সে নিয়ত ভগবৎচরণে প্রণত হইতে হইতে নিয়ত তাঁহার যজনশীল হইয়া উঠে। তখন ভক্তিরসে চিত্ত অভিষিঞ্চিত হইয়া যায় এবং ভক্তির এই প্রবল আকর্ষণে, ইহার প্রভাবে তাহার ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য অতিক্রমণ হইয়া যায়, সে এই দ্বন্দ্বময় রাজ্য ছাড়াইয়া উঠিয়া ঐ এক-শরণ যে পরম ঈশ্বর পরমাত্মা, তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যায় এবং তাঁহারই করুণা-প্রসাদে সর্ব পরিচ্ছিন্নতার পারে আসিয়া উপনীত হয়।

এই মহান আদেশগুলি সকল সাধকের কণ্ঠহার করিয়া রাখা উচিত। ইহাদের প্রথমটি হইল 'উত্তিষ্ঠ', দ্বিতীয় হইল 'যুধ্যস্ব', তৃতীয় হইল 'যোগায় যুজ্যস্ব', চতুর্থ হইল 'ভজস্ব' আর পঞ্চম হইল 'আবেশ্য', 'প্রবিষ্টো ভব'।

গীতোক্ত সাধনার ধারা

গীতা দেখাইয়াছেন যে মানুষ প্রথমে যজ্ঞ দ্বারা হয় 'ক্ষয়িত-কল্মষ', যোগ দ্বারা হয় 'বিগত-কল্মষ' শেষে জ্ঞান দ্বারা 'নির্ধূত-কল্মষ' হইলেই ক্রমশ শান্তি ও মুক্তি আসিয়া উদয় হয়। এই বুদ্ধির শুদ্ধিই হইল ভেদের মধ্যে অভেদকে দেখা। এটা একটা expanded state of consciousness। এখানে বুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শীও যেমন হয় একত্বদর্শীও তেমনই হয়, discriminating যেমন হয় unifyingও তেমন হয়, ইহা পরম জটিলতার মধ্যে পরম সমতা, greatest complexity-র মধ্যে perfect harmony, perfect equality। এটা তাই complete self-simplification। এই 'কেবল ভাব' হইতেই আসে কৈবল্য। এইরূপে বুদ্ধি হইতে মল, বিক্ষেপ, আবরণ অপনীত হইলে, রজ-তম ভাব বিদূরিত হইলে তবে বুদ্ধি প্রসন্ন শান্ত হইয়া ভগবৎ-অভিমুখে, ঊর্ধ্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলে।

এই বুদ্ধির শুদ্ধির জন্য প্রথমে যজ্ঞরূপ প্রশস্ত কর্মের আচরণ প্রয়োজন হয়। প্রকৃতি যেমন কর্মের ভিতর দিয়াই বুদ্ধিকে ফুটাইয়া লইয়া চলিয়াছেন তেমনি সাধককেও এই কর্ম আশ্রয়েই প্রথমে বুদ্ধিকে কুশল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে, well organised, well disciplined, well trained করিতে হইবে। এই বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন 'tied idea' 'free idea'য় পরিণত হয় তেমন তেমন সাধুভাব সদ্‌ভাব উদয় হইতে থাকে। এই সদ্‌ভাবই পরে ব্রহ্মভাব ও পুরুষোত্তমভাবে লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। এই বুদ্ধির বিকাশের ক্রম হইতেই আমরা মানবজীবনের ক্রমোন্নতির ধারাটাও দেখিতে পাই। প্রথমে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করিতে করিতে বুদ্ধি যেমন 'একা' হয় তেমনি 'অসক্ত'ও হয়, এবং বুদ্ধি একা ও অসক্ত হইলেই ব্যাপক হইয়া উঠে, সাত্ত্বিক হইয়া উঠে এবং তখনই বিবেকে যোগ্যতা দেখা দেয়।

বুদ্ধি কখন স্থিতিলাভ করে ঃ

তাহা হইলেই দেখা গেল গীতায় সাধনটা আরম্ভ হইল 'যজ্ঞ-ক্ষয়িতকল্মষ' হইতে। তাহার পর বুদ্ধি স্থিতি লাভ করে কেমন করিয়া, তাহা

দেখা আবশ্যক। সমস্ত মনোগত কাম চলিয়া গেলে অর্থাৎ সমস্ত mental planeটা desire bodyটার level ছাড়াইয়া উঠিলে আত্মায় আত্মার তোষ বা সন্তুষ্টি দেখা দেয় এবং তাহার ফলে বুদ্ধি নিশ্চল ও অচল হয়। এইরূপে যখন দুঃখেতে উদ্বেগ ও সুখেতে স্পৃহারূপ রজোবৃত্তি চলিয়া যায়, রাগ ভয় ক্রোধ বিগত হয়, তখনই বুদ্ধি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এই স্থিরতা জড়তা নহে, ইহা সমাধিমগ্ন অবস্থায় স্থিরতা। এইরূপে যিনি সর্বত্র 'অনভিস্নেহ', শুভাশুভ প্রাপ্তিতে 'নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি', যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে অতি সহজে সংহরণ করিতে পারেন, যাঁহার মনের স্বাভাবিক গতি অন্তর্মুখ হইয়া যায়, স্বাভাবিক trend ঊর্ধ্বমুখী হয়, তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থির হয়। যাঁহার বশে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ আসিয়া গিয়াছে, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে সংযম করিয়া 'মৎপর' হইতে পারিয়াছেন, যিনি নিরন্তর ভগবদ্‌ভাবে যুক্ত থাকেন তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপে ভগবদ্‌ভাবে চিত্ত আবিষ্ট হওয়ার পূর্বেও যদি রাগদ্বেষশূন্য হইয়া চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ স্বচ্ছ স্বস্থ হয় তাহা হইলেও প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনিভাবে আবার যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয় হইতে, ভোগ হইতে স্বতঃ বিমুখ হইয়াছে, সহজভাবে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞাও স্থির হয়।

কখন নিরুদ্ধ হয় ঃ

তাহা হইলেই দেখা গেল, সংযমই স্থিরবুদ্ধির হেতু এবং রজ-তম মল অপনয়নই সংযমের হেতু। ইহা হইল যজ্ঞ ও যোগের ফল। ইহার পর সাধক যখন আরও অগ্রসর হইয়া চলেন তখন এই স্থিরতা বাড়িতে বাড়িতে একেবারে 'নিরুদ্ধ' অবস্থা আনিয়া দেয়। ইহার পর তিনি মহা প্রেমের আকর্ষণে পরম প্রসন্নতা লাভ করিয়া জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় হন এবং তৎফলে কর্মে অকর্ম দর্শন করেন। তাঁহার যুক্ততা আর ভঙ্গ হয় না। তিনি তাহার নিচের ভূমিতে আর বসবাস করিতে পারেন না, এমনকি সেই ভূমিতে শ্বাস গ্রহণ করাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে। Desire and passionএর অনেক ঊর্ধ্বে তিনি উঠিয়া যান। যিনি জীবিত অবস্থাতেই কাম-ক্রোধের বেগ সহন করিতে সক্ষম হন তিনিই যখন যুক্ত অবস্থা লাভ করেন, তখন সেই কাম-ক্রোধ-বিমুক্ত যিনি, তাঁহার বুদ্ধি তো স্বতঃই সতত যুক্ত হইয়া যাইবে।

সুতরাং যিনি জগৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ক্ষর-অক্ষরতত্ত্ব এবং পুরুষোত্তম তত্ত্ব পর্যন্ত এই অতি বিশুদ্ধ ও পরম যুক্ত বুদ্ধির ফলে জানিতে সক্ষম হন তিনি বৈশারদী, অতি বিশাল বুদ্ধি লাভ করিয়া পূর্ণ বুদ্ধিমান হইয়া উঠেন। তাঁহার

comprehensive জ্ঞানের কাছে আর কোনো তত্ত্বই অবিদিত থাকে না, তিনি যেন ভগবানের মহৎ বুদ্ধির কোলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেই সুউচ্চ ভূমি হইতে সকলই সুস্পষ্টরূপে দেখিয়া সকল সংশয়ের পারে চলিয়া যান।

শ্রেয় প্রাপ্তি ও সিদ্ধি ঃ

যজ্ঞ দ্বারাই মানুষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহাদের 'ইষ্ট-কামধুক্' অভীষ্ট কামনা সব দোহন করিয়া আনে। ইহার দ্বারাই মনুষ্যভাবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া দেবতার ভাব প্রাপ্ত করা যায়। সেইজন্য যজ্ঞই হইল সর্ব অভ্যুদয় বা উন্নতি লাভের হেতু, অথবা যে কর্ম এই পরম অভ্যুদয় আনিয়া দেয় তাহাই যজ্ঞকর্ম। এইরূপে যজ্ঞের দ্বারা দেবভাবের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে পর্যন্ত দিব্য করিতে পারিলে একটা 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ' অবস্থা আসিয়া যায় আর এই আদান-প্রদান, এই 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ' হইতে পারিলেই পরম শ্রেয় লাভের পথও নির্গল হইয়া উঠে।

যজ্ঞতত্ত্ব ঃ

এইজন্য এই যজ্ঞতত্ত্বটা ভালো করিয়া বুঝিয়া ইহার অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়াই উন্নতিকামী মনুষ্যের প্রথম কর্তব্য। এই যজ্ঞটা এক হিসাবে তেজ বৃদ্ধির, energy বৃদ্ধির অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, spiritual science। ইহাতে মানুষ 'দীপ্তাগ্নি' হয়। যদিও ইহা জ্ঞানাগ্নি, ইহা বাহ্য অগ্নিরই counterpart। এইজন্য বাহ্য অগ্নিই ইহার প্রতীক। ইহাই দেহে জঠরাগ্নি, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়াগ্নি, মনে সংযমাগ্নি, বুদ্ধিতে বিবেকাগ্নি ও প্রজ্ঞায় আত্মসংযমযোগাগ্নি। ধাপে ধাপে একের পরে এক করিয়া এই অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তদুপযোগী ইন্ধন তাহাতে প্রদান করিতে পারিলে ইহা 'ব্রহ্মবর্চস' দ্বারা সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনকে ছাইয়া ফেলিয়া এক অভিনব প্রতিভামণ্ডিত করিয়া তোলে। এইজন্যই যজ্ঞের স্থান হিন্দু-সাধনায় এত উচ্চে। বিজ্ঞানে energy-র স্থানটা যেমন সবচেয়ে বড়ো, এখানে অগ্নির স্থানটাও তেমনি সবচেয়ে বড়।

এই অগ্নিই প্রাণরূপী মহাশক্তি। ইনি material energyও যেমন, life or vital energyও তেমন। তাই ইনি আদ্যাশক্তি। শুদ্ধ আত্মার নিচেই ইঁহার স্থান অথবা ইনি শুদ্ধ আত্মা হইতে অভিন্ন। সাধককে প্রথমে এই অগ্নিতত্ত্ব

জানিয়া তাহাকে অধিগত করিতে হয়, তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয়। পরে আত্মতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করা যায়। এই অদ্ভুত তেজের প্রভাবে যখন সমস্ত মলিনতা দগ্ধ হইয়া যায়, সমস্ত খাদ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন খাঁটি ধাতু pure metalটা নিজ প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। তখনই অনৃত অংশ দগ্ধ হওয়ার ফলে ঋত অংশ সুস্থির হইয়া ফুটিয়া উঠে এবং ইহাই এইরূপে যেন সত্যকে দ্যুলোক হইতে ভূলোকে নামাইয়া আনে, দেবগণকে মর্তে আনিয়া স্থাপন করে, পৃথিবীকে সোমধারায়, অমৃতধারায় অভিষিঞ্চিত করে। এই যজ্ঞশেষরূপ অমৃত-ভোজনে সাধক সর্ব 'কিল্বিষ', সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ও দেবতারা এইরূপে যজ্ঞভাবিত হইয়া এই ইষ্ট ভোগ প্রদান করেন।

কর্মজা সিদ্ধি ও পরমা সিদ্ধি ঃ

মনুষ্যলোকে সিদ্ধিটা কর্ম হইতেই শীঘ্র আসে। এখানকার সিদ্ধিই কর্মজা এবং এই ক্ষুদ্র সিদ্ধিগুলি মানুষ বিশেষ বিশেষ দেবতার নিকট হইতে particular energy-র centre হইতেই পাইয়া থাকে। কর্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়েই নিঃশ্রেয়সকর সন্দেহ নাই, তবে মানবের নিকট কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ কেননা মানুষ এই অধিকার, এই সংস্কার, এই বোধ লইয়াই আসিয়াছে। সম্যক্‌রূপে ইহাদের একটার অনুষ্ঠান হইলে উভয়েরই ফল লাভ হইয়া থাকে।

এই কর্মই সিদ্ধির প্রধান সোপান আর 'মামুপেত্য' হইলে পরম সিদ্ধিলাভ হয়। এই কর্মের মধ্যে আবার 'মদর্থ' অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম হইলে পরম সিদ্ধি শীঘ্র আসিয়া যায়। সেইরূপ আবার ' উত্তম জ্ঞান' লাভ হইলে 'পরমাং সিদ্ধিং' প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইজন্য উপসংহারে ভগবান গীতায় বলিলেন যে স্ব স্ব কর্মে 'অভিরত' হইলে মানুষ 'সংসিদ্ধি'কে লাভ করে বটে কিন্তু এই স্বকর্মের দ্বারা ভগবান 'অর্চিত' হইলেই যথার্থ সিদ্ধি দেখা দেয়, কেননা এইভাবে কর্ম করিলেই কর্ম সর্বত্র 'অসক্ত' বুদ্ধি আনিয়া দেয় এবং তাহার ফলে সাধক 'জিতাত্মা' ও 'বিগতস্পৃহ' হইয়া পরম 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ জ্ঞানরূপ মহাসিদ্ধি লাভ করেন। নতুবা কর্মের অনারম্ভ হইতে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি আসে না আর তাড়াতাড়ি হাত পা গুটাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলাম ভাবিলে 'ন সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি'। এটা ঐ উটপাখির বালুকার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া নিরাপদ হওয়ার চেষ্টার মতো ব্যর্থই হইয়া থাকে।

সমাধি উদয়ের ক্রম ঃ

এই কর্মজা সিদ্ধির ফলে যেমন অসক্ত বুদ্ধির উদয় হয় তেমনি একাগ্রতা ও বুদ্ধির সুক্ষ্মতাও বাড়িতে থাকে। এই একাগ্রতাই ধারণা হইতে ধ্যানে লইয়া গিয়া পরে সমাধিতে নিশ্চল ও অচল করিয়া দেয়। এইখানে আসিয়াই যথার্থ যোগ লাভ হয়। এই বুদ্ধি-শুদ্ধির ফলেই সংযম দেখা দেয় এবং সংযতচিত্ত সাধকই অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিতে, মনের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। কারণ প্রথমে 'যতাত্মা' হইয়া যিনি যোগ-সাধনে যত্ন করেন, তিনিই 'উপায়তঃ' উপায় দ্বারা যোগ 'অবাপ্তুম্ শক্য' প্রাপ্তির যোগ্য হন।

এইরূপে চিত্তের একাগ্রতার ফলে আসে প্রসন্নতা। এই অধিকারী পুরুষের যোগ-সাধনের ফলে রাগ-দ্বেষ বিযুক্ত হইয়া 'আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা' হইলে তখন 'বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্' হইয়াও 'প্রসাদমধিগচ্ছতি'। এই প্রসাদ উদয় হইলে অবসাদ যেমন কাটে তেমনি বুদ্ধিও 'পর্যবতিষ্ঠতে'। এই প্রসাদ সত্ত্ব উদয়েরই ফল, কেননা প্রসন্নতা বা স্বচ্ছতা সত্ত্বেরই নির্মল ফল। আর যজ্ঞ-দান-তপ রূপ কর্ম সত্ত্ব উদয়ের হেতু। ইহারাই পরম পাবক, 'পাবনানি মনীষিনাম্'।

এইরূপে বুদ্ধি শুদ্ধ হইতে হইতে যেমন যেমন expansion and concentration বাড়িতে থাকে তেমন তেমন ভগবানের বিভূতি ও যোগতত্ত্ব চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং সেই 'সর্বাশ্চর্যময়ং'কে দেখিতে দেখিতে মানুষ মুগ্ধনেত্রে তাহাতেই তন্ময় হইয়া যায়। তাই 'অবিকম্পেন যোগেন যুঁজ্যতে'।

মম সাধর্ম্য ও মদ্ভাব লাভ ঃ

এইরূপে যত ভগবানের সঙ্গে গাঢ় গাঢ়তর সম্বন্ধ হইতে থাকে তত যেন সাধকের গায়ে তাঁহার রং ঢং লাগিয়া যাইতে থাকে, সে যেন তাঁহার ধর্মে ধর্মী হইয়া উঠিতে থাকে, 'মম সাধর্ম্যং আগতা' হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধর্মাধর্ম খসিয়া যাইতে থাকে। তখন সহজ নির্বেদ আসিয়া দেখা দেয়, কেননা তখন বুদ্ধির মোহকলিল কাটিয়া যায়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই পরিপূর্ণ মিলনের পথ নিরর্গল হয়, আর মিলন পরিপূর্ণ হইলেই 'মদ্ভাবং আগতা' হইয়া যায়। গুণাতীতরূপ পরম সমত্বজ্ঞান 'উপাশ্রিত্য' হইলে ভগবানের সাধর্ম্য লাভ হয়। তখন তাঁহার মহৎ বুদ্ধির সঙ্গে একত্ব লাভ হয়, তখন সে সর্বাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব অবস্থা লাভ করে আর 'মন্ময়া মামুপাশ্রিতা' হইলে 'মদ্ভাবমাগতা' অবস্থা প্রাপ্তি করে। ইহাই 'বিশোকা' অবস্থা।

ভগবানে নিবাস ঃ

এইরূপে 'মম সাধর্ম্য' ও 'মদ্ভাব' যখন সকল ভাবের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে তখনই ভগবানে নিবাস বা অবস্থিতি লাভ হয়। তখন সর্বভূতস্থিত ভগবানকে অভেদরূপে, 'একত্বমাস্থিত' রূপে ভজনা আরম্ভ হয় এবং এই অখণ্ড ধ্যানের ফলে যেমন সমস্ত আবরণের মধ্য হইতে তাঁহাকে চিনিয়া বাহির করা হয়, তেমনি অন্তকালেও তিনি আর স্মরণ-পথের বহির্ভূত হইতে পারেন না। তিনি নিজে আসিয়া যেন হৃদয় জুড়িয়া আলো করিয়া বসেন আর সাধক সেইভাবে ভাবিত হইয়া দেহত্যাগ করতঃ 'মদ্ভাবং-যাতি'।

আবার ভক্ত যখন ক্ষেত্রতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও জ্ঞেয়তত্ত্ব বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া তাহাদের বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ করিয়া 'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি' অবস্থা প্রাপ্ত হয় আর 'গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি' হয়, তখনো 'মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি'।

এই 'মদ্ভাব' প্রাপ্তির তারতম্য আবার 'বহুত আছয়'। কখনো পরম পুরুষ রূপের ভাব প্রাপ্তি, কখনো ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি, কখনো পরম স্থান প্রাপ্তি, কখনো অনাময় পদ প্রাপ্তি, কখনো পদমব্যয়ং প্রাপ্তি, কখনো আবার তাঁহাতে নিবাস, কখনো বা ভগবানকে সাক্ষাৎ লাভ হয়, তাঁহাতে প্রবেশ হয়। এগুলি সব ক্রমমুক্তিরই অবস্থাবিশেষ।

গতি ঃ

এই মিলনের পথে যে গতি দেখা দেয় তাহারও ক্রমোৎকর্ষের তারতম্য আছে। প্রথম যোগের গতি ঃ

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।। ৬। ৪৫।।

এই যেমন যেমন 'কিল্বিষ' অর্থাৎ পাপরূপ মালিন্য সংশুদ্ধ হইতে থাকে, তেমন তেমন জন্মের পর জন্মে 'পরাং গতিম্' এর দিকে বেগও বাড়িতে থাকে। এই গতি লইয়া যাইতে থাকে 'পরমং পুরুষে'র দিকে, বিরাট পুরুষের দিকে, হিরণ্যগর্ভের দিকে, পরে অক্ষর পুরুষের দিকে।

দেহত্যাগ কালে পরম পুরুষে প্রবেশের ধারা ঃ

এইরূপে সাধক প্রথম যখন 'অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা' হন তখন এইরূপ অনুচিন্তার ফলে 'পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি'। এইরূপ অধিকারী সাধক কীভাবে দেহত্যাগ করিয়া যান? না,—

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।। ৮। ১০।।

'ভ্রুবোর্মধ্যে' প্রাণপ্রবেশ হইল এই mental planeএ normally function করা। ইহার পর অক্ষর পুরুষে প্রবেশ অধিকার লাভ হয়। তখন সাধক

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।। ৮। ১২।।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।। ৮। ১৩।।

যিনি যোগের এই গতি লাভে অসমর্থ তিনি ভক্তির বলেও পরমা সংসিদ্ধি লাভ করেন। তাই ভগবান বলিলেন ঃ

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।। ৮। ১৪।।
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।। ৮। ১৫।।

এইরূপে যিনি সর্বকালে ভগবানে যোগযুক্ত হন তিনি বেদ-যজ্ঞ-তপদানাদির দ্বারা যে পুণ্যফল লাভ হয় তাহাদের সমস্ত অতিক্রম করিয়া 'আদ্যং পরং স্থানং উপৈতি'। এমনকি পাপযোনি কিংবা বৈশ্য, স্ত্রী বা শূদ্র হইলেও সে যদি ভগবানের আশ্রয় লইতে পারে, তাহা হইলে সে-ও 'পরাং গতিম্' লাভ করিতে সমর্থ হয়।

যিনি ভগবানে কর্মার্পণরূপ যে সন্ন্যাস সেই 'সন্ন্যাস-যোগযুক্তাত্মা' হন, তিনিও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে লাভ করেন, কেননা যে ভক্তিভরে ভগবানকে ভজনা করে সে যেমন দিনরাত সেই ধ্যানে মগ্ন থাকে, তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকে, ভগবানও তেমনি তাহার হৃদয় ছাড়িয়া আর নড়েন না, তাহার হৃদয় মন প্রাণ জুড়িয়া বসিয়া থাকেন। এমনকি সুদুরাচারও এইরূপ অনন্য ভজনের ফলে শীঘ্র সাধু ও ধর্মাত্মা হইয়া 'শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি'। এইজন্যই ভক্তের কোনোদিনই প্রণাশ নাই।

তারপর যিনি একেবারে 'মন্মনা' হন, ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্-যজনশীল হইয়া দিনরাত তাঁহারই চরণ-সেবায়, তাঁহারই পদকমলে নত হইয়া পড়েন, এমন 'মৎপরায়ণ' ভক্ত মনকে ভগবানেই যুক্ত করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। তাহার মূলে কিন্তু থাকে ঐ ভগবৎ কৃপা, কেননা

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।। ১০। ১০।।

ভগবানই এইরূপ ভক্তকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন যাহার ফলে সে তাঁহাকে পায়। সেই অনুগ্রহটা আবার কীভাবে করেন? না,—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।। ১০। ১১।।

তিনিই আত্মভাবস্থ হইয়া সেই জ্ঞানদীপ জ্বালাইয়া দেন যাহার স্নিগ্ধ কিরণে তমরূপ অজ্ঞান সরিয়া যায়।

ভগবানকে জানা, দেখা ও তাঁহাতে প্রবেশ করা ঃ

এই ভক্তির বেগই ভগবৎ অভিমুখী গতিবেগকে তীব্র সংবেগে পরিণত করে। তাই বলা হইয়াছে ঃ

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।। ১১। ৫৪।।

তবে ইহার জন্য হইতে হইবে কী? না,—

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।। ১১। ৫৫।।

তবেই 'মামেতি' হইবে, তাঁহাকে পাওয়া যাইবে।

আবার যিনি অক্ষর পুরুষের পর্যুপাসনা করেন, 'যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে', 'সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্', 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব', সে-ও ঐ পরমকেই প্রাপ্তি করিয়া থাকে, কেননা সে যে তাঁহার সঙ্গে একেবারে অভিন্ন যোগে যুক্ত হইয়া যায়। আর যে ভগবানে সর্ব কর্ম অর্পণ করে, তাঁহাতে 'অর্পিত মনোবুদ্ধি' হয়, তাহার পারের কাণ্ডারী স্বয়ং ভগবানই হইয়া থাকেন।

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।। ১২। ৬।।
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।। ১২। ৭।।

তাই ভগবান আদেশ দিলেন ঃ

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ।। ১২। ৮।।

এইরূপ করিতে পারিলেই ভগবানে নিবাস হইবে। যিনি সর্বত্র 'সমবস্থিতমীশ্বরম্'কে সমভাবে দর্শন করেন, তাঁহার দর্শন আর আবৃত হয় না এবং সেইজন্য তাঁহার 'পরাং গতিং' লাভে কোনো বিঘ্ন-বাধাও থাকে না। যখন আবার সাধক 'ভূতপৃথক্‌ভাব'কে এক আত্মায় বা আত্মার শক্তিরূপা প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং তাঁহা হইতেই বিস্তৃত হইতে দেখেন, তিনি 'ব্রহ্ম সম্পদ্যতে', ব্রহ্মভূত হইয়া যান।

কর্মভূমিতেই বুদ্ধির যে অপূর্ব কমনীয় পরশ ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ নিরর্গল করিতে শুরু করিয়াছিল, তাহাই আজ আসিয়া 'ব্রহ্মসম্পন্ন' অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিল। বুদ্ধিযুক্ত হইয়া 'কর্মজা' ফল ত্যক্ত হইলেই 'জন্মবন্ধ' যেমন বিনির্মুক্ত হওয়া যায়, তেমনি 'অনাময় পদে' গমনের পথও খুলিয়া যায়। তেমনি আবার এই বুদ্ধিযোগ উদয়ের ফলে যখন অসক্ত বুদ্ধি দেখা দেয় তখন 'অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ', অসক্ত হইয়া কর্মাচরণের ফলে সেই পরমকে প্রাপ্ত হয়।

এগুলি হয় কিন্তু কিসের ফলে? ঐ 'যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষে'র ফলে 'যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্'। সেইজন্যই বলা হইয়াছে শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন বিশুদ্ধাত্মা যোগযুক্ত মুনি অকিঞ্চনই 'ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি'। এইরূপে যিনি স্থিরবুদ্ধি অসংমূঢ় হইয়া ব্রহ্মবিদ হন তিনি ব্রহ্মেতে স্থিতি পর্যন্ত লাভ করিতে পারেন। এটা হয় কিন্তু ঐ 'ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি' হওয়ার ফলে, 'ময্যার্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্'।

এইরূপে ক্রমশ সত্ত্বশুদ্ধির ফলেই সাধক উৎকৃষ্টতর গতি লাভ করিতে করিতে ব্রহ্মে গিয়া মিলিত হন, কেননা সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ হইলেই 'তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে' এবং এই সত্ত্বশুদ্ধির ফলে যখন অব্যভিচারী ভক্তির উদয় হয় তখন সেই সাধক 'গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'।

ইহার পর ঐ ব্রহ্মেরও যিনি প্রতিষ্ঠা, অব্যয় অমৃতেরও প্রতিষ্ঠা, শাশ্বত ধর্মেরও যিনি প্রতিষ্ঠা এবং আত্যন্তিক সুখেরও যিনি প্রতিষ্ঠা, তাঁহাকে পাইতে হইবে। এই চরম ও পরম ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিতে হইলে চরম ও পরম শুদ্ধি প্রয়োজন। তাই যিনি 'নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ', 'সুখদুঃখসংজ্ঞৈ দ্বন্দ্ববিমুক্ত', তিনিই অমূঢ় হইয়া এই 'অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি',। আর এখানে গিয়া একবার উপস্থিত হইতে পারিলে আর 'ন নিবর্ততে'।

এই চরম শুদ্ধি লাভ করিতে হইলে প্রথমেই তিন নরকের দ্বার অতিক্রম করিতে হইবে, তাহার পর 'আত্মনঃ শ্রেয়ঃ' আচরিত হইলে 'পরাং গতিং' লাভ হইবে। তাই বলা হইয়াছে ঃ

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।। ১৬। ২১।।
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।। ১৬। ২২।।।

কারণ যতদিন মোহজাল-সমাবৃত হইয়া মানুষ কাম-ভোগেতে প্রসক্ত থাকে, ততদিন অশুচি যে নরক তাহাতে পতিত হইতে হয়। যতক্ষণ মানুষ এই 'জঘন্য গুণবৃত্তিস্থ' থাকে ততক্ষণ আসুরী যোনি লাভ অনিবার্য, আর একবার আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইলে ক্রমাগত অধিক নিম্ন গর্তের দিকেই, অধম নিকৃষ্ট গতির দিকেই ছুটিয়া চলিতে হয়। এই অবস্থায় বুদ্ধির বিকাশ হয় না বলিয়াই মানুষ ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া সর্বদা ইন্দ্রিয়চালিত হয়। বিচারবুদ্ধি সেখানে প্রবেশের অবসরও পায় না, এবং এইরূপে স্বভাবচালিত হইয়া অধম গতি লাভ করে। সেইজন্য এই শাস্ত্রবিধিবিবর্জিত পথে 'ন সিদ্ধিং ন সুখং ন পরাং গতিং আপ্নোতি'। এ সময় এই শাস্ত্রবিধি অনুসরণই সেইজন্য পরম কল্যাণপ্রদ। এই শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া যিনি স্বস্থস্বভাব হন, যিনি সমতাকে প্রাপ্ত করেন তিনিই 'জিতসর্গ' হন।

পরম সিদ্ধি ও চরম প্রাপ্তি ঃ

তাহা হইলে দেখা গেল সিদ্ধি সবক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর দেখা দেয়। প্রথম কর্মজা সিদ্ধি, পরে যোগজা সিদ্ধি, তৎপরে ভক্তিজা সিদ্ধি এবং শেষে জ্ঞানজা সিদ্ধি। এইরূপে সিদ্ধি যেমন ধাপে ধাপে উপরে উঠে, তেমনি তদনুপাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ক্রমশ নিবিড় নিবিড়তর হইতে থাকে। কর্মজা সিদ্ধির পর নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি দেখা দিলে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। এই প্রাপ্তি বুদ্ধি-শুদ্ধিকেই অপেক্ষা করে এবং এই বুদ্ধির ক্রমবিশুদ্ধির পথে সাধক যখন অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ হইতে একেবারে বিমুক্ত হইয়া নির্মম ও শান্ত হয়, তখন 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' এবং ব্রহ্মভূত হওয়ার ফলে যখন প্রসন্ন-আত্মা হয় ও সর্বভূতে সমতাভাব প্রাপ্ত হয় তখন পরাভক্তি আসিয়া দেখা দেয়। এই পরাভক্তি যেমন পরমা শুদ্ধির হেতু, তেমনি পরম জ্ঞান বিকাশেরও কারণ। এই জ্ঞানের ফলে ভগবানকে তত্ত্বত জানিলে তাঁহাতে প্রবেশ লাভ হয়। ইহাই চরম প্রাপ্তি।

প্রাপ্তির ক্রম ঃ

এই প্রাপ্তিরও একটা ক্রম আছে। প্রথমে ভগবদ্-আশ্রিত হইয়া সর্ব কর্ম

সদা অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবানের প্রসাদ লাভ হয় এবং তৎফলে সাধক শাশ্বত ও অব্যয় পদ প্রাপ্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলে এবং এইরূপ কর্মার্পণের পর যখন মন বুদ্ধি পর্যন্ত ভগবানে অর্পিত হইয়া মচ্চিত্ততা আনিয়া দেয় তখনই সর্বভাবে তাঁহার শরণাগতি লাভের সময় আসে। এইরূপে সর্বভাবে শরণাগত হইলে যেমন 'পরাং শান্তিং' আসে তেমনি শাশ্বত স্থানও লাভ হয়।

অতঃপর সাধক প্রগাঢ় ভক্তিভরে এই সগুণ ঈশ্বরের ভজন করিতে করিতে যখন 'মন্মনা' হয় তখন ঐ 'ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা' ভগবানকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্তি করে, এমন একটা deep insight লাভ করে যাহা তাহাকে একেবারে ভগবানের পরম নিজ জন করিয়া দেয়। তাঁহাতে আসক্তচিত্ত ও তদাশ্রিত হইয়া যখন সে যুক্ততম অবস্থা লাভ করে, একেবারে 'মদ্‌গত অন্তরাত্মা' হইয়া যায়, তখন আপনিই ধর্মাধর্মের অতীত হইয়া যায় এবং তখন তাহার শরণাগতি একশরণে পরিণত হয় ও ভাগবতের কথায় 'যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরাঃ ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্ ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং যস্মিন্ অহিংসোপরমঃ স্বধর্মঃ', ঐ চরম পারমহংস্য অবস্থা লাভ করিয়া সকল পরিচ্ছেদের পারে, সমস্ত পাপপুণ্যের পারে চলিয়া যায়। এইখানে জীব যথার্থ মোক্ষলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। এই পরমলোক প্রাপ্তির পূর্বে যে শুভলোক প্রাপ্তি সেটা শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণের ফলে লাভ হইয়া থাকে।

শান্তির ক্রম ঃ

এই ভগবৎপ্রাপ্তির তরতমতা অনুসারে শান্তি ও মুক্তির তরতমতা দেখা দেয়। কামনা বিগলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং সর্বকামাবাপ্তির ফলে যখন সমুদ্রের মতো অচলপ্রতিষ্ঠা লাভ হয় তখন শান্তিও আরও গাঢ় হয়। এইরূপ আবার জ্ঞানযোগ লাভের ফলে 'পরমাং শান্তিং অধিগচ্ছতি'। যুক্তেরও যখন কর্মফল ত্যাগ হয় তখনো একটা 'নৈষ্ঠিকীং শান্তিং আপ্নোতি'। এইরূপে 'সর্বলোকমহেশ্বর'কে ভোক্তারূপে জানিলেও 'শান্তিমধিগচ্ছতি', আবার যোগী যখন নিয়তমানস হন তখনো 'নির্বাণপরমাং মৎসংস্থাং শান্তিং অধিগচ্ছতি'। সেইরূপ ভক্তির আতিশয্যে যখন সর্বকর্মফল-ত্যাগ আপনি হইয়া যায় তখনো শান্তি দেখা দেয়, আর ভগবানে যখন চিত্ত একেবারে সমর্পিত হয় তখনো 'পরাং শান্তিং' প্রাপ্ত হইয়া যায়। তাহা হইলেই দেখা গেল, সাধনার যে-কোনো ধারা ধরিয়াই সাধক যেমন ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়া চলে তেমন তেমন সে শান্তিলাভও করিতে থাকে। এই শান্তি ফলত্যাগ ও কামনাত্যাগ হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেই পূর্ণ হইয়া ওঠে।

মুক্তির ক্রম ঃ

মুক্তিরও এইরূপ ক্রম আছে। ধীর হইলে 'অমৃতত্বায় কল্পতে' ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইলে 'ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি', যজ্ঞতত্ত্ব বিদিত হইলেও বিমোক্ষ দেখা দেয়। ব্রাহ্মীস্থিতিতে যেমন ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয় তেমনি অন্তঃসুখ, অন্তরারাম, অন্তর্জ্যোতিতে ভরিয়া উঠিলেও ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তেমনি আবার 'ক্ষীণকল্মষ' 'ছিন্নদ্বৈধ' 'যতাত্মা' 'সর্বভূতহিতে রতা' যিনি, তিনিও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। সেইরূপ 'কাম-ক্রোধ-বিমুক্ত' 'যতচেতস' আত্মতত্ত্ববিদিত যতি যিনি, তিনিও কী জীবনে, কী মরণে উভয়ত্রই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি 'যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি', 'মোক্ষপরায়ণ' মুনি 'বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ' তিনি তো সদা মুক্ত। এইরূপ ভগবানে যিনি একেবারে প্রপন্ন হন, তিনিও 'মায়ামেতাং তরন্তি'। যিনি গুণাতীত হন তিনিও 'জন্ম-মৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।' এই মুক্তির অধিকারী কিন্তু তিনিই হন যিনি দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

গীতা হইতে তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইলাম যে এইরূপে ক্রমশ উৎকৃষ্টতর ইষ্টফল প্রাপ্তি হইতে জীব ভগবৎপ্রাপ্তি, ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তি ও চরম ও পরম মোক্ষ পর্যন্ত প্রাপ্তি করিয়া থাকে।

প্রাপ্তির মূল ঃ

কিন্তু এই প্রাপ্তির মূল হইল, এইরূপ উৎকৃষ্ট গতি বা সিদ্ধি লাভের ভিত্তিই হইল কল্যাণকৃৎ হওয়া, কেননা কল্যাণকৃতের আর দুর্গতি হয় না।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।। ৬। ৪০।।

তাঁহারা দেহান্তে 'উত্তমবিদাং লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে', আর সেখানে

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।। ৬। ৪১।।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।। ৬। ৪২।।

এই 'দুর্লভতর জন্ম' লাভ করিয়া

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।। ৬। ৪৩।।
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে।। ৬। ৪৪।।

তেমনি আবার 'যাতি পরাং গতিম্'। কিসের ফলে? না—

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।। ৬। ৪৫।।

এই কিল্বিষ-সংশুদ্ধির ফলে সে ক্রমশ যুক্ততর যুক্ততম হইয়া 'শ্রদ্ধাবান ভজতে' অথবা 'নিত্যযুক্তা উপাসতে'। এইরূপ সুকৃতিশালীরই ভগবৎ ভজনাধিকার সাধারণত লাভ হয়। আর দুষ্কৃতিশালী যে, সে চিরদিনই ভগবৎ-বিমুখ। সে মোটেই এই দিকে ফিরিয়া চায় না, তাই তাহার জীবনের গতি চিরদিন চলে নিম্ন পথে এবং তাহা ক্রমশ লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দেয় একেবারে স্থাবরত্বে।

ভক্তদের ভজনভেদ ঃ

সুকৃতির তারতম্য অনুসারে এই ভজনপরায়ণ সাধকদের চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।। ৭। ১৬।।

ইহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা অত্যধিক সুকৃতিশালী তাঁহারা জ্ঞানী হইয়া নিত্যযুক্ত ও একভক্তি লাভ করিয়াই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। যাঁহারা 'অন্তগতপাপ' তাঁহারাই 'দৃঢ়ব্রত' হইয়া ভজন তৎপর হন ঃ

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।। ৭।২৮।।

ইহারা এইরূপে জন্মের পর জন্মে পাপবিমুক্ত হইতে হইতে যে জন্মে দৈবী প্রকৃতি-আশ্রিত হন সেই জন্মে অনন্যমনে ভজন আরম্ভ করেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভুতাদিম্যব্যয়ম্।। ৯। ১৩।।

ইহারাই 'নিত্যযুক্তা উপাসতে' ঃ

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্তা নিত্যযুক্তা উপাসতে।। ৯। ১৪।।

অথবা

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।। ৯। ১৫।।

আর

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। ৯। ২২।।

এইরূপ 'প্রযতাত্মনা'দের ভক্তি-উপহৃত সামান্য পত্র-পুষ্প-ফল-তোয় 'অহং অশ্নামি', কেননা তাহা ভক্তির রসে অভিষিঞ্চিত। এখানে এই ভক্তির রাজ্যে 'অনন্যভাক্' হইয়া ভজনেরই মহৎ ফল। ইহা সুদুরাচারকেও সাধু ও ধর্মাত্মা করিয়া দেয় এবং এইরূপ ভক্তেরই কোথাও আর প্রণাশ দেখা যায় না। এইভাবে

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।। ১২। ৬।।
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।। ১২। ৭।।

এইরূপ সতত 'মচ্চিত্ত' যিনি তিনিই 'মৎপ্রসাদাৎ সর্বদুর্গাণি তরিষ্যতি,' তাঁহাকেই 'সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'। আর যাহারা 'অব্যক্তাসক্তচিত্ত', তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু বড়ো কষ্টে। সর্বভাবে ভজন কিংবা সর্বভাবে শরণাগতি তখনই হয় যখন 'অসংমূঢ়ো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি,' কেননা যে যেভাবে ভগবানে প্রপন্ন হয় তাহাকে ভগবানও সেইভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

ভজনের অধিকার ঃ

এই যথার্থ সততযুক্ত হইয়া ভজনের অধিকার মানুষ তখনই লাভ করে যখন সে অদ্বেষ্টাদি গুণ অর্জন করিয়া ভক্ত হইতে পারে। এইগুলিই ধর্মামৃত, সকল ধর্মের মধ্যে পরম ধর্ম, শাশ্বত ধর্ম, এবং ইহার পর্যুপাসনাই মানুষকে ভগবানের অতীব প্রিয় করিয়া দেয়। তাহার পর এই গুণার্জনের ফলে যখন সর্বভুতে সমতা দৃষ্টি আসিয়া যায় তখনই পরা ভক্তির উদয় হয় এবং এই পরাভক্তি লইয়া যায় পরম জ্ঞানে। এই জ্ঞানই সাধককে পূর্ণরূপে ভগবানে প্রপন্ন করে এবং তৎফলে 'জ্ঞাতুমে'র পর আসে 'দ্রষ্টুম্'। এই দর্শন আবার প্রথম হয় 'আত্মনি', 'অথো' অনন্তর কিনা পরে 'ময়ি'।

সম্যগদর্শনের অধিকার ঃ

কর্ম হইতে যোগানুষ্ঠান দ্বারা যিনি যোগ্যতা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনি যথাসময়ে আপনিই আত্মদর্শন লাভ করেন এবং তিনিই

যথার্থ সম্যগ্ দর্শনের অধিকারী হন যিনি সাংখ্য ও কর্মযোগকে, সন্ন্যাস ও কর্মকে অভিন্ন দর্শন করেন। এইরূপে যিনি জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে নাশ করিতে পারেন, তাঁহার সেই জ্ঞান পরম ব্রহ্মকে পর্যন্ত তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া ধরে। যিনি যোগযুক্তাত্মা হইয়া সমদর্শী হন তিনি প্রথমে 'সর্বভূতস্থং আত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি' দর্শন করেন, পরে সর্বে ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরে সর্বকে দর্শন করেন। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে আর ভগবান সরিতে পারেন না। এইরূপে তিনি 'একত্বমাস্থিত' হইয়া অর্থাৎ অভিন্নভাবে সর্বভূতস্থিত ভগবানকে ভজন করেন। তিনি 'সর্বথা বর্তমানোঽপি ময়ি বর্ততে' আর যিনি 'সমং পশ্যতি' তিনি পরম যোগী হইয়া যান। এইরূপে যোগী ক্রমশ যুক্ততম হইয়া যখন 'ময্যাসক্তমনাঃ' ও 'মদাশ্রিত' হন, তখন 'অসংশয়ং সমগ্রং জ্ঞাস্যসি'। এইরূপে যিনি সম্পূর্ণ ভগবৎ-আশ্রিত হইতে পারেন তিনি 'তৎব্রহ্ম'কেও জানিতে পারেন, 'কৃৎস্নমধ্যাত্মং' এবং 'কর্ম চাখিলং'ও জানিতে পারেন। এইরূপ যুক্তচেতস হইয়া 'সাধিভূত', 'সাধিদৈবত', 'সাধিযজ্ঞং মা'কে জানিতে পারিলে মৃত্যুকালেও 'তে মাং বিদুঃ'।

যোগে যুক্ত হইলে যেমন এই অদ্ভুত দর্শন মিলে, তেমনি জ্ঞানে যুক্ত হইলেও আরও উপরের ভূমিতে, আরও ব্যাপক ভূমিতে পরিপূর্ণ সমতার, নির্দোষ সমতার দর্শন লাভ হইতে থাকে এবং একবার যিনি এই 'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং' দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী। আর এই 'সমবস্থিতং ঈশ্বরম'কে 'সমং পশ্যন্' হইলে আর আত্মা দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করেন না, অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করেন না। এইজন্য তাঁহার পরমা গতি লাভ হয়। এই সমদর্শনই পরে আত্মার অকর্তা স্বরূপ দর্শনে লইয়া যায় এবং তখন তিনি দেখেন ঃ

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। ১৩। ২৯।।

এইভাবে

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।। ১৩। ৩০।।

সুখ বা আনন্দ লাভ ঃ

এই দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রকাশভাব উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, তেমনি সুখভাবটাও বৃদ্ধি পাইয়া পরম আনন্দে পর্যবসিত হয়। প্রথমেই 'বাহ্যস্পর্শে অসক্তাত্মা' হইলেই একটা অপূর্ব সুখানুভূতি আরম্ভ হয় এবং এই সুখানুভূতিই ধীরে ধীরে অক্ষয় সুখে গিয়া পর্যবসিত হয়। তেমনি আবার 'প্রাক্

শরীরবিমোক্ষণাৎ কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢুং শক্তঃ' হইলেও একটা পবিত্র নির্মল সুখের আস্বাদ মিলে। তেমনি যোগে নিরুদ্ধচিত্ত হইতে পারিলে 'আত্মানং আত্মনি পশ্যন্ তুষ্যতি'। এটা একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য অথচ অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ। এই উত্তম সুখ কিন্তু দেখা দেয় ঐ 'শান্তরজস' হওয়ার ফলে, ঐ 'অকল্মষং' হইয়া 'ব্রহ্মভুত' হওয়ার ফলে। যিনি এইভাবে 'বিগতকল্মষ' হন, তিনিই অনায়াসে 'ব্রহ্মসংস্পর্শ' লাভ করিয়া অত্যন্তং সুখমশ্নুতে'। এই সমদর্শনই শেষে সাধককে গুণাতীত করিয়া দেয় এবং তখনই তিনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা যিনি, অমৃত ও অব্যয়ের প্রতিষ্ঠা যিনি, এমনকি ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা যিনি, তাঁহাকে, সেই পুরুষোত্তমকে জানিয়া সর্বতোভাবে ধর্মাধর্ম এই উভয় ভাবকে অতিক্রম করিয়া একশরণ একভক্তি লাভ করেন এবং সকল পরিচ্ছেদের পারে চলিয়া যান। এইরূপ আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি ও আত্মসন্তোষ অবস্থা যিনি লাভ করেন সেই জ্ঞানীর আর 'কার্যং' বলিয়া, 'কর্তব্যং' বলিয়া কিছু থাকে না, 'ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ'। আর যিনি জ্ঞান-কর্মের মিলন সম্পাদন করিয়া বুদ্ধিযোগ লাভ করেন তাঁহার নিকট শ্রী বিজয় ভূতি ও ধ্রুবা নীতি আসিয়া উদয় হয়। ইহার একটি হইল নিঃশ্রেয়স, অপরটি হইল অভ্যুদয়। এই উভয় ভাব লাভ করিতে পারিলেই জীবজীবন পরিপূর্ণ সার্থকতা প্রাপ্ত হয়, পরিপূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়, complete development and complete perfection attain করে। সমস্ত গীতাশাস্ত্রে ভগবান এই পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির পথ, full blossoming of life বর্ণনা করিয়াছেন।

উপসংহার

জননীর মতো হিতকারিণী গীতা কল্যাণকামী জীবের কী পাইতে হইবে, কী হইতে হইবে, কী করিতে হইবে—ইহাই বিশদভাবে দেখাইয়া তাহাকে সীমার পারে লইয়া গিয়া অসীমের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার মুক্তি-সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাকে পাইতে হইবে 'ব্রহ্ম পরমম্' বা পুরুষোত্তমকে, হইতে হইবে স্থিতপ্রজ্ঞ, ভক্ত ও গুণাতীত, আর করিতে হইবে যজ্ঞদানরূপ কর্ম দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি সম্পাদন। ইহাদের আবার পঞ্চ পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই পরমকে পাইতে হইলে, সমগ্রভাবে জানিতে হইলে (কেন না এখানে জানা ও হওয়া বা পাওয়া একই) দুই প্রকৃতিতত্ত্ব, ও তিন পুরুষতত্ত্ব, এই পঞ্চতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। স্থিতপ্রজ্ঞাদি অবস্থা লাভ করিতে হইলে সুনিয়মিত, সুসংযত, সুসংযুক্ত, সুসংসক্ত ও সুসংন্যস্ত হইতে হইবে। আর

শুদ্ধিসাধন করিতে হইলে অনুকীর্তন, অনুশ্রবণ, অনুচিন্তন, অনুস্মরণ ও অনুদর্শন করিতে হইবে। ইহাই গীতোক্ত পঞ্চায়তনী দীক্ষা, ইহাই জ্ঞানের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিবার ক্রম। ইহারই দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া যিনি জীবন গঠন করিতে পারেন তিনিই 'মামেকং শরণম্' অবস্থা লাভ করেন, তিনিই ধর্মাধর্মের উপরে উঠিয়া 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' অবস্থা প্রাপ্ত হন, তিনিই কৃতকৃত্য হন, তিনিই ধন্য হইয়া যান।

সমস্ত গীতার ইহাই সংক্ষিপ্তসার ও অমূল্য উপদেশ।

পরিশিষ্ট

গীতার গান

শীতের মরশুমে কলকাতা শহরে নানা সঙ্গীত-সম্মেলন আয়োজিত হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু গায়ক-গায়িকা ওস্তাদদের সমাবেশ ঘটে থাকে। গানের জলসায় অনেকে সারারাত ধরে বিভিন্ন রাগ-রাগিনী পরিবেশন উপভোগ করেন। কিন্তু সে তো মানুষের গান, কলাবন্তদের গান।

আবার এই শীতকালেই গীতা-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়, যেখানে ভগবানের সেই কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে গাওয়া গান নিয়ে নানা আলোচনা হয়, সেই গানের পাঠ বা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়। অথচ আমরা ভুলে গিয়েছি 'শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা' এই শব্দটির অর্থ ঃ এটি শ্রীভগবানের গান। অনেক ইংরাজী অনুবাদে এর নাম দেওয়া হয়েছে The Lord's Song. কিন্তু গীত বা গান তো ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, সংস্কৃতে যা সঙ্গীতকে বোঝায়। এখানে 'গীতা' তো স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। তা হ'লে গান বোঝাবে কেমন করে? গীতা শব্দটি এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে গিয়েছে এটি বিশেষণবাচক ব'লে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে বিশেষ্যের যেমন লিঙ্গ ও বচন হয়, বিশেষণেরও ঠিক তদনুরূপ লিঙ্গ ও বচন হওয়া আবশ্যক। এখানে বিশেষ্যবাচক শব্দটি হ'ল 'উপনিষদ' এবং সেটি হ'ল স্ত্রীলিঙ্গ এবং তার বিশেষণ বলে 'গীতা' শব্দটিও স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে। সেই সম্পূর্ণ কথাটি হ'ল— শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা উপনিষদ। অর্থাৎ শ্রীভগবানের গাওয়া উপনিষদ বা পরম রহস্য, যা উপনিষদ শব্দটির মৌলিক অর্থ।

সাধারণভাবে উপনিষদ শব্দটির সঙ্গে আমাদের মোটামুটি যে পরিচয় আছে তাতে উপনিষদ বলতে আমরা বুঝি বেদান্ত অর্থাৎ বেদের অন্ত বা শেষভাগ, যেখানে আত্মা বা ব্রহ্মবিষয়ক নানা তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। এটিকে তাই বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। যেখানে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ এই সব দুরূহ জ্ঞানের কথা আলোচনা করেছেন। আর এখানে সেই উপনিষদই গাইলেন কিনা স্বয়ং ভগবান! মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষের মহিমা একটি অমর দেশাত্মবোধক গানে লিখে রেখে গিয়েছেন, তাতে একটি ছত্রে তাই

বলেছেন—

'ভগবদগীতা গাইল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে।'

হিন্দুজাতির এই পরম গরিমার বিষয় যে স্বয়ং ভগবান এসে এখানে তাদের সঙ্গে গান গাইলেন। আবার গাইলেন কোনো বিজন তপোবনে নয় শান্তরসাস্পদ আশ্রমে নয়, গাইলেন সেইখানে যেখানে

কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি ওঠে জেগে।

যেখানে অস্ত্রের ঝনঝনানি, অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হাজার হাজার সৈন্যদের কলকোলাহল, আর্ত চীৎকার। এ কখনও সম্ভব? অনেক পণ্ডিতেরা তাই বলেন, গীতা মহাভারতের মধ্যে পরবর্তীকালে কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ এটি প্রক্ষিপ্ত অংশ, মূল মহাভারতে এটি ছিল না বা থাকতে পারে না। সেই মহাভারতে তো কুরুপাণ্ডবের সংগ্রামের বিবরণ, তার মধ্যে হঠাৎ এই সব গুরুগম্ভীর উপদেশমূলক জ্ঞানগর্ভ কথা আসবে কেমন ক'রে? এত দীর্ঘ বক্তৃতা শোনার সেখানে অবকাশই বা কোথায়, প্রাসঙ্গিকতাই বা কি? এতো একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা এবং তাই পরিষ্কার বোঝাই যায় কোনো চতুর পণ্ডিত মহাভারতের মাঝখানে এটিকে বসিয়ে দিয়েছেন।

অথচ আমরা সরলবিশ্বাসী হিন্দুরা প্রতি অধ্যায়ের শেষে আবৃত্তি ক'রে যাই—ইতি 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে'—এটি শ্রীভগবানের গাওয়া উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যারূপ এবং তার আগে বলি—ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 'ভীষ্মপর্বণি' অর্থাৎ শতসহস্র অর্থাৎ একলক্ষ শ্লোক দিয়ে রচিত ব্যাসের মহাভারতে ভীষ্মপর্বের এটি একটি অধ্যায়। সুতরাং মহাভারতের অবিভাজ্য অংশ বলেই আমরা গীতাকে মনে করি এবং সেই সঙ্গে এও মানি যে—

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন প্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্

পুরাণের মহামুনি ব্যাসদেব দ্বারা গ্রথিত মহাভারতের ঠিক মধ্যস্থলে স্বয়ং নারায়ণ অর্জুনকে প্রতিবুদ্ধ বা জাগ্রত করার জন্য যে অদ্বৈত অমৃত বর্ষণ করেছিলেন, তারই নাম ভগবদ্‌গীতা। তিনিই আমাদের জননীর মতো কল্যাণী, পথশ্রান্ত সন্তানের পথপ্রদর্শনকারিণী ভগবদ্‌বাণী।

এরকম বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধ বিশ্বাসের কারণ কী? আমরা মানি, ভগবানের গানের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রই হ'ল জীবনের যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে নিরন্তর সংগ্রামে, নানা

পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে, অবিরাম দ্বন্দ্ব-কোলাহলে সমস্ত সুর বিপর্যস্ত, জীবনের সুষমা বিধ্বস্ত। সুরের গুরু আমাদের সেই সংগ্রামভূমিতে দাঁড়িয়েই সুরের দীক্ষা দেন। জীবের যেখানে ক্রন্দন সেইখানেই তাঁর সুরের আলাপন। একজন মহাত্মা বড় সুন্দর বলেছিলেন ঃ 'অর্জুনকা রোনা অউর ভগবানকা গানা' এই হ'ল গীতা। আমরা কাঁদতে বসি যখনই জীবনে সুর হারাই, ছন্দোভ্রষ্ট হই। তিনি তখন এসে আবার সুর সাধান, সুর শেখান, ছন্নছাড়া জীবনকে ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। তাই তাঁর গানের একমাত্র স্থান বা সদন হ'ল সমরাঙ্গন।

এই সমরাঙ্গনে 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' জীবন-রথটি আমাদের স্থাপন ক'রে তিনি প্রথম শেখান উদ্বোধন বা জাগরণ, 'উত্তিষ্ঠ পরন্তপ' এই প্রথম সুরটি শুনিয়ে। তারপর শেখান দ্বিতীয় সুর, দ্বন্দ্বসহন, 'তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত'। তারপর তৃতীয় সুরে শেখান লড়তে লড়তে সেই সঙ্গে কেমন ক'রে চলবে তাঁর অনুস্মরণ—'মামনুস্মর যুধ্য চ'। এইভাবে শ্রীভগবানের গানের মূল সাতটি সুর আমাদের চিনে নিতে হবে গীতা থেকে। তাঁর গাওয়া এই দিব্য গানের সুরলহরী থেকে। তবেই না গীতা-জয়ন্তী পালন সার্থক হ'বে। সেই কারণেই বলা হয়েছে ;

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা।।

গীতাকেই ভালো ক'রে গাইতে হ'বে, জীবন-বীণার তারে তার সপ্তসুরটি ঝঙ্কৃত ক'রে। এ গান যে পদ্মনাভের মুখপদ্ম থেকেই সাক্ষাৎভাবে বেরিয়ে এসেছে, যার শেষ সুরটি হল' শরণের সুর, সব কিছু ছেড়ে তাঁর চরণে মিলনের সুর, আত্মসমর্পণের সুর। অন্তিম সে-সুর ফোটে 'বহূনাং জন্মনামন্তে' কিন্তু তার আগে জন্মে জন্মে সেধে যেতে হ'বে ধাপে ধাপে তাঁর সাতটি সুর। তারই জন্য তো গীতাজয়ন্তীর আয়োজন বৎসরে বৎসরে। সেই আয়োজন যেন সার্থক হয়। এই তাঁর চরণে প্রার্থনা।

গীতার সপ্তসুর

গানমাত্রেই মূল উপাদান বা অবলম্বন হ'ল সাতটি সুর। ভাবতে অবাক লাগে মাত্র এই সাতটি সুরকে কত রকমে বিন্যস্ত ক'রে বা সাজিয়ে কত অজস্র রাগ-রাগিনীর না সৃষ্টি হয়েছে এবং আজও হ'চ্ছে। কত না গান বাঁধা হয়েছে এবং আজও হয়ে চলেছে, অথচ কোথাও তার একঘেয়েমি নেই, মনে হয় সবই যেন নবীন সৃষ্টি, আগে কখনও এমন গান বা এমন সুর তো শুনিনি!

তেমনি ভগবানও যে গান গাইলেন, শোনালেন প্রিয় ভক্ত ও সখা অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে, তা যদি সত্যি গানই হয়, যা তার 'ভগবদ্‌গীতা' এই নামের মধ্যেই প্রকাশ, তা হ'লে তাও নিশ্চয়ই সাতটি সুর দিয়েই রচিত বা গীত। সে-সাতটি সুরকে কি আমরা গীতা থেকে চিনতে প্রয়াসী হয়েছি কখনও? কারণ বলা হয় তাঁরই সুরে সুর মিলিয়ে আমাদেরও গাইতে হ'বে তাঁরই গাওয়া এই গান, 'গীতা সুগীতা কর্তব্যা'। তারই জন্য না বৎসরে বৎসরে গীতা-জয়ন্তী পালন, যেমন শীতকাল এলেই আয়োজন করা হয় নানা সঙ্গীত সম্মেলনের, যেখানে নানা জ্ঞানী-গুণী-ওস্তাদ এসে ঐ সাতটি সুরের পশরা সাজিয়ে বসেন, শোনান কত হৃদয়গ্রাহী গান। তেমন ক'রে পরম তন্ময়তায় ভগবানের গান কবে শুনব, যে-গান 'ইতররাগবিস্মারণং' অন্য সমস্ত রাগ, তা অনুরাগ বা আসক্তিই বলি, সুরের রাগ-রাগিনীই বলি, সব ভুলিয়ে দেয়। আর 'অনঙ্গবর্ধনং' সে-গীত বা গান, কামের উদ্দীপন ঘটায়, তাঁর জন্য মন উচাটন ক'রে তোলে, ঘর-সংসার, প্রিয়-পরিজন, নানা কর্তব্য কর্ম সব ফেলে ছুটে যেতে বাধ্য করে, যেমন একদিন করেছিল বৃন্দাবনের সেই ব্রজগোপীনীদের, যারা 'পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্' জগতে যতরকম স্নেহের বন্ধনে যাদের সঙ্গে আমরা আবদ্ধ, সে সমস্ত 'অতিবিলঙ্ঘ্য' অতিক্রম বা লঙ্ঘন করে সেই অচ্যুতের চরণমূলে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন।

তবে তার আগে তার গানের সুরটি পর্দায় পর্দায় চিনে নিতে হবে, যেমন অর্জুনকে চিনিয়েছিলেন এবং সবগুলি সাধিয়েছিলেন শিখিয়েছিলেন সুরের পর সুর তুলতে ক্রমশ উচ্চগ্রামে, 'সা' থেকে 'নি' পর্যন্ত। সপ্তসুরের প্রথম

যে মূল সুরটি, 'সা', তাকে বলা হয় 'ষড়জ' বা চলতি ভাষায় বিকৃতভাবে 'খরজ'। বাকি ছয়টি সুরই এর থেকে জন্মায় ব'লে এর নাম 'ষড়জ' ; এটিই আদি মূল সুর, যার উপর সব সুরের জন্ম বা উৎপত্তি নির্ভর করে।

গীতার' সেই আদি মূল সুরটি কী? ভগবান দেখলেন অর্জুনের জীবনের সব তারগুলি এলিয়ে গিয়েছে, বিষাদে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। প্রথম তাদের টেনে তুলতে হবে, তবে সুরে বাঁধা যাবে। মূল সুরের বাঁধনটি ফিরিয়ে আনার জন্য ভগবান তাঁর গানে প্রথম যে সুরটি ফুটিয়ে তুললেন, যে টানটি দিলেন তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর গানের সূচনাতেই শোনা গেল ঃ

হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ (২/৩)

হৃদয়ের এই যে দুর্বলতা ; বিষাদে আচ্ছন্ন হয়, মোহগ্রস্ত হয়ে 'বিসৃজ্য সশরং চাপং' ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে অবসন্ন হ'য়ে বসে পড়া, 'ন যোৎস্যে' আর যুদ্ধ করব না ব'লে সম্পূর্ণ এলিয়ে পড়া সেই শিথিল বিপর্যস্ত জীবনবীণায় প্রথম যে-সুরটি তুলতে হ'বে তা হল এই 'উত্তিষ্ঠ', ওঠো। অধ্যাত্ম-জীবনে যাঁরাই পদক্ষেপ করতে চান, তাঁদের জন্য উপনিষদের যুগ থেকে এই একই বাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে ঃ

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ওঠো, জাগো, যাঁরা 'বর' বা বরীয়ান গরীয়ান, শ্রেষ্ঠ পুরুষ সেই গুরু বা আচার্যবৃন্দের কাছে গিয়ে নিশ্চিতভাবে সব জেনে নাও-কী তোমার করণীয়, কোথায় বা গমনীয়। জীবনে সাধনাই বা কী, লক্ষ্যই বা কী, সবই জানতে হ'বে তাঁদের কাছে গিয়ে।

কিন্তু যে ঘুমিয়ে আছে, শুয়ে পড়েছে, তাকে তো কোনো কিছু শোনানো যায় না, তাকে দিয়ে কিছু করানোও যায় না। উপনিষদের সার দোহন ক'রে গোপালনন্দন, সেই গোয়ালার ছেলেটি তাই প্রথম সেই মৌল সুরটি শুনিয়ে দিলেন 'ওঠো, জাগো'! এই উত্থাতব্যং জাগৃতব্যং' উঠতে হবে, জাগতে হবে সেই মূল সুরটি গীতায় আরও দু'তিনবার ভগবান ঝঙ্কৃত করেছেন, শুনিয়েছেন ঃ

উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ (২/৩৭)
যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ (৪/৪২)
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্
(১১/৩৩)

এই ওঠাই ধাপে ধাপে হয়ে থাকে, সুর ক্রমশই উঠতে থাকে উদারা

থেকে মুদারাতে, মুদারা থেকে তারাতে। ঋগ্বেদের ভাষায় ঃ

'যৎ সানোঃ সানুমারুহৎ ভূরি অস্পষ্ট কর্ত্বম্'।

এ যেন সানু থেকে সানুতে আরোহণ ; পর্বতের এক চূড়া থেকে আর এক চূড়ার দিকে এগিয়ে চলা। প্রথম উঠতে হবে, যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হতে, লড়বই এই সংকল্প গ্রহণ করতে। তারপর দ্বিতীয় উত্থান, যোগ-অনুষ্ঠানের জন্য। তৃতীয় উত্থান, যোগের ফললাভের জন্য, যশোলাভ, সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগের জন্য। যুদ্ধ বা যোগ বা ভোগ, কোনোটাই সম্ভব হয় না মানুষ যদি উঠে না দাঁড়ায়। এই উত্থান বা জাগরণ তাই ভগবানের গানের, এই ভগবদ্‌গীতার মূল প্রথম সুর, সেই 'সা' বা 'খরজ' যার থেকে আর সব সুরকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

দ্বিতীয় সুরটি, বা 'রে' অনিবার্যভাবেই উত্থানের পর যুদ্ধের জন্য উদ্‌যুক্ত হ'বার আহ্বান। এই সুরটিও তিনি অনেকবার বাজিয়েছেন সারা গীতা জুড়ে ঃ

যুধ্যস্ব ভারত (২/১৮)
যুদ্ধায় যুজ্যস্ব (২/৩৮)
যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ (৩/৩০)
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ (১১/৩৪)

মানুষ জাগবার পরই প্রতিপদে অনুভব করে জীবন হ'ল সংগ্রামময়। এখানে শুধু দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাত এবং সেইজন্য যুদ্ধ অনিবার্য। ঘুমন্ত মানুষের কাছে কোনও দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামের অনুভূতিই থাকে না। আমরা ভাবতে পারি তা হ'লে সেই নিশ্চিন্ত সুখসুপ্তিতে থাকাই তো ভালো, যদি জাগা মানেই দুঃখ-সুখের, শীত-উষ্ণের দ্বন্দ্বে নিত্য আন্দোলিত হওয়া বোঝায়। কিন্তু না জাগলে এবং জেগে উঠেই নিরন্তর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে না পড়লে তো মানুষের বিকাশের পথই চিরতরে বন্ধ হয় যাবে। অনেকে বলেন, গীতায় ভগবান কেবল যুদ্ধেরই প্ররোচনা দিয়েছেন, incitement to war, অর্জুন বরং সব ছেড়ে দিয়েও, রাজ্যভোগের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে ভিক্ষা ক'রে খেতেও রাজি ছিলেন। কী উদার চরিত্র অর্জুনের! কিন্তু ভগবান দেখলেন, তাহ'লে তো সর্বনাশ, মানব জন্মের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মানুষকে ফুটতে হবে, বিকশিত হ'তে হবে, অনুভূতিহীন নিশ্চেতন পাথর হয়ে থাকলে তো চলবে না। যদি সে আবার অজ্ঞানেই, অচৈতন্যেই ডুবে যায়, তা হ'লে জ্ঞান নিয়ে তার জগতে জন্মানো কেন? তাই ভগবান তাকে তমসার অন্ধকূপ থেকে উত্তোলন ক'রে, বারংবার যুদ্ধের প্ররোচনা বা প্রেরণা দিতে থাকলেন।

এই দুটি সুর ফুটিয়ে-তৃতীয় সুরটির, গান্ধারের 'গা'-য়ের ঝঙ্কার তুললেন।

যুদ্ধে ভয় পাও কেন? যুদ্ধের কৌশল আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব, যার নাম 'যোগ'। গীতায় তাই যোগের সংজ্ঞা বা definition হ'ল ঃ 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। তৃতীয় সুরে তারই জন্য বারংবার প্রেরণা দিচ্ছেন অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে ঃ

যোগায় যুজ্যস্ব (২/৫০)
যোগামাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ (৪/৪২)
তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন (৬/৪৬)
সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব (৮/২৭)

প্রাথমিক এই তিনটি সুর শিখিয়ে মুরলীধর এবার ঠিক মাঝখানের সুরটি তুললেন, যা'র নাম সার্থক ভাবেই 'মধ্যম' বা 'মা'। এদিকে তিন, ওদিকে তিন, এই ছয়টি সুরের মাঝখানে, কেন্দ্রস্থলে দুই প্রান্তকেই ধরে রেখেছে যেন এই চতুর্থ সুরটি। এই হল মধ্যধাম, যোগীরা নিরন্তর যার অনুসন্ধান করেন। বলেন, ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুই বক্র নাড়ীর মাঝখানে যে সরল নাড়ীটি, যার নাম 'সুষুম্না' পরম সুখময় মধ্যনাড়ী, তার মুখটি খোলা চাই। আর সেটি খুললেই 'মধ্যবিকাসাৎ চিদানন্দলাভঃ', 'লাভ হবে চিদানন্দ, যা জীবনের চরম লক্ষ্য। তাই এটি যোগের হৃৎকেন্দ্র, যোগের প্রাণসর্বস্ব। সেটি একটি মাত্র শ্লোকে শুনিয়ে দিলেন ঃ

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। (৮/৭)

এরই নাম 'অক্ষরব্রহ্মযোগ'। যুদ্ধ ক'রে যাও, আর মনটি দিয়ে রাখো আমাকে। সমস্ত গীতার কেন্দ্রস্থলে যে সুরটি অনুরণিত তা হ'ল এই ঃ যুদ্ধের জন্য অস্ত্রধারণ এবং যুগপৎ সেই সঙ্গেই তাঁর অনুস্মরণ।

স্মরণের পরে আসে ভজন। এই পঞ্চম সুর 'পা,' সেখানে তাঁর সেবার জন্য মন উন্মুখ হয়। 'ভজ সেবায়াম্' সংস্কৃতে 'ভজ' ধাতুর অর্থ সেবা। তাই ভজনের মাধ্যমে এই সেবনের নির্দেশ দিলেন মাত্র ছোট দুটি শব্দে.ঃ

ভজস্ব মাম্ (৯/৩৩)

দেখছ না চারদিকে সবই অনিত্য, সবই দুদিনের, সবই দুঃখময়। এর সেবা না করে সেবা করো সেই নিত্য সুখময়ের। সেই জন্যই তোমাকে বলছি আমার ভজন করো—

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ (৯/৩৩)

এইটিই রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ, বিদ্যার বা জ্ঞানেরও রাজা, গুহ্য বা গোপনীয় চরম তত্ত্বেরও রাজা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ। মূল

'সা' এর সঙ্গে এই মধ্যম বা পঞ্চমে, 'মা' বা 'পা' এর সঙ্গে যুক্ত ক'রে জীবনের তানপুরাটি বাঁধো। সেইজন্যই সপ্তসুর শেখাচ্ছেন ভগবান। জেগে ওঠো আর অনুস্মরণ ও ভজন করো আমার। জীবনের এই মহা দ্বন্দ্বময় সংগ্রামক্ষেত্রে। এইটিই হল ত্রিতন্ত্রীতে জীবন-বীণা বাঁধা।

সে-ভজন কেমন ক'রে করতে হবে, তা-ও শেখালেন ষষ্ঠ সুরটি তুলে, ঠিক পরের শ্লোকেই ঐ রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ বলতে গিয়ে। এটি 'ধৈবত' বা 'ধা' সবকিছুর আধান এখানেই ঃ

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু (৯/৩৪)

সবই 'মাং' এর মধ্যে, আমাতে আধান করো, স্থাপন করো। দাও তোমার মন আমাতে, ভাব বা প্রাণ আমাতে, বাচন, স্তবন অর্থাৎ বাক্‌রূপ ক্রিয়া দ্বারা, মন্ত্রপাঠের দ্বারা যজন করো আমারই এবং তোমার কায়া বা দেহটি লুটিয়ে দাও নমস্কারে আমারই চরণে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে শুধু আমাকে ঘিরেই আবর্তিত হোক্ তোমার সকল ক্রিয়া। এরই নাম ভজন, সর্বাঙ্গ দিয়ে সেবা। বিপরীতক্রমে শুরু করো ঃ কর দুটি জোড় ক'রে প্রথম একটি নমস্কার দিয়ে, তার পরে আরম্ভ করো যজন বা স্তবন-অর্চন, তারপর ভক্ত হয়ে যাও, করো ভজন এবং শেষে মনটিও আমার সঙ্গে মিলিয়ে দাও—এই হ'ল ভজনের ক্রম বা ধারা। আবার সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে ফিরে এসো, 'মন্মনা' থেকে নেমে এসো ধাপে ধাপে 'নমস্করণে'। এইভাবে একবার স্থূল থেকে সূক্ষ্মে আবার সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে, অনুলোমে ও বিলোমে আবর্তিত হোক্ তোমার ভজন শুধু আমাকেই ঘিরে।

কিন্তু 'মাং'-কেই তো চিনি না, জানি না। একে তুমি বলছ আমাকে ভজন করো? এই 'মাং' কে? কোথায় পাবো তাঁকে? তাই সপ্ত সুরের শেষ সুরে সেই নিষাদে বা 'নিখাদে' এই 'মাং'-এর পরিচয় দিয়ে তাঁর গানের উপসংহার, ভজন থেকে সেই নিঃশেষ অতলে, গভীর খাদে নিয়ে গিয়ে, আবার সব চেয়ে চড়া পর্দ্দায় তুলে শরণে পরিসমাপ্তি। শরণাগতিই তাঁর গানের চরম সুর, পরম পরিণতি। দ্বিতীয় অধ্যায়েই তা শিখিয়েছেন প্রাথমিক ভাবে, আর অষ্টাদশে এসে টেনেছেন উপসংহার, চরমে সুরটি তুলে'। প্রথমে বলেছেন ঃ

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ (২/৪৯)

আমাকে বাইরে কোথায় খুঁজছো? আমি তো তোমার অন্তরেই বসে আছি বুদ্ধিরূপে। বলেননি কি শ্রীশ্রী চণ্ডীতে?

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।

সকলেরই হৃদয়ে সংস্থিত যে তিনিই বুদ্ধিরূপে এটি তাঁর ব্যষ্টিরূপ, প্রতি ব্যক্তিতে মানুষ হয়ে সে জন্মেছে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে, তাঁর প্রকাশ, যেন প্রদীপ শিখার মতো। তুমি আগে তারই শরণ নাও না, তারই আলোতে চলো না জীবনের অন্ধকার পথে, যে 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে এই ধ্রুবতারা।' তারপর—

তমেব শরণং গচ্ছ (১৮/৬২)

সেই ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে এসো। নিখিল বিশ্বকে যিনি পরিচালনা করছেন সেই ঈশ্বরের শরণ নাও, যিনি 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া,' সমস্ত জীবকে ঘোরাচ্ছেন এই জগচ্চক্রে বসিয়ে তাঁর মায়ায়। শেষে

মামেকং শরণং ব্রজ (১৮/৬৬)

যেখানে প্রদীপের ক্ষীণ আলোও নেই, আকাশজোড়া, 'ভাস্বরম্ আকাশকল্পং' মহাপ্রকাশও নেই, যেখানে শুধুই আমি, একক আমি, 'কেবল তুমি, কেবল তুমি' সেই 'অতল কালো স্নেহের তলে' নিজেকে 'ডুবিয়ে স্নিগ্ধ করো,' সব হারানোর কূলে এসে নিঃশেষে নিজের পৃথক্ সত্তার নিমজ্জন ঘটাও। এটিই হ'ল 'সর্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ' নিষাদের চরম সুর, যার তিনটি পর্ব ঃ বুদ্ধিতে, ঈশ্বরে এবং একক তাঁ'তে শরণাগতি। এইখানেই সপ্ত সুরের শেষ, গীতার গানের উপসংহার। এই ভগবানের শেখানো সুর-সপ্তকে উত্থান জাগরণের 'সা' বা ষড়জ সব সুরের ভিত্তি এবং শরণাগতির 'নি' তা'র চূড়া বা শিখর। ঘাটে ঘাটে, পর্দায় পর্দায় তুলতে হবে ভগবানের শেখানো এই সুরসপ্তক। তবেই না গীতা সুগীতা হ'বে।

গীতায় অর্জুনের সুর-সাধা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা যেহেতু শ্রীভগবানের গান, সে-গান শুধু শুনলে হবে না, সে-গান গাইতে হবে তাঁরই মতন সুন্দর ক'রে, তাঁরই সুরের অনুকরণে ও অনুসরণে। পর্দায় পর্দায় ঘাটে ঘাটে সে-সুর তুলতে হবে নিখুঁত করে আপন আপন জীবন-বীণায়। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা'।

গান একটি ক্রিয়া বা কর্ম অর্থাৎ সাধনপ্রক্রিয়া। গীতা তাই কেবল তত্ত্বশাস্ত্র নয়, এটি সাধন-শাস্ত্র। তত্ত্ব হল তাই যা বাস্তব বস্তু বা স্থিতিকে চেনায় বা জানিয়ে দেয়। আর সাধন হ'ল গতি, সেই তত্ত্বে বা স্থিতিতে পৌঁছুবার প্রয়াস বা প্রক্রিয়া। গীতা তত্ত্বের কথা বলেছেন, কোন্ স্থিতিতে বা লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুতে হবে, তার সুস্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরার জন্য। কারণ, সুরের নিখুঁত বা খাঁটি রূপটি না জানা থাকলে বেসুরকেই সুর ব'লে ধরে নেওয়ার বা মনে করার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা। তত্ত্ব আলোচনার এইটুকুই সার্থকতা বা তাৎপর্য।

কিন্তু মূল জিনিসটি হল সুর সাধা, গলায় সুর তোলা, ওস্তাদের সুরের সঙ্গে নিজের সুর মেলানোর নিরন্তর প্রয়াস। 'সুরের গুরু! দাও গো সুরের দীক্ষা' এই আমাদের একমাত্র ভিক্ষা তাঁর কাছে। তারপর সব শেষে তিনি আমাদের পরীক্ষা নেন, সুরে আমাদের যথার্থ স্থিতি হয়েছে কি না তা যাচাই ক'রে নেন, যেখানে কোলাহলের বেগে, ঘূর্ণি ওঠে জেগে' অর্থাৎ পদে পদে যেখানে সুর ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা, সেই কলরবমুখর তরঙ্গভঙ্গসমাকুল সংসার-সাগরের ঠিক মাঝখানে দাঁড় করিয়ে গাইবার আদেশ দিয়ে, যেমন দিয়েছিলেন অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনের মাঝখানে নিজে গেয়ে এবং অর্জুনকে দিয়ে গাইয়ে।

গীতায় এই রকম অজস্র আদেশ আছে শ্রীভগবানের, যার দিকে আমরা দৃষ্টি দিই না। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ নির্দেশ, বিধি-বিধান তিনি দিয়েছেন, যখন যে-ভূমিতে যেমনটি প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ক'রে। সোপান-পরম্পরার মতো ধাপে ধাপে এই আদেশগুলি গীতায় সাজানো আছে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত। আমরা যদি ভগবানের নির্দিষ্ট সেই ধাপগুলি ধরে ধীর পদক্ষেপে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে চলি, তাঁর আদেশগুলি ঠিক ক্রমিক

পর্যায়ে পালন করে যাই যখন তিনি যেমনটি বলেছেন তার যথার্থ পরিপালন ক'রি, তা হলেই যে 'নিবসিষ্যসি ময্যেব, 'মামেবৈষ্যসি', তাতেই নিবাস, তাতেই স্থিতি আমাদের অবধারিত। এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই, 'ন সংশয়'।

শ্রীভগবান যেমন ভক্তকে এমনি পদে পদে আদেশ বা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন প্রথম থেকে শেষ অবধি, তেমনি ভক্তও ভগবানকে আদেশ করে গিয়েছে, এটিও গীতার আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। ভক্তাধীন ভগবান, এখানে অধীশ হয়ে আসেননি, অধীন হয়ে এসেছেন সারথির কাজ করবেন ব'লে, অর্জুনের নির্দেশ মতো রথ চালনা করবেন ব'লে। তাই এখানে অর্জুন প্রভু, তিনি দাস। অর্জুন তাই তাঁর এই সারথিটিকে প্রথমেই আদেশ ক'রে বসলেন ঃ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত। (১। ২১)

জীবনের এই কুরুক্ষেত্রে, সমরাঙ্গনে যুযুধান দুই সেনার মাঝখানে আমাদের এই দেহরথটি আমরাই নিজের হুকুমে তাঁকে দিয়ে স্থাপন করিয়েছি। অথচ তাঁকেই আমরা দোষারোপ করি, সব অনুযোগ অভিযোগ আমাদের এই তাঁর বিরুদ্ধেই যে কেন তিনি আমাদের এই সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে এনে ফেললেন ক্ষত বিক্ষত করতে। এটা আমারই চাওয়া, my own choice এরই নাম কাম, এরই নাম 'তন্‌হা' বা তৃষ্ণা, যা বিশ্বের মূল। তাই আমরা 'স্বখাত সলিলে'ই ডুবে মরি, এখানে অন্য কেউ দায়ী নয়। অর্জুনের এই প্রাথমিক আদেশে সেই কথাটিই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত ও প্রতিভাত। যখন দুই সেনার মাঝখানে রথটি স্থাপনের জন্য আদেশ করেছিলেন, তখন তার পিছনে এক উদ্ধত অহমিকা সক্রিয় ছিল—'কাদের সঙ্গে আমাকে লড়তে হবে চলো তো দেখি আমি অর্থাৎ এত স্পর্ধা কাদের যারা আমার সঙ্গে লড়তে সাহস করে? সেই দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের যুদ্ধ সহায়ককারী হয়ে তাদের ভাল করতে চায় যারা তারা কে?

ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ (১. ২৩)

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে (১. ২২)

আদেশের মূলে ছিল অহমিকা কিন্তু সে আদেশ যখন প্রতিপালিত হ'ল, সারথি যখন রথটি দুই সেনার মাঝখানে স্থাপিত ক'রে অর্জুনকে আদেশ করলেন ঃ

পশ্যৈতান সমবেতান্ কুরুনিতি (১. ২৫)

চোখ খুলে দেখে নাও এদের—এই একত্র সমবেত কুরুবংশীয়দের, তখনই দেখতে গিয়েই ঘটল বিপর্যয়। অহঙ্কারস্থানে দেখা দিল মমতা। সংসারের রণভূমিতে যেই আমরা এসে দাঁড়াই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে, তখন দেখি

চারদিকে শুধুই স্বজন, আপনজন। এ লড়াই আমারই সব আপনজনের সঙ্গে , এরা সবাই আমার 'বন্ধু' অর্থাৎ আত্মীয়, যাদের সঙ্গে আমি 'বাঁধা' নানা সম্বন্ধের মমতাসূত্রে। কেউ বা পিতামহ, কেউ বা পিতৃস্থানীয়, কেউ বা আচার্য গুরু অর্থাৎ পূজনীয় স্বজন। আবার নিজের পক্ষে যারা আছে তারাও কেউ বা ভাই, কেউ বা ছেলে কেউ বা নাতি অর্থাৎ সবাই নিকট আত্মীয়, একান্ত স্বজন। এই 'মমত্ববোধে অতিমহান্ধকারে' নিপতিত হলেন অর্জুন। 'স্বজন' 'স্বজন' করে তাঁর আর্তনাদ শোনা গেল ২৮ শ্লোক থেকে ৪৪ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর দীর্ঘ ভাষণে প্রথম অধ্যায়ে। শেষে শোক সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধনুর্বান ত্যাগ ক'রে বসে পড়লেন রথের উপর। মমত্বের এই মোহেই আচ্ছন্ন তাঁকে বিষাদে অভিভূত করল।

শোক, মোহ ও বিষাদ, এই হ'ল গীতার পটভূমিকা। এই বিষাদসিন্ধুতে নিমজ্জমান সখা অর্জুনকে উদ্ধার করার জন্য এরপর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে প্রবাহিত হবে তাঁর সারথির প্রসাদের ধারা। কিন্তু সে-প্রসাদকে ভিক্ষা করতে হয়, চাইতে হয় এবং তার আগে নিজে যে আমি মোহে অভিভূত, 'সংমূঢ়চেতা' তার উপলব্ধি জাগা চাই। আমরা যে মূঢ়, মোহগ্রস্ত সে বোধই আমাদের নেই, এমন গভীর মূঢ়তায় আমরা আচ্ছন্ন, মোহনিদ্রায় সুখসুপ্ত। বিরল কোনো ভাগ্যবান পুরুষই নিজের মোহ সম্বন্ধে সচেতন হ'ন, যখন তিনি এসে প্রথম তাঁর আদেশের কশাঘাতে তার ক্লৈব্য, জড়তা দৌর্বল্য, শক্তিহীনতা দূর করে আবার তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। বলেন ঃ

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ' এবং সেই সঙ্গে আরও বলেন ঃ

'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ' (২/৩)

এইটিই শ্রীভগবানের প্রথম আদেশ এবং সেই আদেশের প্রেরণায় অর্জুন জেগে উঠে তাঁকে অনুনয়ের ভঙ্গীতে আদেশ করেন ঃ

'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে' 'যাতে আমার শ্রেয় বা মঙ্গল, তাই বলো এবং সেই সঙ্গে আরও অনুনয় করেন ঃ 'শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ (২।৭) 'তোমার শিষ্য আমি, তোমারই শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দাও'।

অর্জুনের আরও অনেক আদেশভঙ্গিম অনুনয় বা আবদার সমগ্র গীতার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ছড়ান আছে, যার মূল প্রার্থনাই হ'ল ঃ

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্। (৩। ২)

আমি যাতে শ্রেয় লাভ করতে পারি, তাই তুমি নিশ্চিত করে বলো আমাকে। বারম্বার এই 'ব্রূহি' (৫। ১) 'বদ' (৩। ২) কথয় (১০। ১৮) একমাত্র এই ভিক্ষাই অর্জুনের উদগীত হয়েছে দশম অধ্যায় পর্যন্ত, কারণ যত

শুনছেন ততই আরও শোনার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে, কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না তাঁর, এমনই অমৃত নি-ষ্যন্দী তাঁর উপদেশ, যা স্বাদু পদে পদে। দশম অধ্যায়ে এসে তাই বললেন ঃ

'ভুয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃন্বতো নাস্তি তেহমৃতম্' (১০। ১৮) 'শোনাও আরও অমৃত আমার তৃপ্তি নেই, এখনো অতৃপ্ত এ চিত্ত।'

একাদশ অধ্যায়ে এসে অর্জুনের অনুরোধমূলক আদেশ অন্য মোড় নিল। যখন শোনবার পর্ব তাঁর প্রায় শেষ হ'ল যার ফলে তাঁর মোহও বিদুরিত হয়ে গেল, 'মোহোহয়ং বিগতো মম' (১১। ১) ব'লে নিজেই সেকথা জানিয়েও দিলেন, তখন দ্বিধাদ্বন্দ্বেজড়িত অন্য এক অনুনয় জানালেন ঃ 'দর্শয়াত্মানমব্যয়ম' (১১। ৪)। 'শোনালে তো ঠাকুর! অনেক, এবার দেখাবে একটু তোমার সেই অব্যয়, অক্ষয় ঐশ্বর রূপ? অবশ্য যদি তুমি মনে করো আমি তা দেখার যোগ্য, তা হলেই দেখিও নতুবা নয়।' যেমন এই অনুনয়—'দেখাও' 'দর্শয়' তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার অনুমোদন 'দেখো', 'পশ্য' (১১। ৫)। তবে তোমার চর্মচক্ষু দিয়ে তো সে ঐশ্বর রূপ দেখতে পারবে না, তাই তোমাকে সেই রূপ দেখার উপযুক্ত বিদ্যাচক্ষু ও মর্ম চক্ষুও দান করছি। সেই দিব্য চক্ষু আলোর চোখ দিয়ে দেখে নাও তাঁকে যিনি আলোর আলো 'জ্যোতিষাং জ্যোতি, যিনি তাঁর আলোয় সব কিছু আলোকিত, উদ্ভাসিত করে রেখেছেন, 'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। সেই যে 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে' (১৩। ১৮) অর্জুন কিন্তু তা দেখে হতচকিত, ভীত, বিহ্বলিত। তাই গীতায় অর্জুনের শেষ অনুনয়, একান্ত প্রার্থনা, অন্তরের যাচঞাঃ

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররুপো (১১। ৩১)

বলো আমাকে দয়া ক'রে কে তুমি এই উগ্ররূপধারী। আর সেই সঙ্গেই আর একটি অনুরোধ, এও দর্শনেরই অনুরোধ, তবে ঐ উগ্ররূপের নয়, তাঁর সৌম্যরূপের, যে-রূপ দেখতে অর্জুন চিরদিন অভ্যস্ত ঃ

'তদেব মে দর্শয় দেব রূপম্' (১১। ৪৫)

'ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব' (১১। ৪৬)

শোনাও' এবং 'দেখাও' এই দুটিই হ'ল অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুর একমাত্র প্রার্থনা, যা অর্জুনের কণ্ঠে সমগ্র গীতায় বারম্বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। আগে 'শ্রোতব্যঃ শেষে 'দ্রষ্টব্যঃ' আমাদের মূল অধ্যাত্মশাস্ত্র, শ্রুতিগণশিখা উপনিষদেরও, সেই একই নির্দেশ যে উপনিষদের সার দোহন করে গোপালনন্দন গীতামৃত পরিবেশন করে গিয়েছেন বৎস পার্থকে উপলক্ষ্য

করে। মূল লক্ষ্য হ'ল 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' আর তার মূল সাধন হ'ল শ্রোতব্যঃ। শ্রবণে যা থাকে পরোক্ষ, দর্শনে তাই হয় প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। গীতার উপসংহারে সঞ্জয়ের মুখেও আমরা শুনি এই দুটি মূল অবলম্বনের কথা। একটি হল 'সংবাদমদ্ভুতম' আর একটি হল 'রূপমত্যদ্ভুতং'। বারম্বার এই দুটির সংস্মরণেই মানুষের কৃতার্থতা, মুহুর্মুহু আনন্দমগ্নতা।

কেশবার্জুনের এই সংবাদ, পরস্পর সংলাপে যে দিব্য সঙ্গীতের সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে, অর্জুনের দিক থেকে যে সব চাহিদা অনুনয় বা আদেশের ভঙ্গীতে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হয়েছে এবং এক পরম পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে, আমরা তার সামান্য আস্বাদ করলাম এখানে। ভগবানের দিক থেকে সেই সব চাহিদা পূরণের যে ক্রমবিন্যাস তাঁর নানা আদেশের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, তা আরও চমৎকার এবং আলাদাভাবে বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। মূল কথা, গীতার মধ্যে যে একটি গতি আছে সুর সাধার, সুরের ক্রমিক আরোহণের ধারা আছে, সেইটি উপলব্ধি করতে হবে এই সংবাদের মাধ্যমে এবং সেই সুরকে একই ধারায় আপন আপন জীবন-বীণায় ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাই 'গেয়ং গীতানামসহস্রম্' আর 'ধ্যেয়ৎ শ্রীপতিরূমজস্রম্' এই গান আর ধ্যানই গীতার একমাত্র সাধন।

———